ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম এ, পি এইচ ডি
রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস লেখার চেষ্টা বোধ হয় এই প্রথম। এই প্রচেষ্টায় সাফল্যলাভের পক্ষে প্রধান অন্তরায়—সমালোচনা-সম্পর্কিত আলোচনা ও ইহার পরিভাষার সহিত বাঙ্গালী পাঠকের আপেক্ষিক অপরিচয়। প্রত্যেক যুগের ইতিহাসে সমাজপ্রভাব ও প্রতিভাবান্ লেখকের আবির্ভাবের ফলে এক একটী বিশেষ রকমের সাহিত্যিক গুণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে ও এই গুণগুলি বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া ক্রমশঃ পাঠক-সমাজে সুপরিচিত হইয়াছে। আমাদের বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে এই সমস্ত সংজ্ঞার প্রতিশব্দ এখনও গঠিত হয় নাই; সংজ্ঞানির্দ্দিষ্ট গুণগুলি সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট নহে। সেইজন্য ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে যাঁহাদের বিশেষ পরিচয় নাই তাঁহারা ইহার যুগ-পরিবর্ত্তনের কাহিনীর ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিতে হয়ত কিছু অসুবিধা বোধ করিতে পারেন।

তথাপি বাংলা সাহিত্য এখন পরিণতির যে স্তরে পৌছিয়াছে তাহাতে ইহার সাধারণ পাঠকবর্গের মধ্যেও ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসের একটা মোটামুটি জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়। আধুনিক বাংলাসাহিত্যের রস গ্রহণ করিতে হইলে, যে ইংরাজী সাহিত্যের দ্বারা ইহা প্রগাঢ়ভাবে প্রভাবিত তাহার সহিত পরিচয় না থাকিলে চলিবে না। আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি সেই সাধারণ পাঠকের রুচি ও প্রয়োজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই লিখিত হইয়াছে। আমি ইহাকে তথ্য-ভারাক্রান্ত করিতে চেষ্টা করি নাই—কেবল প্রত্যেক যুগের মূলসূত্র ও প্রথম শ্রেণীর কয়েকটী লেখকের অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত পরিচয় দিতে প্রয়াসী হইয়াছি। এ বিষয়ে Home University Libraryএর ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসকেই আমার আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছি। আশা করি সাধারণ সাহিত্যরসিক পাঠক এই স্বল্পায়তন বিবরণী হইতে ইংরাজী সাহিত্যের প্রসার ও ক্রমপরিণতির মুখ্য ধারাগুলি অনুসরণ করিতে পারিবেন ও ইহার শ্রেষ্ঠ লেখকদের মর্ম্মগ্রহণে ও রসোপলব্ধি বিষয়ে

সহায়তা লাভ করিবেন। এই পরিচয়ের ফলে তাঁহাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের রসাস্বাদনও সহজ ও বিচারবুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে। এইরূপভাবে যাঁহারা অন্যান্য দেশের সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তাঁহারাও যদি বাংলাতে সেই সমস্ত সাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলনে ব্রতী হন, তবে মাতৃভাষার সমৃদ্ধি-সাধন ত হইবেই ; তা ছাড়া, আমাদের পাঠক-সমাজও বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইয়া সঙ্কীর্ণ একদেশদর্শিতার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে ও সাহিত্য-বিচারে উদার ও অপক্ষপাত মনোবৃত্তি অর্জ্জন করিতে পারিবেন।

এই গ্রন্থের অনেকগুলি অধ্যায় 'পাঠশালা' নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলি 'পাঠশালা' হইতে সংগৃহীত হইয়া পুনর্মুদ্রিত হইল। গ্রন্থের শেষ কয়েকটী অধ্যায় স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হইয়াছে।

৩১নং সাদার্ন এভিনিউ, কলিকাতা
বৈশাখ, ১৩৫৩

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	১৯	১৬৩০	১৫৯০

ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

আংলো-সাক্সন ও আংলো-নর্ম্মান সাহিত্য

(৬০০—১৪০০ খৃঃ অঃ)

(১)

ইংরাজী সাহিত্যের পাঠকদের মধ্যে ইহার অসাধারণ প্রসার ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে মতভেদ নাই। সুতরাং আশা করা যায় যে ইহার ক্রম-পরিণতির ইতিহাস আকর্ষণের বিষয় হইবে। ভাষার উৎপত্তি বড়ই আশ্চর্য্যের ব্যাপার। বিজ্ঞান নানাবিধ আশ্চর্য্য আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে অবাক্ করিয়া দেয়; কিন্তু ভাষার জন্মরহস্য আরও অদ্ভুত ও কৌতূহলোদ্দীপক। মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া কেমন করিয়া যে দৃশ্যমান জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের নামকরণ করে ও বর্ণমালা আবিষ্কার করে, এই আবিষ্কার সমাজের সকলে মানিয়া লয় কেন?—মানব-ইতিহাসের আদিমযুগের এই রহস্যগুলি আমাদিগকে বড়ই ধাঁধায় ফেলে। প্রথম প্রথম কয়েকটি মৌলিক ভাষার খবর পাওয়া যায়—তারপর এই মৌলিক ভাষাগুলি হইতে অসংখ্য শাখা-ভাষার উদ্ভব হয়। এই শাখা-ভাষাগুলি মূলের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত, অথচ আবার নিজেদের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। মনে হয় যে যখন একই বংশোদ্ভূত এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসবাস করিতে আরম্ভ করে, তখন মূল ভাষার কয়েকটি অতি দরকারী শব্দ তাহাদের সাধারণ সম্পত্তিরূপে সঙ্গে লইয়া আসে। তাহার পর নিজ নিজ সভ্যতা, প্রয়োজন ও মানসিক উৎকর্ষ অনুযায়ী নূতন নূতন শব্দ গঠন

করিয়া আপনার ভাষাকে সমৃদ্ধ করে। এই হিসাবে আমাদের সংস্কৃতের সহিত গ্রীক, লাটিন, ও গ্রীক, লাটিনের বংশধর ইংরাজী, জার্মান প্রভৃতি ভাষার মধ্যে নিকট আত্মীয়তা আছে। মানুষের নিকটতম সম্পর্ক বুঝাইবার শব্দগুলি এই সমস্ত ভাষাতে প্রায়ই এক। সংস্কৃত 'পিতর্', গ্রীক ও লাটিন 'pater' ও ইংরাজী 'father'; সংস্কৃত 'মাতর্', গ্রীক ও লাটিন 'mater' ও ইংরাজী 'mother'; সংস্কৃত 'ভ্রাতর্', গ্রীক ও লাটিন 'frater' ও ইংরাজী 'brother'—এই সমস্ত শব্দ আলোচনা করিলে ইহাদের মধ্যে আত্মীয়তার বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, ইংরাজী, জার্মান এই সমস্ত ভাষাই Indo-Aryan এই মূল ভাষা হইতে উদ্ভূত।

আমাদের আলোচনার বিষয় হইতেছে ইংরাজী সাহিত্যের জন্ম ও পরিণতির কথা; ইংরাজী ভাষার উৎপত্তি ইহার ঠিক অন্তর্ভুক্ত নহে। সাহিত্যের জন্ম ভাষার উদ্ভবের বহু পরবর্তী ঘটনা। ভাষা যখন অনেকটা স্থায়িত্ব ও পরিণতি লাভ করে, ইহার ব্যাকরণ-ঘটিত সূত্র-নিয়মগুলি যখন অনেকটা পাকাপাকি হয়, তখন সাহিত্য-সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়। যখন ইংরাজী সাহিত্যের সহিত আমাদের প্রথম পরিচয় হয় তখন ইহার নাম ছিল 'Anglo-Saxon'; তখন ইহার ভাষা বর্তমান ইংরাজী ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে 'বৌদ্ধগান ও দোঁহা'র ভাষার সঙ্গে বর্তমান বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ প্রভেদ, বর্তমান ইংরাজীর সহিত Anglo-Saxon এর প্রভেদ প্রায় ততটাই গুরুতর ছিল।

(২)

আনুমানিক খৃষ্টাব্দ পঞ্চম শতাব্দীতে জার্মান দেশ হইতে, Angle, Saxon ও Jute নামক তিনটি জাতি আসিয়া ইংলণ্ড (তখন ইহার নাম ছিল 'ব্রিটেন') অধিকার করে ও নিজেদের ভাষায় Beowulf নামে একটি মহাকাব্য রচনা করে। Beowulf হইতেছে তাহাদের জার্মান পূর্বপুরুষের বীরত্ব-কাহিনীর জয় ঘোষণা। ইংলণ্ডের মাটি ও আকাশ-বাতাসের সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। ইহার গল্পটির সহিত আমাদের রামায়ণ মহাভারতের আংশিক সাদৃশ্য আছে।

Hrothgar নামে এক ডেনমার্ক দেশীয় রাজার রাজপ্রাসাদ Grendel নামে এক রাক্ষসের অত্যাচারে শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। রাত্রে যখন এই প্রাসাদ আমোদ উৎসবে মুখরিত হইয়া উঠিত তখন অকস্মাৎ কোথা হইতে এই রাক্ষস আসিয়া রাজানুচরবর্গের মধ্যে একজনকে লইয়া উধাও হইত ও তাহার রক্তমাংসে নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। ইহার সহিত যুদ্ধ করে এমন কোন বীরপুরুষ সে দেশে ছিল না। অগত্যা রাজাকে নীরবে এই অত্যাচার সহ্য করিতে হইত। এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে, Beowulf নামে এক প্রতিবেশী রাজ্যের রাজপুত্র এই রাক্ষস দমনের জন্য সমুদ্রযাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি Hrothgar এর প্রাসাদে আসিয়া রাক্ষসের নৈশ অভিযানের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রাক্ষস আসিতেই দুইজনের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আমাদের মহাভারতে ভীমের সহিত বক, কির্মীর, হিড়িম্ব প্রভৃতি রাক্ষসের যুদ্ধের যেরূপ বর্ণনা আছে, ইহার বর্ণনাও অনেকটা সেইরূপ। শেষ পর্যন্ত Beowulf রাক্ষসের একটা বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলে রাক্ষস আর্তনাদ করিতে করিতে পলাইয়া সমুদ্রের তলদেশস্থ গুহায় আশ্রয় লইল ও সেখানে প্রাণত্যাগ করিল।

কিন্তু এখানেই বিপদের শান্তি হইল না। পরদিন রাত্রে আবার এক নূতন উৎপাত আরম্ভ হইল। রাক্ষসের মাতা পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজপুরীতে হানা দিল। আবার Beowulf এর সহিত তাহার তুমুল যুদ্ধ বাধিল। শেষ পর্যন্ত রাজপুত্রের বিক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া নিশাচর-জননী নিজ জলতলস্থ দুর্গে আশ্রয় লইল। এবার Beowulf শত্রুকে নির্মূলে ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে একমাত্র বিশ্বস্ত অনুচর লইয়া সেই অতল সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। শত্রু শেষ করিয়া বহু বিলম্বে তিনি ফিরিলেন। Hrothgar ও তাঁহার প্রজাপুঞ্জ এই পরোপকারী বীরপুরুষের পদে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিলেন।

এবার মহাকাব্যের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হইল। Beowulf নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া কিছুকাল পরে আপন দেশে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন ও দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর রাজ্য পালন করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের শ্রদ্ধা ও ভক্তির অধিকারী হইলেন। কিন্তু তাঁহার জীবন-সায়াহ্নে দেশে এক দারুণ দুর্দৈব

উপস্থিত হইল। মুখ হইতে অগ্নি-নিঃসরণকারী এক রাক্ষস দেশ আক্রমণ করিল। প্রজারা তাহার অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। রাক্ষস তাহার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের আগুনে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধাকে ঝল্‌সাইয়া মারিতে লাগিল। সুতরাং ভয়ে কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে রাজি হইল না। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ রাজাকেই বহুদিন অব্যবহৃত বর্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইল। তুমুল যুদ্ধের পর রাক্ষস পরাস্ত হইল, কিন্তু তাহার নিঃশ্বাসবায়ুতে দগ্ধ হইয়া বৃদ্ধ রাজাও প্রাণত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি সম্পূর্ণ নির্বিকার চিত্তে মরণের অবশ্যম্ভাবিতা ও দৈবের অখণ্ডনীয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিলেন।

সাধারণতঃ মহাকাব্যের যে সমস্ত গুণ থাকে, এই ক্ষুদ্র গল্পটির মধ্যে সে সমস্ত গুণের অভাব নাই। বিষয়-গৌরব, ভাষার গাম্ভীর্য, উন্নত জীবনাদর্শ সমস্তই ইহার মধ্যে পাওয়া যায়। অবশ্য রামায়ণ, মহাভারত বা হোমারের ইলিয়াডের মত ইহার প্রসার বা বিশালতা নাই; হিন্দু মহাকাব্যের সূক্ষ্ম নীতিবোধ ও পরিণত আদর্শ-কল্পনাও নাই। তথাপি ইহা মহাকাব্য নামে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত। বর্তমান ইংরাজ জাতির যে চিরন্তন চরিত্র-বৈশিষ্ট্য জগতের নিকট সুপরিচিত, সেই বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি এই আদিম যুগের রচনাতেও পাওয়া যায়। ইংরাজ নাবিকের জাতি; মহাসমুদ্র তাহার স্বচ্ছন্দ বিহার-ক্ষেত্র। সমুদ্রের প্রশংসা-গানে সে মুখর; সিন্ধু-কল্লোলের সহিত তাহার রক্ত-স্পন্দন এক সুরে বাঁধা। Beowulf এ এই সমুদ্রপ্রীতির প্রথম অভিব্যক্তি। সমুদ্রের ভীষণ সৌন্দর্যের দৃশ্য যে কবি-চিত্তকে নাড়া দিয়াছে তাহা নিঃসংশয়ে বোঝা যায়। ইংরাজ জাতির বীরত্ব, নির্ভীকতা, তাহার অদৃষ্টবাদের বৈশিষ্ট্য সবই এখানে আছে। ইংরাজের অদৃষ্টবাদ ও বাঙ্গালীর অদৃষ্টবাদ এক জিনিস নহে। বাঙ্গালী অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসের ফলে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন। 'ভাগ্যে যাহা আছে তাহা ঘটিবে, আমি চেষ্টা করিয়া তাহা খণ্ডন করিতে পারিব না।'—বাঙ্গালীর মনের ধারণা অনেকটা এইরূপ। Beowulf এ যে অদৃষ্টবাদ আছে, তাহার চিন্তা-ধারা মোটামুটি এইরূপ—'জানি অদৃষ্ট অকরুণ ও প্রতিকূল এবং জীবন দুঃখময়। জীবনে সুখ অনায়াসলভ্য নহে; তথাপি সঙ্কল্পে শিথিল হইব না। শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত প্রতিকূল শক্তির সহিত

যুদ্ধ করিব, কেননা এই বীরত্বই জীবনের প্রধান কাম্য ও স্থায়ী সম্পদ।' এই মহাকাব্যে ভগবানের উপর আত্ম-সমর্পণের পরিবর্তে আছে চরম আত্ম-নির্ভরশীলতা। Beowulf কাব্য খৃষ্টপূর্ব যুগের মনোভাবের অভিব্যক্তি; জলদস্যুর দুঃসাহসিক জীবনের আদর্শ-কল্পনা। অবশ্য দুই শতাব্দী পরে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের হাতে পড়িয়া ইহার মূল সুরটি অনেকটা খৃষ্টভাবাপন্ন হইয়াছে; খৃষ্টধর্মের ভগবদ্ভক্তি ও শান্তিপ্রিয়তা ইহার রণোন্মাদের সঙ্গে মিশিয়াছে। তথাপি মোটের উপর ইহা বলা যাইতে পারে যে খৃষ্টধর্মের শান্ত, শীতল স্পর্শ ইহার দুর্দমনীয় বীরত্বকে কোন অংশে ক্ষুণ্ণ করে নাই।

Beowulf-এর পরে Anglo-Saxon-যুগ আরও ৩৫০।৪০০ বৎসর পর্যন্ত চলিয়াছিল। এই যুগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ইংরাজ জাতির খৃষ্টধর্মগ্রহণ। এই ধর্ম-পরিবর্ত্তনের ফলে ইংরাজের সাহিত্য ও জাতীয় চরিত্রের গভীর পরিবর্তন হইয়াছে। ইংরাজের রুক্ষ, পরুষ ভাব ও অদৃষ্টবাদের পরিবর্তে কোমলতর মনোবৃত্তি ও ভগবানে ভক্তি-বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্যাডমন (Caedmon) ও কাইনওয়াল্ফের (Cynewulf) কবিতায় এই নূতন কোমলতা প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহারা খৃস্টের জীবন-চরিত ও তাঁহার অনুচরবর্গের দৈব কীর্তির বিষয়ে কবিতা লিখিয়াছেন—এই কবিতায় যুদ্ধপ্রিয়তা ও ভগবৎ-প্রেমের এক সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে। খৃস্টের যে মূর্তি ইঁহারা কল্পনা করিয়াছেন তাহাতে জলদস্যুর দুর্ধর্ষতা ও প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে করুণা ও প্রীতি মিশিয়াছে। প্রকৃতির শান্ত-স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের দিকেও কবিদের চোখ খুলিয়াছে, বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র ও কুয়াসা-ঘেরা পাহাড়-পর্বত ও অরণ্যের সীমা ছাড়াইয়া তাঁহারা প্রকৃতির মধুর কোমল বিকাশগুলিতে দৃষ্টি দিবার সময় পাইয়াছেন।

(৩)

১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বৈদেশিক অভিভবের এক প্রচণ্ড তরঙ্গ আসিয়া পূর্বতন সাহিত্য ও জীবন-ধারাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। প্রতিবেশী নর্মানেরা আসিয়া হেস্টিংসের যুদ্ধে ইংরাজদের পরাজিত করিয়া রাজ্য দখল করিল। ইংরাজ পরাধীনতার গ্লানি ও অপমান মর্মে মর্মে অনুভব করিল। ইংরাজী ভাষা স্বাধীনতার সমস্ত গৌরব হারাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানীয় কথ্য ভাষায়

পরিণত হইল। Anglo-Saxon যুগের সাহিত্য এই প্রচণ্ড ধাক্কায় নিজ অস্তিত্ব পর্যন্ত হারাইয়াছে। সাহিত্যে ও জাতীয়-জীবনে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা পূর্ণমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এক এক সময় নৈরাশ্যবাদীদের মনে হইয়াছে বুঝি ইংরাজের জাতি-স্বাতন্ত্র্য চিরকালের মত বিলুপ্ত হইয়াছে ও ইংরাজী সাহিত্য ফরাসী সাহিত্যের অধীন করদ রাজ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে।

এই সময়ের বিজেতা নর্মান ও বিজিত আংলো-সাক্সনদের মধ্যে পরস্পর সম্পর্কটি Scott-এর বিখ্যাত উপন্যাস Ivanhoe-তে চমৎকারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। স্কট দেখাইয়াছেন যে ভাষাবিজ্ঞানও কেমন করিয়া এই সম্পর্কের উপর আলোকপাত করিয়াছে। নর্মানরা প্রভু, সুতরাং ক্ষমতা ও আরাম-উপভোগের সমস্ত বিচিত্র ব্যবস্থাই তাহাদের করায়ত্ত; ইংরাজ দাস, লাঞ্ছনা ও অপমানের কাজগুলিতেই তাহাদের অধিকার সীমাবদ্ধ; গোরু-চরান, মেষ-প্রতিপালন প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর কাজ তাহাদের। ইতর প্রাণীরা যতদিন বাঁচিয়া থাকে, যতদিন তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়, ততদিন তাহাদের ইংরাজী নাম থাকে; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাহারা মরিয়া রন্ধনের উপকরণে পরিবর্ত্তিত হয়, ভোজ্যদ্রব্যে রূপান্তরিত হইয়া খানার টেবিলে সজ্জিত হয়, তখনই তাহারা ইংরাজী নাম বিসর্জ্জন দিয়া নর্মান নাম গ্রহণ করে। কাঁচা মাল ইংরাজী নামেই চলে; কিন্তু তৈয়ারী বিলাস-দ্রব্য নর্মান-নামে পরিচিত। "Sheep" কথাটি ইংরাজী, "Mutton" নর্মান; "Deer" ইংরাজী, "Venison" নর্মান। এই ভাষা-বৈষম্যের মধ্য দিয়াই তখনকার ইতিহাস সুন্দরভাবে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

কিন্তু ভগবান যাহাদের প্রতি অনুকূল, অনিষ্টের মধ্য দিয়াই তাহাদের ইষ্ট সংসাধিত হয়। এই পরাধীনতার গ্লানির মধ্য দিয়াই এক নূতন, শৌর্য-বীর্য-সম্পন্ন, মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ ইংরাজ জাতি গড়িয়া উঠিল। কিছুদিনের মধ্যেই বিজেতা-বিজিতের সম্পর্ক বিলুপ্ত হইয়া ইংরাজ ও নর্মান পরস্পরের সহিত নিশ্চিহ্নভাবে মিশিয়া গেল। নর্মান ইংলণ্ডকেই নিজ জন্মভূমি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া নূতন দেশপ্রেমিকতায় উদ্বুদ্ধ হইল। রক্ত ও ধর্ম এক থাকার ফলে উভয় জাতির মিলন খুব সহজ ও সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠিল।

এই নূতন দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত, মিলিত জাতি স্বদেশে স্বাধানতা-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়া যথেচ্ছাচারী রাজা জনের (John) নিকট নিজ স্বাধীনতার স্বত্বাধিকার (Magna charta) কাড়িয়া লইল। প্রথম ও তৃতীয় এডওয়ার্ডের আমলে তাহারা নিজেদের নব-লব্ধ শক্তি-পরীক্ষার জন্য বিদেশ-আক্রমণে উদ্যোগী হইল। বহুধা-বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদ-সমষ্টি হইতে এক পরাক্রান্ত অপূর্ব-গৌরব-মণ্ডিত জাতি সংহত হইয়া উঠিল।

(৪)

ভাষা ও সাহিত্যের দিক্ দিয়া এই মিলন-কাহিনী আরও বিচিত্র ও বিস্ময়কর। নর্মানদের মাতৃভাষা ফরাসী; নর্মানজয়ের পর দুই শতাব্দী ধরিয়া ফরাসী ভাষা ইংরাজীকে সম্পূর্ণ কোণ-ঠেসা করিয়া রাখিয়াছিল। রাজ-সভায়, সভ্য-সমাজে, আলাপ-আলোচনা ও ভাব-বিনিময়ে, বিচারালয়ে, আইন-সভায়—সর্বত্রই ছিল ফরাসীভাষার একাধিপত্য। ইংরাজী-ভাষা পরাধীন জাতির ভাষা, ইতর জনসাধারণের ভাষা বলিয়া সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল হইতে নির্বাসিত হইয়া দেশের অখ্যাত কোণগুলিতে আত্মগোপন করিয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় রচিত সাহিত্য সাহিত্যের সমস্ত মর্যাদা হারাইয়া পল্লীগাথার পর্যায়ে নামিয়াছিল—সমস্ত সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের অবহেলা, রাজসভা ও অভিজাতবর্গের অনাদর ইহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। ইহার সাহিত্যিক উৎকর্ষ ও বিষয়গৌরব যুগপৎ নষ্ট হইয়া ইহা ইতিহাসের শুষ্ক সারসঙ্কলন, ধর্মের নীরস তত্ত্বালোচনা ও উপদেশ-সংগ্রহে পরিণত হইয়াছিল।

এই চরম দুর্গতির মুহূর্তে জাতীয় মিলনের মহাসন্ধিক্ষণ এই অবজ্ঞাত সাহিত্যের মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করিল। জাতীয় মিলনের সহিত তাল রাখিয়া ভাষা ও সাহিত্যগত মিলনও গড়িয়া উঠিল। ক্রমশঃ দুই শতাব্দীব্যাপী উপেক্ষা ও অবহেলার ধূলি-জঞ্জাল ঝাড়িয়া ফেলিয়া ইংরাজী ভাষা আবার মাথা তুলিল। ফরাসী ভাষার শব্দ, ভাব-সম্পদ ও ছন্দো-বৈচিত্র্য অনায়াসে ইহা আত্মসাৎ করিয়া লইল। ফরাসী ভাষার সহিত সংমিশ্রণে ইহার প্রসার ও পরিধি, ইহার ব্যঞ্জনা ও প্রকাশ-শক্তি আশ্চর্যরূপ বাড়িয়া উঠিল। ফরাসী ভাষার মধ্য দিয়া বিশ্বের ভাব-ধারা, সমুদয় সভ্য-

জগতের মানস-সংস্কৃতি ইহার শুষ্ক-প্রায় ধমনীতে নবীন, সতেজ রক্তধারার ন্যায় সঞ্চারিত হইল। ইংরাজী ভাষা অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহার অর্ধস্ফুট শৈশব অতিক্রম করিয়া পূর্ণ যৌবনের শক্তি লাভ করিল।

ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আশ্চর্য-রূপ বিকাশ ও পরিণতির ইতিহাসে পূর্ববর্ণিত ব্যাপারের অনুরূপ দৃশ্য দেখা যায়। অবশ্য ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে কোন রক্ত-সম্পর্ক ছিল না; সুতরাং রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাহাদের মিলন সম্ভবপর হয় নাই। ভাষা ও সাহিত্যের দিক্ দিয়াও ইহাদের পার্থক্য এত বেশী যে ইংরাজীর প্রভাবে বঙ্গভাষা কতকটা পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইলেও ইহারা এক হইয়া মিশিয়া যাইতে পারে নাই। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার যে মিলন তাহা আরও বহুগুণে বেশী নিবিড় ও অন্তরঙ্গ। ইংরাজী ভাষা নিজ বৈশিষ্ট্য না হারাইয়া যতটা ফরাসী উপাদান আত্মসাৎ করিতে পারে ততটাই নিজ পুষ্টিবিধানের জন্য গ্রহণ করিয়াছিল। উভয়ে মিশিয়া এক নূতন ইংরাজী ভাষার সৃষ্টি হইল—ইহা কেবল ফরাসী ভাষার অনুকরণ মাত্র নহে।

(৫)

ভাষার নবার্জিত শক্তির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় শক্তিশালী প্রতিভাবান্ লেখকের আবির্ভাবে। তৎপূর্বে ভাষার কতটা উন্নতি হইল তাহা বোঝা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই বাঙ্গালা ভাষা ইংরাজী ভাব ও ভাষা আপনার দেহে-মনে গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু মাইকেল ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে এই সুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফল সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের বিশেষ কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। একদিন হঠাৎ বিস্মিত হইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পাঠক গদ্যে-পদ্যে সাহিত্যের এই অতর্কিত যৌবনোন্মেষ লক্ষ্য করিল; একদিন হঠাৎ দেখিল যে-সমস্ত নূতন মাল-মশলা সাহিত্য-ভাণ্ডারে জমা হইতেছিল, তাহারা পুরাতনের সহিত এক হইয়া গিয়াছে ও এই নূতন ও পুরাতনের সংমিশ্রণের ফলে এক নূতন বাঙ্গালা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

ইংলণ্ডের চতুর্দশ শতাব্দীতে যে নূতন মিশ্রভাষা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে, তাহাকে সাহিত্যিক রূপ ও সুষমা দিয়াছেন মহাকবি চসার (Chaucer) (১৩৪০-১৪০০)। চসারই এক হিসাবে আধুনিক ইংরাজী কবিতার জনক।

তিনিই প্রথম মধ্যযুগের সীমা ছাড়াইয়া আধুনিক যুগে পদার্পণ করিয়াছেন। সময়ের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে চসার মধ্যযুগের লোক। মধ্যযুগ-সুলভ সাহিত্যরীতির অনেক চিহ্ন তাঁহার লেখায় বিদ্যমান। তাঁহার প্রথম বয়সের লেখার মধ্যে অধিকাংশই অনুবাদ বা পূর্বতন সাহিত্যের ছায়া অবলম্বনে লিখিত। তিনি মোটামুটি সেই যুগের প্রসিদ্ধ ফরাসী ও ইটালীয় লেখকদের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শেষ বয়সে লিখিত "Canterbury Tales" নামক অমর আখ্যায়িকা তাঁহার প্রতিভা ও সরস মৌলিকতার আশ্চর্য পরিচয়। এই আখ্যায়িকার মুখবন্ধে ("Prologue") তিনি খুব সূক্ষ্ম লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা, উচ্চাঙ্গের রসিকতা ও সেই সময়ের সমাজের ছবি আঁকার শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এই মুখবন্ধে তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের বিভিন্ন শ্রেণী, সম্প্রদায় ও ব্যবসায়ের প্রতিনিধি বত্রিশজন লোক তীর্থযাত্রী হইয়া Canterburyর পবিত্র পীঠ দর্শনে যাইতেছেন। এক হোটেলে সকলে সমবেত হইয়াছেন। হোটেলের মালিকও এই তীর্থযাত্রীর দলে ভর্তি হইয়াছে। যাত্রার পূর্বে সর্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেকে যাইবার ও ফিরিবার পথে দুইটি করিয়া গল্প বলিয়া যাত্রীদের পথক্লেশ অপনোদন ও মনোরঞ্জন করিবেন। যাঁহার গল্প সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হইবে তাঁহাকে অপর সকলে সেই হোটেলেই (নতুবা হোটেল-রক্ষকের লাভ হয় না) এক ভোজে সম্বর্ধিত করিবেন। সেই উপলক্ষে এই কিঞ্চিদধিক ত্রিশজন যাত্রীর পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাব-ভঙ্গী, চরিত্র ও ব্যবহারগত পার্থক্যের কি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও সুন্দর বর্ণনা করা হইয়াছে! মধ্যযুগের সমাজ যেন জীবন্ত মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত হইয়া তাহার অফুরন্ত বৈচিত্র্য ও প্রাণ-শক্তি লইয়া আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বর্ণনা ও বিশ্লেষণের মধ্যে চসার যে রসিকতাপূর্ণ মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা মধ্যযুগে দুর্লভ। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিনিধির আকৃতি ও প্রকৃতির যে চিত্র তিনি আঁকিয়াছেন তাহা সূক্ষ্মদর্শিতায় অতুলনীয়। বিশেষতঃ ধর্ম-যাজক-সম্প্রদায়ের চরিত্রে যে সব অসঙ্গতি ও দুর্বলতা আছে তাহাদের প্রতি তিনি একপ্রকার স্নেহ-মণ্ডিত বিদ্রূপ-কটাক্ষ করিয়াছেন, যাহার সরস কৌতুকপ্রিয়তা আধুনিক যুগেও উপভোগ্য। এই সরস ও সূক্ষ্ম বিদ্রূপশীলতা, যুগোচিত সংস্কারকে

অতিক্রম করিয়া স্বাধীন চিন্তার পরিচয়, সমাজ-সমালোচনার আশ্চর্য শক্তি—এ সমস্তই তাঁহার আধুনিকতার নিদর্শন। চসার ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্কীর্ণতা ঘুচাইয়া ইহাকে ইউরোপীয় ভাবধারার সহিত সংযুক্ত করিয়াছেন; তিনি মধ্যযুগের কুসংস্কার ও অতিরিক্ত গাম্ভীর্য ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে লঘু রসিকতার নির্ঝর বহাইয়াছেন ও নূতন ইংরাজী ভাষার সাহিত্য-গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে ইংরাজী সাহিত্যকে এক সম্মানিত আসন দান করিয়াছেন।

(৬)

চসারের সম-সাময়িক আর একজন লেখক ছিলেন—ল্যাংলাণ্ড, (Langland) যাঁহার নামও উল্লেখযোগ্য। চসারের সঙ্গে তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা, মেজাজ ও রচনানীতির মৌলিক প্রভেদ। চসার অনেকটা রাজদরবার-ঘেঁসা লোক ছিলেন; তিনি রাজ-পরিবার ও রাজসভার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত। অভিজাত সম্প্রদায়ের সঙ্গেই তাঁহার মেলামেশা ও রুচিগত ঐক্য ছিল। গরীবের কথা তিনি ভাবিতেন কম; মধ্যবিত্ত বণিক্, ব্যবসায়ী প্রভৃতিকে তিনি দেখিতেন যথেষ্ট সহানুভূতির সহিত, কিন্তু প্রধানতঃ অভিজাত-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া। বিশেষতঃ তাঁহার পরিহাস-রসিকের মনোবৃত্তি ছিল—জীবনের অসঙ্গতি-বিশ্লেষণের দ্বারা হাস্যরস যোগানই ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। জীবনের গভীর বেদনা, রিক্ত-বঞ্চিতদের হাহাকার, ক্ষুধাক্লিষ্ট, অত্যাচারিতদের অন্তঃরুদ্ধ ক্ষোভ, বিধাতার বিরুদ্ধে অভিমান ও বিদ্রোহ—এই সমস্ত কঠিন সমস্যার ধার ঘেঁসিয়াও তিনি যান নাই। তাঁহার রচনা পড়িয়া কাহারও সন্দেহ হইবে না যে, ইংলণ্ডের যে সমাজ-জীবন তাঁহাকে এত প্রচুর হাসির উপাদান যোগাইয়াছে তাহার মধ্যে এত অবিচার, এত ক্ষোভ ও বেদনা সঞ্চিত হইয়া আছে। নিরন্ন কৃষক ও শ্রমিকদের করুণ ইতিহাস তাঁহার মনে কোন সাড়া জাগায় নাই—ঐ যুগের কৃষক-বিপ্লবের বহ্নি-শিখা তাঁহার লেখায় কোন উত্তাপ সঞ্চারিত করে নাই। তিনি যে সমস্ত দুঃখের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার নায়ক-নায়িকারা হয় অভিজাতবংশীয়, নয় কাল্পনিক।

এই বাস্তব বেদনার সমস্ত দুঃসহতা, এই অভিমান ও বিদ্রোহের সমস্ত জ্বালা ল্যাংলাণ্ডের কবিতায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। তাঁহার "Vision of Piers Plowman" নামক কাব্যে জীবনের এই দুঃখময় দিক্‌টার পরিচয় পাওয়া যায়। শত শত নিরন্ন কৃষক ও শ্রমিক যে অবিচারপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার ফলে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া দারুণ অভাবে ক্লিষ্ট ও নিপেষিত হইতেছে, "Plowman" সেই ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুর তুলিয়াছে। ক্ষমতাশালী জমিদারদের অত্যাচার, রাজকর্ম্মচারীদের ঔদাসীন্য ও অসাধুতা, সর্ব শ্রেণীর মধ্যে কর্তব্যনিষ্ঠার অভাব ও ঘুসের ছড়াছড়ি, এমন কি বিচারালয়ে পর্যন্ত পক্ষপাতিত্ব, দুর্বলের বিরুদ্ধে প্রবলের সপক্ষতা—এই সমস্ত রকমের মিথ্যাচার ও কাপট্যই লেখক তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধের সহিত উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। আমাদের পুরাণে মুনি-ঋষিরা যেমন ধ্যানবলে পাপ ও অন্যায়কে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন, ল্যাংলাণ্ডও সেইরূপ ক্রোধবলে সমাজের সমস্ত আবর্জনারাশিকে পোড়াইয়া ফেলিতে চাহেন।

ল্যাংলাণ্ডের রচনাতে কাব্যের সুষমা ও মাধুর্য খুব বেশি নাই—তিনি দরিদ্রের দুঃখ মন প্রাণ দিয়া এত তীব্রভাবে অনুভব করিতেন যে কাব্য-সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য করিবার তিনি সেরূপ অবসর পান নাই। বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব কলা-কৌশলের দিকে তাঁহাকে উদাসীন করিয়াছে। তিনি এই দুঃখ-কাহিনী রূপকের (allegory) সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন। তখনকার দিনে সোজাসুজি রাজশক্তিকে আক্রমণ করা বেশ নিরাপদ ছিল না, সুতরাং রূপকের ছদ্মবেশে অপ্রিয় ও বিপদ্‌সঙ্কুল সত্য প্রকাশ করা সে সময়ের একটা রীতি ছিল। তিনি কল্পনা করিয়াছেন যে এই সমস্ত অত্যাচার ও অবিচারের দৃষ্টান্তগুলি তিনি যেন স্বপ্নে দেখিতেছেন—এবং তাঁহার রচনাতে স্বপ্নরাজ্যের অবাস্তবতা ও অসংলগ্নতা অনুভব হয়। কিন্তু এই অসংলগ্নতার পিছনে তাঁহার ক্রোধ ও ঘৃণার তীব্রজ্বালা সময় সময় আরও স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়।

আর এক বিষয়ে তিনি চসারের বিপরীত-ধর্মী ছিলেন। চসার তাঁহার রচনায় বাক্য ও ছন্দে নূতন পথ অনুসরণ ও পুরাতন আংলো-সাক্সন প্রথাকে বর্জন করিয়াছেন। ল্যাংলাণ্ড কিন্তু পুরাতনের অত্যন্ত পক্ষপাতী। Anglo-

Saxon-এর ছন্দোবৈশিষ্ট্য তিনি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন—নূতনের মোহ তাঁহাকে একেবারে স্পর্শ করিতে পারে নাই। রাজসভার আশে-পাশে ভাষা ও ছন্দের যে বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, অভিজাত প্রতিবেশের প্রতি ঘৃণাবশতঃ তিনি সেই পরিবর্তনকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার লেখা একদিকে যেমন সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট হইয়াছে, তেমনি অপরদিকে লুপ্তপ্রায় পুরাতনের প্রতি অচল নিষ্ঠাবশতঃ গৌরবান্বিতও হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চসারের পরবর্ত্তী সাহিত্য

(১৪০০—১৫৫০ খৃঃ অঃ)

চসারের মৃত্যুর পর প্রায় দেড়শত বৎসর ইংরাজী সাহিত্যের এক অবসাদের যুগ আসিয়াছিল। এই সুদীর্ঘকালে স্কট্‌ল্যাণ্ড ছাড়া ইংলণ্ডে কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হয় নাই। স্কটল্যাণ্ডে রাজা প্রথম জেমস্, ডগলাস্, ডানবার প্রভৃতি কবিরা চসারের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে সরস প্রাণধর্ম্মিতার অভাব নাই। ইঁহারা পুরাতনের পুনরাবৃত্তির সঙ্গে কতক নূতনত্বেরও প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু চসারের অনুবর্ত্তী ইংরাজ কবিদের মধ্যে মৌলিকতা একেবারেই ছিল না। ইঁহারা কেবল অন্ধ, অক্ষম অনুকরণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি যে চসারকে তাঁহারা গুরু বলিয়া মানিতেন, তাঁহার কবিতার আসল সুরটুকুও তাঁহারা ধরিতে পারেন নাই। তাঁহাদের হাতে কবিতা নীরস, প্রাণহীন, গদ্যময় হইয়া পড়িল। সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা এই সৃষ্টিশক্তির দৈন্যের নানারূপ কারণ দেখাইয়াছেন। প্রথমত এই দেড়শত বৎসর ইংলণ্ডে নানারূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার যুগ। অবশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহের সঙ্গে সাহিত্য-সৃষ্টির কোন স্বাভাবিক বিরোধ নাই। বরং অনেক সময় দেখা যায় যে যুদ্ধের উদ্দীপনা সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে নূতন রস ও প্রাণবেগ সঞ্চার

করিয়াছে। কিন্তু যে যুদ্ধ সাহিত্যের প্রেরণা যোগায়, তাহার পেছনে একটা প্রবল জাতীয়তা-বোধ বা বীরত্বপূর্ণ, গৌরবময় আদর্শ থাকা চাই। নতুবা শক্তিক্ষয়কারী গৃহযুদ্ধ বা নীতিজ্ঞানহীন বর্বর অভিযান কেবল ক্লান্তি ও অবসাদ আনে। তৈমুরলঙ্গ বা নাদির সাহের আক্রমণ, যাহা কেবল নৃশংস দস্যুতার নামান্তর মাত্র, কোন কবি-প্রেরণাকে উদ্বুদ্ধ করে নাই। ইংলণ্ডের এই যুগে Wars of the Roses নামে বহুবর্ষব্যাপী এক গৃহযুদ্ধ ঘটিয়াছিল—রাজ-পরিবারের দুই শাখা সিংহাসনের দাবী লইয়া এই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়াছিল। এই যুদ্ধের পিছনে কেবল স্বার্থসিদ্ধি ও উচ্চাভিলাষ ছাড়া আর কোনও উচ্চতর আদর্শ ছিল না—কাজেই পরবর্তী যুগে Shakespeare-এর দুই-একখানি নাটক ছাড়া কাব্যসৃষ্টি হিসাবে ইহার কোন প্রভাব দেখা যায় না। আবার ইহার ঠিক পরের যুগে স্পেনীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের আত্মরক্ষার উদ্যম সমস্ত জাতির প্রাণে সাড়া জাগাইয়াছিল ও উচ্চতম কাব্যসৃষ্টির হেতু হইয়াছিল। সুতরাং যুদ্ধের প্রকৃতির উপর ইহার সাহিত্যিক প্রভাব নির্ভর করে।

কিন্তু এই যুগের সাহিত্যিক-শূন্যতার আরও গুরুতর কারণ আছে। এই শতাব্দী ইউরোপ ও ইংলণ্ডের মানস-ক্ষেত্রে নূতন বীজ-বপনের যুগ। Renaissance বা নব-জাগরণের পূর্ব-সূচনা এই সময়েই ইউরোপের সমস্ত দেশে অনুভূত হয়। এই নবীন জীবনের দক্ষিণা বাতাস সর্বপ্রথম ইটালী ও ফ্রান্সে বহিতে আরম্ভ করে। গ্রীক সভ্যতার আদর্শ প্রথম এই দুই দেশেই প্রভাব বিস্তার করে। মধ্য যুগের সমাজ ও ধর্মের শৃঙ্খল-মোচন, মুক্ত-মানবের স্বাধীনতার স্ফুরণ, নূতন আশা ও কল্পনার উদ্দীপনা, পৃথিবী ও মানব-জীবনের প্রতি নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী, বহির্জগতে ও মনোরাজ্যে নূতন আবিষ্কার —Renaissance-এর এই সমস্ত লক্ষণই ইটালী ও ফ্রান্স হইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে ছড়াইয়া পড়ে। ইংলণ্ড এই নূতন ভাবধারা আত্মসাৎ করিতে, এই নূতন পরিবর্তনের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে, এত ব্যস্ত ছিল যে সৃষ্টি করিবার কথা তাহার মনেই উদয় হয় নাই। গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করা, পুরাতন কীটদষ্ট পুঁথির ভিতর হইতে সৌন্দর্য আহরণ করা, নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়া

অজ্ঞাত কূলে-উপকূলে অবতরণ করা—এই সমস্ত কাজেই তাহার সমস্ত শক্তি নিযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং এই সমস্ত নূতন মাল মসলার ভার ঠেলিয়া সৃষ্টিশক্তির উন্মেষ একটু কঠিন ব্যাপার ছিল। যাঁহারা বীজ বপনের সঙ্গে সঙ্গেই পরিণত শস্যের শ্যামশ্রী দেখিতে চাহেন, তাঁহারা যেমন হতাশ হন, যিনি এই যুগের সাহিত্যে উচ্চ সৃষ্টিশক্তির নিদর্শন পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহাকেও সেইরূপ হতাশ হইতে হইবে।

অবশ্য সবচেয়ে বড় কথা হইতেছে প্রতিভার অভাব। প্রতিভার বাতাস নিজ ইচ্ছানুসারে বহে, তাহাকে কোন নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন করা যায় না, কোন বায়ুনির্দেশক যন্ত্রে তাহার গতিবিধি ধরা পড়ে না। সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা এই সত্য মানিতে চাহেন না বলিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ইহার কারণ খোঁজেন। হয়ত আবেষ্টনের প্রভাব একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। কিন্তু বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক Taine এর মত আবেষ্টনেই সাহিত্য-সৃষ্টির একমাত্র ব্যাখ্যা খুঁজিলে একদেশদর্শিতারই পরিচয় দেওয়া হয়। আনুষঙ্গিক কারণে প্রতিভার জন্ম-রহস্যের নির্ধারণ হয় না। যে কারণেই হউক, এই যুগে প্রথম শ্রেণীর কোন সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়াই এ সময় ইহার এত দুরবস্থা হইয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

এলিজাবেথের যুগের সাহিত্য—প্রথমার্দ্ধ

(১৫৫০—১৬৫০ খৃঃ অঃ)

(১)

এলিজাবেথের যুগ ইংরাজী সাহিত্যের একটী গৌরবময় অধ্যায়। এই যুগে জাতীয় জীবনের একটা সর্বাঙ্গীণ স্ফুরণ সাধিত হইয়াছিল। রাজনীতিক্ষেত্রে নব বল সঞ্চার, সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টিশক্তির বিকাশ, নূতন আবিষ্কারের উন্মাদনা, জীবনের রহস্যময় বৈচিত্র্যের নিগূঢ় অনুভূতি এই সমস্ত দিক দিয়াই এক নূতন ঐশ্বর্য্যের লক্ষণ পরিস্ফুট। এই বিস্ময়কর বিকাশের কারণ নির্দেশ

সহজ নহে। নদীতে জোয়ার-ভাঁটার মত জাতির জীবনেও জোয়ার-ভাঁটার খেলা আছে। কোন কোন যুগে জাতীয় জীবন শীর্ণ-সঙ্কুচিত হইয়া অভ্যাসের বালি ভাঙ্গিয়া কোনমতে বহিয়া যায়। আবার কখনও কখনও ইহার উপর দিয়া প্রবল তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয় ;—কূলে কূলে ভরা নদীর মত ইহা দুই ধারে সৌন্দর্য ও শক্তি বিস্তার করিতে থাকে।

ইউরোপে প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া এই নূতন বিকাশের জন্য বীজ-বপন চলিতেছিল। এই আন্দোলন Renaissance বা নব-জাগরণ নামে পরিচিত। মধ্যযুগে ইউরোপের অবস্থা অনেকটা ইংরাজী আমলের পূর্বে ভারতবর্ষের মত ছিল। ধর্মের ও ধর্মমতের আধিপত্য, স্বাধীন চিন্তার কণ্ঠরোধ, জীবনে গতানুগতিকের অনুবর্তন, শাসনক্ষেত্রে রাজশক্তির দুর্বলতার জন্য সামন্ততন্ত্রের (Feudalism) অভ্যুদয়, যথেচ্ছাচারের প্রাদুর্ভাব এবং ঐক্য ও সংহতির অভাব—এ সমস্তই জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়াছিল। দেশের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ছিল না ; ধর্মগ্রন্থ ছাড়া আর কোন বই পড়া হইত না। আমাদের দেশে পুরোহিতের অনুশাসনের মত ধর্মযাজকের মতামতই জীবনের ক্ষুদ্রতম ব্যাপারকেও নিয়ন্ত্রিত করিত। অজ্ঞান ও কুসংস্কারের ঘন অন্ধকার মানুষের চিন্তাশক্তি ও বিচার-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন-আবৃত করিয়া রাখিত।

এই দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অকস্মাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পূর্ব-দিগন্তে আলোকরেখা ফুটিয়া উঠিল। এক ঘোর বিপদ হইতেই এই শুভ-মুহূর্তটীর উদ্ভব। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনষ্টান্টিনোপলে যে পতনোন্মুখ গ্রীক্-সাম্রাজ্য কোনও মতে টিকিয়া ছিল, তাহা তুর্ক আক্রমণের ঝটিকায় ভূমিশায়ী হইল। এই সাম্রাজ্যের আশ্রয়ে যে সমস্ত পণ্ডিত প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় সংস্কৃতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন তাঁহারা এই বিপদে আশ্রয়চ্যুত হইয়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ছড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের করধৃত আলোক-বর্তিকাগুলিও এই সমস্ত দেশে রশ্মি-বিকীরণ আরম্ভ করিল। ইউরোপের অর্দ্ধ-সভ্য জাতিগুলির সম্মুখে এক বহুকাল-বিস্মৃত, উজ্জ্বল সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদর্শ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

গ্রীক্ ও রোমীয় সাহিত্য কোনদিনই স্বাধীন চিন্তার মর্যাদা হারায় নাই। রাজনৈতিক অধঃপতনের দিনেও তাহার ললাটে এই গৌরবময় রাজতিলক

ভাস্বর হইয়া ছিল। গ্রীক সাহিত্য মানবের মুক্ত আত্মার জয়গানে চির-মুখরিত, ইহার দর্শন স্বাধীন চিন্তার লীলাভূমি ও উচ্চ আদর্শের অনুধ্যানে গৌরবান্বিত, ইহার শিল্প সৃষ্টি-প্রতিভার চূড়ান্ত নিদর্শন। ইহার সংস্কৃতির প্রধান লক্ষ্য মানবের সর্বাঙ্গীণ পরিণতি। ইউরোপ এই সৌন্দর্যের সন্ধান পাইয়া আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠিল; এই নব চিন্তাধারার উগ্র মদিরা আকণ্ঠ পান করিয়া প্রতি শিরা-ধমনীতে নব জীবনের সঞ্চার অনুভব করিতে লাগিল। চারিদিকে শৃঙ্খল-মুক্তির ধূম পড়িয়া গেল। মানুষ সঙ্কীর্ণতার অন্ধ কারাগার হইতে নব জীবনের মুক্তির মধ্যে দাঁড়াইয়া এক অভূতপূর্ব আনন্দের আস্বাদ পাইল। এই অতি পরিচিত, পুরাতন পৃথিবীর ধূসর অবগুণ্ঠন খসিয়া গেল, ইহার রূপ-রস-সৌন্দর্য মানব চিত্তের উপর এক আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করিল। দেখিতে দেখিতে মানুষ নূতন আবিষ্কারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। কলম্বস অপার সমুদ্রে পাড়ি দিয়া নূতন মহাদেশের কূলে ভিড়িলেন। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাজ্যবিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনের অভিযান সুরু হইল। কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিও সৌরজগৎ সম্বন্ধে নূতন তথ্য আবিষ্কার করিলেন —পৃথিবী তাহার সনাতন প্রতিবেশী গ্রহ-উপগ্রহদের বিষয়ে সজাগ হইয়া উঠিল। লুথার ধর্মরাজ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া প্রত্যেক মানুষকে ভগবানের সঙ্গে স্বাধীন সম্পর্ক স্থাপনের অকুণ্ঠিত অধিকার দান করিলেন। মানব-মন তাহার হারান অধিকারগুলি একে একে ফিরিয়া পাইয়া পূর্ণ আত্মানুভূতি লাভ করিল ও নিজ হৃদয়ে নবসৃষ্টির রহস্যময় স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল।

(২)

ইংলণ্ডে এই নূতন আন্দোলনের যতটা প্রসার ও পূর্ণ পরিণতি হইয়াছে সম্ভবতঃ অন্য কোন দেশে তাহা হয় নাই। প্রথমত ইহার ফলে সেখানে এক নূতন জাতীয়তাবোধের উদ্ভব হইল। এই জাতীয়তা-বোধ পূর্ব দুই শতাব্দী ধরিয়া ধীরে ধীরে উদ্বোধিত হইতেছিল। এখন স্পেনের আক্রমণ-আশঙ্কায় ইহা তীব্র ও জলন্ত হইয়া উঠিল। স্পেনের আক্রমণের সূচনায় সমস্ত দেশে এক বিরাট ঐক্য-স্পন্দন অনুভূত হইল। এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়া ইংলণ্ডের দেশ-প্রীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। রাজ্ঞী এলিজাবেথ

এই নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের প্রতীক ও প্রতিমা হইয়া উঠিলেন। শত শত কবি-কণ্ঠে তাঁহার জয়-গান ঘোষিত হইল; শত শত যোদ্ধা তাঁহার চরণে ভক্তি-উপহার নিবেদন করিলেন। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজের অখণ্ড ঐক্যবোধ ও জলন্ত দেশানুরাগ ফুলে-ফলে বিকশিত হইয়া উঠিল। ইংরেজ ইউরোপীয় জাতিমণ্ডলীতে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিলেন।

বাণিজ্য ও রাজ্য-বিস্তারেও ইংরেজ অগ্রণী হইলেন। কলম্বশ আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন। কিন্তু তাহার প্রধান ফল ইংরেজের করায়ত্ত হইল। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। জাতির নব-লব্ধ শক্তি নানা দুঃসাহসিক সমুদ্রাভিযানে অভিব্যক্তি লাভ করিল। ড্রেক পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিলেন ও স্পেনদেশীয় রত্ন-জাহাজ লুণ্ঠন করিয়া ইংলণ্ডের কোষাগার সমৃদ্ধ করিলেন। দেশের গৌরব বর্দ্ধনে জীবন আহুতি দিবার রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধিয়া গেল। পৃথিবীর অজ্ঞাত, অখ্যাত ভূমিখণ্ড-সমূহে ইংলণ্ডের জয়-পতাকা উড্ডীন হইল। এইরূপে ইংলণ্ডের বিশ্বব্যাপী সূর্য্যাস্তহীন সাম্রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপন হইল।

(৩)

সাহিত্যে এই বিজয়াভিযানের কাহিনী আরও বিস্ময়কর। অল্প কথায় ইহার বিবরণ দেওয়া সুকঠিন। বসন্ত-পবন-স্পর্শে এক রাত্রির মধ্যে যেমন বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় অগণিত নব কিশলয়ের উদ্ভব হয়, তেমনি এক অনুকূল বায়ুর প্রভাবে ইংরাজী সাহিত্য দেখিতে দেখিতে ফুলে ফলে মঞ্জরিত হইয়া উঠিল। ইংরাজী ভাষা বহুদিন ধরিয়া ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, হঠাৎ সেই শক্তি এক অপরূপ সৌন্দর্যে সাহিত্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল। উষাগমে নানা নামহীন পাখীর কণ্ঠে যেমন সুরের কাকলী বাজিয়া উঠে, তেমনি অখ্যাতনামা লেখকদেরও রচনায় গীতি-কবিতার সুর ধ্বনিত হইল। আমাদের দেশে বৈষ্ণব কবিতার মত ইংরাজী গীতিকাব্যের মধ্যে কবি-কল্পনার অফুরন্ত নির্ঝর বহিয়া গেল। গদ্যরীতির মধ্যেও নূতন প্রাণসঞ্চার হইল। গদ্য এতদিন কবিতার অধীন করদ রাজ্যের মত ছিল—তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সুপ্রকট হয় নাই। কবিতার অলঙ্কারেই তাহার

প্রসাধন ও কাব্যের উচ্ছিষ্ট প্রসাদেই তাহার পুষ্টি ছিল। তাহার নিজস্ব একটা ছন্দ বা প্রকাশ-ভঙ্গী এ পর্যন্ত গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু এই শৃঙ্খল-মোচনের যুগে কবিতার অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইয়া গদ্য এক স্বাধীন রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিল। অবশ্য এখনও সে কবিতার প্রভাব সম্পূর্ণ বর্জন করিতে পারে নাই—তাহার গতিচ্ছন্দে এখনও কাব্য-লক্ষ্মীর নূপুর-ধ্বনি শোনা যায়। তাহার নিঃশ্বাস-বায়ু এখনও কাব্য-সৌরভে আমোদিত। দুই বিরোধী শক্তির টানে তাহার পদক্ষেপ এখনও অনিশ্চিত ও কম্পমান। তথাপি এই যুগে গদ্য নিজ প্রকৃত পরিচয়ের আভাস পাইয়াছে ও কবিতার সহিত সমকক্ষতা দাবী করিবার দুঃসাহস তাহার মনে জাগিয়াছে।

(৪)

কিন্তু এলিজাবেথীয় যুগের সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব নাটক-রচনায়। এই যুগের নাট্য-সাহিত্য শুধু ইংরেজী নহে, বিশ্বসাহিত্যের গৌরব। সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ বলেন যে জাতীয় জীবনে মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত না হইলে উচ্চাঙ্গের নাটক-রচনা সম্ভব হয় না। কাব্য-রচনা কবির নিজস্ব সৃষ্টি; কিন্তু নাটক-রচনা এক রকমের যৌথ কারবার। কবি-কল্পনার সহিত প্রতিদিনের বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাও থাকিতে পারে। কবি তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া নিজ নির্জন কাব্য-জগতে ধ্যান-মগ্ন থাকিতে পারেন। কিন্তু শ্রোতা বাদ দিয়া নাটক-রচনা চলে না। যেমন রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে তটের সহিত তরঙ্গের মৃদু সংঘাতেই নদীর জলে ঐকতান সুর বাজিয়া উঠে, সেইরূপ শ্রোতা ও লেখকের মধ্যে একাত্মবোধ হইতেই উচ্চাঙ্গ নাটকের জন্ম। তারপর নাটকের মধ্যে কবি-কল্পনা ও কর্মশক্তির এক আশ্চর্য সমন্বয় সাধিত হয়। সমগ্র জাতি যখন এক গৌরবময় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয় ও তাহা হইতে এক মহৎ কর্মপ্রেরণা লাভ করে, তখনই নাট্য-প্রতিভার বিকাশ সম্ভব। নাটক এক বিরাট কর্মজীবনের প্রতিচ্ছবি—এই নির্ভীক ও উদার কর্মপ্রচেষ্টা হইতেই ইহা নিজ গতিবেগ ও উত্তেজনা আহরণ করে। ইংলণ্ডে জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণে এই অবস্থাই বিদ্যমান ছিল—তাই সে যুগে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্‌শপিয়ার সেখানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

এলিজাবেথীয় যুগের প্রধান কীর্তি হইতেছে ইহার অতুলনীয় নাট্য-সাহিত্য। এই নাট্য সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও প্রসার এত অধিক যে স্বল্প পরিসরের মধ্যে ইহার একটা মোটামুটি পরিচয় দেওয়াও অসম্ভব। এই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে সর্বপ্রধান শেক্‌শপিয়ার। শত শত গ্রন্থে ইঁহার নাট্যপ্রতিভার বিশ্লেষণ ও রসাস্বাদের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এখনও ইঁহার সৃষ্টি-রহস্যের চরম তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। আমরা এই ক্ষুদ্র পরিচিতিতে মার্লো (Marlowe), শেক্‌শপিয়ার (Shakespeare) ও বেন জনসন (Ben Jonson)—এই ত্রিরত্নের সম্বন্ধে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

মার্লো শেকশপিয়ারের পূর্ববর্তী। মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার তরুণ শক্তির পূর্ণ পরিণতির পূর্বেই, এক সরাইখানায় উচ্ছৃঙ্খল দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে তাঁহার জীবন-নাট্যের উপর যবনিকাপাত হয়। তিনি দীর্ঘতর জীবন লাভ করিলে শেক্‌শপিয়ারের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিতেন কিনা এই বিষয়ে নানাবিধ অনুমানমূলক বিতর্কের অবতারণা হইয়াছে। এই সমস্ত অনিশ্চিত সম্ভাবনা বাদ দিলেও মার্লো যাহা লিখিয়াছেন তাহার উপরই তাঁহার গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রথমতঃ তিনি নাটকের মধ্যে জ্বলন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা, কল্পনার স্পর্ধিত ঊর্ধ্বগতি, গীতিকাব্যের মূর্চ্ছনা ও শব্দঝঙ্কার সঞ্চারিত করিয়া ইহাকে উন্নত ধরণের আর্টে পরিণত করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ নূতন যুগে মানুষের মন যে অপরিমিত উচ্চাভিলাষ ও অসাধ্যসাধনের আকাঙ্ক্ষার বাষ্পোচ্ছ্বাসে আন্দোলিত হইতেছিল, তিনি নাটকের চরিত্রাবলীর মধ্যে তাহাকে রূপ ও ভাষা দিয়াছেন। তাঁহার তৈমুরলঙ্গ (Tamberlane) দিগ্বিজয়ের দুরন্ত বাসনায় কক্ষচ্যুত গ্রহের ন্যায় ছুটিয়া চলিয়াছে। তাঁহার "Jew of Malta" অপরিমিত ধনসঞ্চয়ের নেশায় বিভোর। তাঁহার "Dr. Fastus" জ্ঞানাহরণের অতৃপ্ত প্রেরণায় শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করিয়া তাঁহার আত্মাকে বিসর্জন দিয়াছেন—বুদ্ধি-সর্বস্ব সর্বজ্ঞতার কণ্টক-মুকুটের জন্য নীতি ও ধর্মজ্ঞানকে অস্বীকার করিয়াছেন। শেষে যখন চুক্তির মিয়াদ ফুরাইয়াছে ও শয়তান অঙ্গীকৃত দাবী মিটাইবার জন্য হাজির হইয়াছে তখন সেই নিঃসঙ্গ মধ্যরাত্রে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষার মুহূর্তে ফষ্টাসের অসহ্য অন্তর্দ্বন্দ্ব জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই দৃশ্যের নাটকীয় সংঘাত তীব্রতায় অতুলনীয়।

নাট্যসাহিত্যে মার্লোর স্মরণীয় অবদানের মধ্যে দুইটী বিষয় উল্লেখযোগ্য। (১) নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের প্রকাশের উপযোগী দৃঢ়বদ্ধ, ওজস্বী ভাষা ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন ও (২) জীবন্ত, প্রাণশক্তিতে ঐশ্বর্যশালী চরিত্র-সৃষ্টি। অবশ্য এই সমস্ত নাটকোচিত গুণের সঙ্গে তাঁহার কতকগুলি ত্রুটিও ছিল। (১) তাঁহার পরিধি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ—তাঁহার ভাষা ও চরিত্র-পরিকল্পনার মধ্যে বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব। (২) তাঁহার রচনায় Humour বা মার্জিত হাস্যরসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। (৩) স্ত্রী-চরিত্র অঙ্কনেও তিনি সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া অধিকাংশ সমালোচকই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হইলেও তিনি শেক্‌শপিয়ারের সমকক্ষ হইতে পারিতেন না।

চতুর্থ অধ্যায়

এলিজাবেথের যুগের সাহিত্য—দ্বিতীয়ার্দ্ধ
শেক্‌শপিয়ার ও তাঁহার পরবর্তিগণ

(১৫৯০—১৬২৫ খৃঃ অঃ)

(১)

শেক্‌শপিয়ার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য অপরিহার্য কারণে উচ্ছ্বসিত স্তুতিবাদের মতই শোনাইবে। অথচ তাঁহার সমগ্র নাটকাবলী অভিনিবেশ সহকারে পাঠ না করিলে ইহাকে যুক্তিহীন আতিশয্য বলিয়া মনে হইতে পারে। তাঁহার সম্বন্ধে ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন রুচির সমালোচকদের মধ্যে যে আশ্চর্য ঐকমত্য রহিয়াছে, তাহা অন্য কাহারও ক্ষেত্রে হয় নাই। তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার—এই মতবাদ একেবারে সর্ব্ববাদিসম্মত। অবশ্য Bernard Shawএর মত দুই একজন আধুনিক নাট্যকার শেক্‌শপিয়ারের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাহাত্ম্যে কিছু সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু, এই সংশয় মূলতঃ নাটকের উদ্দেশ্য ও নাট্য-রচনার পদ্ধতি লইয়া—শেক্‌শপিয়ারের প্রতিভা খর্ব করার কোন অভিপ্রায় ইহাতে লক্ষিত হয় না। বিশেষতঃ বার্ণার্ড শর সমস্ত মতবাদের মধ্যেই একটা চমকপ্রদ অতিশয়োক্তি থাকে—

যাহাতে তিনি প্রচলিত, সনাতন সংস্কারের ভিত্তি পর্য্যন্ত নড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহার মন্তব্যের প্রকৃত লক্ষ্য পাঠক-সমাজে ঘোষণা করা যে শেক্‌শপিয়ারের বিষয়-নির্বাচন ও রচনা-পদ্ধতি বর্তমান যুগের সমস্যার সহিত সম্পর্করহিত ও ইহার সমস্ত উৎকর্ষ স্বীকার করিয়া লইলেও আধুনিককালে ইহা অচল।

শেক্‌শপিয়ারের এই সর্ব-স্বীকৃত চরম উৎকর্ষের কারণ কি? (১) প্রথমতঃ চরিত্র-সৃষ্টিতে তাঁহার সিদ্ধহস্ততা তুলনা-বিহীন। তাঁহার নাটকে আমরা যত অধিকসংখ্যক জীবন্ত নরনারীর সাক্ষাৎ পাই, এত অন্য কোন নাট্য-সাহিত্যে নাই। তাঁহার প্রায় প্রত্যেক চরিত্র প্রাণ-শক্তিতে চঞ্চল, জীবনের নিগূঢ় রসে পরিপূর্ণ। মনে হয় তাহাদের দেহে কাঁটা ফুটাইলে উষ্ণ রক্তস্রোত বাহির হইয়া আসিবে। তাহাদের ভাষা, ভাব-ভঙ্গী, ব্যবহার, গভীর হৃদয়াবেগ—সমস্তই চরিত্র-কল্পনার সহিত আশ্চর্য্যরূপ সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাধারণতঃ সাহিত্যে সৃষ্ট নর-নারীর সহিত বাস্তব জীবনের ব্যক্তিবৃন্দের একটা পার্থক্য দেখা যায়—জীবনের পূর্ণাঙ্গতা সাহিত্যে প্রায় প্রতিফলিত হয় না। জীবনে যে সমস্ত লোকের সংস্পর্শে আমরা আসি, তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের একটা অতৃপ্ত কৌতূহল থাকিয়া যায়—মনে হয় তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইলাম না। জ্ঞাতের পিছনে অজ্ঞাত অংশ উঁকি মারিয়া তাহাদের চারিদিকে একটা রহস্যময় প্রতিবেশ সৃষ্টি করে—তাহাদের ব্যক্তিত্বের পরিধি ও প্রসার আমাদের জ্ঞানের সীমা ছাড়াইয়া বর্ধিত হয়। সাহিত্যে জীবনের যে খণ্ডাংশ অঙ্কিত হয়, তাহার বিশ্লেষণে কিন্তু একটা সম্পূর্ণতা থাকে। সাহিত্যিক আমাদিগের সম্মুখে যে অংশটুকু মেলিয়া ধরেন, তাহার রহস্য-সূত্রটুকুও আমাদের হাতে তুলিয়া দেন। শেক্‌শপিয়ারের চরিত্রাবলী আমাদের মনে বাস্তব জীবনের মানবের ন্যায় একটা অমীমাংসিত জিজ্ঞাসার উদ্রেক করে। তাহাদিগকে উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিয়াও যেন তাহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা কোনও শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি না। নাটক-সীমার বহির্ভূত তাহার পূর্বজীবন ও উত্তর জীবন লইয়া আমরা নানা প্রশ্নের অবতারণা করিয়া থাকি। যেমন সত্যিকার মানুষের চরিত্র-ব্যাখ্যা লইয়া, তেমনি শেক্‌শপিয়ারের সৃষ্ট চরিত্রাবলীর প্রকৃতি পর্য্যালোচনায়, অশেষ

প্রকারের মতভেদ বর্তমান। ফলষ্টাফ (Falstaff) কি সত্য সত্যই কাপুরুষ ছিলেন? হ্যামলেটের (Hamlet) হৃদয়ের গভীরতম স্তরে কোন্ জীবনাদর্শ আত্মগোপন করিয়া আছে? ওথেলোর (Othello) নৃশংস দানবীয়তা কি স্বাভাবিক? রাজা লীয়রের (Lear) উদ্ভট খেয়ালকে গোড়া হইতেই পাগলামির পর্যায়ভুক্ত করা যায় কি না? ম্যাক্‌বেথের অধঃপতনের দায়িত্ব তাহার, না তাহার স্ত্রীর বেশী—এই সমস্ত জটিল প্রশ্ন আমাদের মনকে নানা সংশয়ে আন্দোলিত করিতে থাকে। তাহাদের মুখের কথা, নাট্যকারের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ও নির্দেশ—এ সমস্ত সাক্ষ্য যেন আমরা সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে পারি না—অবিশ্বাস কোথা হইতে মাথা তুলিয়া উঠে। নাট্যে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহার পিছনে অব্যক্ত অংশ আমাদের মনে ছায়াপাত করে ও আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে সন্দেহাকুল করিয়া তোলে। ইহাই শেক্‌শপিয়ার-সৃষ্ট চরিত্রগুলির উৎকর্ষের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(২) শেক্‌শপিয়ারের নাটক সম্বন্ধে লক্ষ্য করিবার দ্বিতীয় বিষয়, তাহাদের জনপ্রিয়তা। সুদূর এলেজাবেথীয় যুগ হইতে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত এই বিষয়ে এক বিস্ময়জনক রুচিগত ঐক্যের নিদর্শন মিলে। অনেক নাট্যকার যুগবিশেষের সমস্যা লইয়া কারবার করেন—ভিন্ন যুগে রুচি-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পূর্বপ্রতিষ্ঠা ম্লান হইয়া আসে। আবার অনেকে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের উচ্চ ভূমিতে দাঁড়াইয়া প্রকৃত জনসাধারণের রুচির অনুবর্তনকে নিন্দনীয় মনে করেন, বর্তমান সাফল্যের জন্য সনাতন আর্টের বলি দেওয়া তাঁহারা অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। শেক্‌শপিয়ারের মধ্যে এরূপ কোন অবজ্ঞা বা আত্মাভিমানের চিহ্নমাত্র নাই। জনসাধারণের সঙ্গে তাঁহার একটী সহজ ও স্বাভাবিক মিলন-ক্ষেত্র রচিত হইয়াছে—কৃত্রিম শিক্ষাভিমান এই মিলনের পথে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করে নাই। শেক্‌শপিয়ার তাঁহার যুগের সমস্ত ইতর, কদর্য রুচিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, ও আশ্চর্যভাবে ইহাদিগকে বিশুদ্ধ ও সংস্কৃত করিয়া চির সৌন্দর্যলোকে উন্নীত করিয়াছেন। সেকালের লোকে ভাঁড়ামিতে আমোদ উপভোগ করিত। শেক্‌শপিয়ারের অনেক নাটকে এই ভাঁড় আবির্ভূত হইয়া সাধারণ লোককে রস পরিবেশন করিয়াছে। কিন্তু এই স্থূল অমার্জিত হাস্য-পরিহাসের মধ্যে কবি এমন একটি সুর

লাগাইয়াছেন, এমন করুণ মূর্ছনা ঝঙ্কৃত করিয়াছেন যাহাতে তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে—ভাঁড়ামির অর্থহীন প্রলাপের মধ্যে জীবন সম্বন্ধে সূক্ষ্মতম অন্তর্দৃষ্টি বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় ঝলকিত হইয়াছে। তৎকালীন শ্রোতৃবর্গ মারামারি-রক্তপাতের পক্ষপাতী ছিল—শেক্‌শপিয়ার এই রুচি পূর্ণ মাত্রায় সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এই খুনাখুনি ও রক্তপ্রবাহের মধ্যে নিয়তির নিগূঢ় লীলা, ন্যায়-বিচারের সূক্ষ্ম ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই অস্বাভাবিক সংঘটনগুলিকে উদার বিশ্বনীতির অঙ্গীভূত করিয়াছে। আকস্মিকের মধ্যে চিরন্তনের আবিষ্কার, বিশেষ যুগের খেয়ালের মধ্যে সর্বযুগ-সাধারণ সনাতন নীতির প্রয়োগ নাট্যকারের উৎকর্ষের একটা মানদণ্ড।

(৩) তৃতীয়তঃ, উদার, অপক্ষপাত মনোভাব শেক্‌শপিয়ারের আর একটি বিশেষত্ব। নাট্যকারের আদর্শ, নৈর্ব্যক্তিকতা (impersonality) ; তিনি চরিত্র সৃষ্টি করিবেন, কিন্তু কাহারও পক্ষাবলম্বন করিবেন না। নানা লোকের মুখে তিনি নানাবিধ মতবাদ আরোপ করিবেন, কিন্তু এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে তাঁহাকে ধরা ছোঁওয়া যাইবে না। অধিকাংশ নাট্যকারই এই আদর্শ সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে পারেন না। চরিত্রাবলীর মতাভিব্যক্তির মধ্যে তাঁহাদের নিজ মানসিক প্রবণতা বা ঝোঁক অজ্ঞাতসারে ফুটিয়া উঠে। শেক্‌শপিয়ার কিন্তু এই অভিযোগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। নানা সমালোচক তাঁহার রচনা খুব সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া তাঁহার প্রকৃত মনোভাবের কণামাত্র আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র-সমূহের অন্তরালে তিনি সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়াছেন। তাহার মুখোস খুলিয়া কেহ তাঁহার প্রকৃত মুখাবয়বের পরিচয় পান নাই। তাঁহার রাজনৈতিক ও দার্শনিক মতবাদ, জীবন সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা, তাঁহার পারিবারিক ও সামাজিক আদর্শ—সবই অনিশ্চিত ও রহস্যাবৃত। যাঁহার নিকট এই অনন্ত-বৈচিত্র্যময় মানব প্রকৃতি একেবারে স্বচ্ছ ও অনাবৃত, তাঁহার নিজ প্রকৃতি কেমন ছিল এবিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তিনি রাজতন্ত্র বা গণতন্ত্র কিসের পক্ষপাতী ছিলেন—হ্যামলেটের গভীর আত্ম-জিজ্ঞাসা, ফলষ্টাফের আদর্শ-লেশহীন বিলাস-বাদ, টাইমনের (Timon) মনুষ্যজাতির প্রতি ঘোর অবিশ্বাস, প্রস্‌পারোর (Prospero) প্রশান্ত জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য, মার্কুইসিওর (Mercutio) লঘু-তরল দৃষ্টি-ভঙ্গী—

কোন্‌টা নাট্যকারের আসল প্রকৃতি ও মনোভাবের দ্যোতনা তাহা কেহই জোর করিয়া বলিতে পারে না। তিনি এই সমস্ত পরস্পর-বিরোধী আদর্শের মধ্যে এমন সূক্ষ্মভাবে তুলাদণ্ড ধরিয়াছেন যে দাঁড়িপাল্লা কোন দিকেই অণুমাত্র হেলিয়া পড়ে না।

কিন্তু কোন চরিত্র-বিশেষের সহিত শেক্‌শপিয়ারকে একাত্ম করিয়া না দেখিলেও, সমগ্র নাটকাবলী হইতে তাঁহার যে ব্যক্তিত্ব ধীরে ধীরে মূর্তি পরিগ্রহ করে তাহার গভীরতা ও প্রসারে আমরা বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়ি। সৎ, অসৎ, সংকীর্ণ, উদার, উচ্চ, নীচ সকলের প্রতিই তাঁহার একই প্রকারের স্নেহ-দৃষ্টি—কেহই তাঁহার সর্বব্যাপী সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। সকলেরই মনের কথা তিনি বুঝিয়াছেন, সকলেরই আত্মসমর্থনে তিনি সায় দিয়াছেন। তিনি সকলের সঙ্গে এক সাধারণ সমতল-ভূমিতে বিচরণ করেন; নীতিবিদের উচ্চ মঞ্চ হইতে কাহাকেও সমালোচনা করেন নাই, বিচারাসনে নিজেকে অধিষ্ঠিত করিয়া পাপ-পুণ্য অনুসারে দণ্ড পুরস্কার বিতরণের স্পর্ধিত মনোভাব দেখান নাই। যে ভগবান বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারী সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের প্রতি তাঁহার মনোভাব কি তাহা আমরা জানি না, কিন্তু অনুমান করিতে চেষ্টা করি। আমরা কল্পনা করিতে ভালবাসি যে ভগবান সমাজ-পতির রক্তচক্ষু লইয়া পাপীর বিচার করিতে চাহেন না। ভগবানের এই উদার, স্নিগ্ধ ক্ষমাশীলতা সম্বন্ধে আমরা শেক্‌শপিয়ারের নাটক হইতে ধারণা করিতে পারি। যে জাতিগত বিদ্বেষ আমাদের সকলেরই অস্থিমজ্জার সহিত মিশিয়া থাকে, শেক্‌শপিয়ার তাহাকেও সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়াছেন। মধ্যযুগে ইহুদী জাতীর বিরুদ্ধে একটা ঘোরতম বিদ্বেষ ও অবজ্ঞা ইউরোপের সমস্ত দেশেই বদ্ধমূল ছিল। "ঘৃণিত কুক্কুর"—ইহাই ইহুদীকে সম্বোধন করিবার প্রচলিত প্রথা ছিল। যাহাকে আমরা ঘৃণা করি সে ক্রমশঃ ঘৃণ্যই হইয়া উঠে—এই সনাতন নীতি অনুসারে ইহুদীরাও অতি ক্ষুদ্রচেতা, সন্দেহ-পরায়ণ, প্রতিহিংসা-প্রবণ ও অসামাজিক হইয়া উঠিয়াছিল। শাইলক-চরিত্র এই যুগব্যাপী ঘৃণা ও অবিচারের স্বাভাবিক পরিণতি—শেক্‌শপিয়ার তাহার স্বভাবের বিকৃতি ও বীভৎসতা দেখাইতে কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু এই বহু-নিন্দিত ইহুদী জাতির প্রতিও তাঁহার

মনের কোণে স্নিগ্ধ সহানুভূতি সঞ্চিত ছিল। শাইলকের সপক্ষে যাহা বলিবার আছে তাহা তিনি অননুকরণীয় বাগ্মিতা ও অখণ্ডনীয় যুক্তি-তর্কের সহিত ব্যক্ত করিয়াছেন। শাইলকের আত্ম-পক্ষ সমর্থনসূচক অমর উক্তি—'ইহুদীর কি চক্ষু কর্ণ নাসিকা নাই? তাহার সুখ-দুঃখ-বোধ, মান-অপমান জ্ঞান নাই? তাহাকে আঘাত করিলে রক্তপাত হয় না?'—সমস্ত নির্যাতিত মানবজাতির কণ্ঠ-নিঃসৃত প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ-ঘোষণা।

(৪) শেক্‌শপিয়ারের কবিত্ব-শক্তি ও মানুষের সামাজিক জীবন সম্বন্ধে পরিপক্ক বহুদর্শিতাও তাঁহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী উৎকর্ষের অন্যতম কারণ। নাট্যকারের পক্ষে নিছক কাব্যোচ্ছ্বাসের অবকাশ সীমাবদ্ধ। তিনি নিজের জবানীতে কবিতা লিখিতে পারেন না, সমস্ত তাঁহার পাত্র-পাত্রীর মুখে আরোপ করিতে হয়। কাজেই চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য না রাখিয়া কবিতা লিখিলে তাহা অপকর্ষেরই হেতু হইয়া থাকে। তাঁহার ট্রাজেডির নায়কেরা ও কমেডির প্রেমিকেরা অতি স্বাভাবিক ভাবে উচ্চাঙ্গের কবিতার মধ্য দিয়া তাঁহাদের আবেগ-প্রকাশের ভাষা পাইয়াছেন। ম্যাকবেথ, রাজা লিয়র, ওথেলো, হ্যামলেট, প্রসপারো, রোমিও (Romeo)—ইহাদের সকলের গভীর হৃদয়াবেগ যে অতুলনীয় কবিতায় ব্যক্ত হইয়াছে তাহাতে প্রমাণ হয় যে শেক্‌শপিয়ার একখানি নাটক না লিখিলেও কেবলমাত্র কবি হিসাবে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিতেন।

তারপর জীবন ও ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁহার যে সমস্ত মূল্যবান্ মন্তব্য আছে তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই সুপরিচিত। এগুলি যেন অভিজ্ঞতা-সমুদ্র মন্থন করিয়া আহরণ করা রত্ন। শেক্‌শপিয়ারের নাটক হইতে উদ্ধৃত বাক্যাংশ-গুলি প্রবাদ বাক্যের মতই লোকের মুখে মুখে চলা-ফেরা করে। ইংরেজী ভাষার সুভাষিত-সংগ্রহে এক শেক্‌শপিয়ারের অবদান যত বেশী এত আর কাহারও নয়।

এই কয়েকটি মাত্র বিষয়ের আলোচনায় সাহিত্য-জগতে শেক্‌শপিয়ারের আসন কত উচ্চে তাহার কিঞ্চিৎ ধারণা হইবে। সমালোচকবৃন্দ যেন পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া মহাকবির গুণাবলী-নির্ণয়ে প্রশংসার চরম ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। অপরিমেয় সৃষ্টি-রহস্যের কৌশল যদি কোন মানুষ কিছু

আয়ত্ত করিয়া থাকেন, তবে সে শেক্‌শপিয়ার—দুর্জ্ঞেয় মানব-হৃদয় তাঁহার নিকট যেন স্ফটিক-স্বচ্ছ; তিনি যেন ভগবানের "গুপ্তচর" হিসাবে তাঁহার সর্বদর্শিতার অংশভাক্‌ হইয়াছেন। সৃষ্টি-মন্ত্রের গোপন অক্ষর কয়েকটী যেন সৃষ্টি-কর্তা তাঁহার কানে কানে শুনাইয়াছেন। আবার আর এক দিক দিয়া এই মূক, বিরাট, অলক্ষিত, অথচ অভ্রান্ত রূপে ক্রিয়াশীল প্রকৃতি দেবীর সঙ্গেও তাঁহার এক নিগূঢ় সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। শেক্‌শপিয়ারের আর্ট এত নির্ভুল ও সূক্ষ্ম যে ইহা মানুষের চেষ্টাকৃত রচনা অপেক্ষা প্রকৃতির স্বতঃ উৎসারিত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কথাই বেশী মনে পড়াইয়া দেয়। মনে হয় যেন এই বিরাট জড়প্রকৃতির দেহে যে গূঢ় শক্তি অজ্ঞাতসারে কাজ করিয়া ফুল ফোটায়, ফল পাকায়, ঋতুচক্রের আবর্ত্তন নিয়ন্ত্রিত করে, গ্রহনক্ষত্রের নিয়মিত কক্ষ-ভ্রমণের প্রেরণা যোগায়, তাহাই যেন মুহূর্তের আত্মবিস্মৃতিতে মানবের সচেতন বুদ্ধির মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া মহাকবির অনুপম কাব্যসৃষ্টির হেতু হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা উচ্চতর প্রশংসার দ্বারা পৃথিবীর কোন কবিই এ পর্যন্ত অভিনন্দিত হন নাই।

(২)

শেক্‌শপিয়ারের পরেই এলিজাবেথীয় যুগের নাটকের অধোগতি আরম্ভ হইল। তাঁহার পরবর্তী নাট্যকারেরা যথেষ্ট শক্তির অধিকারী ছিলেন—কিন্তু শেক্‌শপিয়ারের ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য আর কাহারও ছিল না। ক্রমশঃ নাটকের চরিত্রগুলি অস্বাভাবিক—নাটকীয় সমস্যা অবাস্তব হইতে আরম্ভ হইল। যে নাটক সর্বসাধারণের প্রিয় ছিল তাহা কেবলমাত্র অভিজাত শ্রেণীর প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিল। কবিতার সহিত চরিত্রের অসামঞ্জস্য বাড়িয়া চলিল। অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের লক্ষণ চারিদিকে প্রকট হইয়া উঠিল। শেক্‌শপিয়ারের পরবর্তীদের মধ্যে বেন জনসন (Ben Jonson) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি অত্যন্ত স্বাধীন-চিত্ত লোক ছিলেন—শেক্‌শপিয়ারের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়া তিনি নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই নূতন পথ নাটকের প্রশস্ত রাজপথ ছিল না। তিনি প্রধানতঃ ব্যঙ্গ-প্রধান মনোবৃত্তি লইয়া নাটক রচনায় ব্রতী হইলেন। কাজেই তাঁহার চরিত্রগুলি অতিরঞ্জিত ও একপেশে হইয়া পড়িল। তিনি মানব-চরিত্রের

বিচিত্র জটিলতা পরিহার করিয়া তাহার একটী বৈশিষ্ট্যের উপর অতিরিক্ত জোর দিলেন। ইহার ফলে তাঁহার নর-নারীরা যেন ব্যঙ্গ চরিত্রের (caricature) সামিল হইয়া পড়িল। মানুষ যদি কেবল একমাত্র খেয়াল বা অভিপ্রায়ের বিকাশ হইত, তাহা হইলে মনুষ্য-চরিত্র অতি অস্বাভাবিকরূপে সরল হইয়া পড়িত। পরস্পর বিরোধী ভাবের সমন্বয় বলিয়াই ইহা এত দুর্জ্ঞেয় ও রহস্যপূর্ণ। বেন জনসন এই সত্যকে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার অসাধারণ শক্তি সত্ত্বেও নাটকগুলি উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই। "Every Man In His Humour" তাঁহার এই জাতীয় নাটকের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আর একজাতীয় নাটকেও তাঁহার এই ব্যঙ্গপ্রধান মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে—এগুলি লণ্ডন সহরের "Under-world" বা চোর-বদমায়েস-প্রতারকদের আড্ডা ও ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে লিখিত। এই সমস্ত নাটকেও বেন জনসনের বিদ্রূপ-নিপুণতা উৎকট তীব্রতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। নাটকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের স্থান আছে সত্য; কিন্তু ইহাকেই প্রধান স্থান দিলে নাটক ব্যঙ্গকবিতার একটা বিভাগ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ ব্যঙ্গের সঙ্গে অতিরঞ্জনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ব্যঙ্গের বিষয়ীভূত ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাহার দোষত্রুটির উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হয়। কাজেই নাটকের যে প্রধান গুণ—গভীর ও অপক্ষপাত চরিত্রাঙ্কন—তাহা এই জাতীয় নাটকে অপরিহার্য ভাবেই বর্জিত হইয়া পড়ে। তথাপি এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বেন জনসনের নাটকীয় প্রতিভার এতটা বিকাশ হইয়াছে যে তিনি আমাদের সবিস্ময় শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। এই বিষয়ে শেক্‌শপিয়ারের সঙ্গে বেন জনসনের একটা গভীর প্রভেদ দেখা যায়। শেক্‌শপিয়ারের কোন কোন নাটকে চোর বদমায়েস ও লম্পটদের জীবন-যাত্রা বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু ইহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার বিন্দুমাত্র উষ্মা বা বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায় না। তিনি তাহাদের ক্রীড়াশীলতা, তাহাদের কৌতুকপ্রিয়তা, জীবনকে নীতিশাসনের বন্ধন হইতে ছাড়াইয়া লইয়া পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করার ব্যাকুলতা "ক্ষমা-সুন্দর চক্ষে" নিরীক্ষণ করিয়াছেন—বিশুদ্ধ হাস্যরসের প্রস্রবণে তাহাদের দেহমনের পঙ্কিলতা ধুইয়া দিয়াছেন। এইখানেই শেক্‌শপিয়ারের মহত্ত্ব ও গৌরব—

এইখানেই তিনি তাঁহার সমসাময়িকদিগকে বহুদূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

পৃথিবীর সাহিত্যে যে কয়েকটী স্বল্প-সংখ্যক গৌরবময় যুগ আছে, এলিজাবেথীয় যুগ তাহার মধ্যে বোধ হয় শ্রেষ্ঠতম। গ্রীসে পেরিক্লিসের (Pericles) যুগ, রোমে অগষ্টাসের (Augustus) যুগ, ফ্রান্সে চতুর্দশ লুই (Louis XIV) এর যুগ ও ইংলণ্ডে রোমান্টিক যুগ ইহার সহিত অনেকাংশে তুলনীয়। কিন্তু উচ্ছল প্রাণশক্তির অবারিত প্রাচুর্যে ও চিন্তা ও কর্মের সমন্বয়ে এলিজাবেথীয় যুগেরই অবিসংবাদিত প্রাধান্য।

(৩)

আর একজন মনীষীর আলোচনা না করিলে এলিজাবেথীয় সাহিত্যের বিবরণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইনি সেই যুগের বিখ্যাত গদ্য-লেখক বেকন্ (Bacon)। নাটক ও কাব্য ছাড়াও গদ্য রচনার ক্ষেত্রেও অসাধারণ কৃতিত্ব এই যুগের সমৃদ্ধি ও বহুমুখীনতার সাক্ষ্য দেয়। বেকন্ রাজ-কার্য্য ও রাজনীতি-চর্চ্চার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার এই বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে তিনি যে বহুদর্শিতা ও ব্যবহারনীতি-কুশলতা আহরণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রচিত সন্দর্ভাবলীতে (Essays) উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। যে যুগে কবিরা সাধারণতঃ আদর্শবাদ ও স্বপ্নবিলাসের পক্ষপাতী ছিলেন ও নাট্যকারেরা জীবনের উচ্চতম বিকাশগুলি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, সেই যুগে বেকন্ ব্যবহারিক জীবনের দুর্বলতা ও রাজনীতির বক্র, কুটিল উপায়-প্রয়োগের কথাই লিখিয়াছেন। মানুষের লোভ-মোহ-দুর্বলতার সুযোগ লইয়া কিরূপে তাহাদিগকে বশীভূত করা যায়, ব্যবসায়ক্ষেত্রে কিরূপ কৌশলে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন সম্ভব, রাজ্য-পরিচালনায় কূটনীতি-প্রয়োগের দ্বারা প্রজার অসন্তোষ ও বিরুদ্ধতাকে কিভাবে পরিহার করা যায়; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিবেশী শক্তির মনে নিজ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিরূপে ভ্রান্ত ধারণা জন্মান যায়, এই সমস্ত মূল্যবান্ উপদেশে তাঁহার সন্দর্ভগুলি পূর্ণ। তাঁহার ভাষা ও বাক্য-বিন্যাস-রীতিও বাহুল্যবর্জ্জিত, সংক্ষিপ্ত, সূচ্যগ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ ও প্রবাদবাক্যের ন্যায় স্মরণীয়। রাজনীতি-চর্চা যাঁহাদের জীবন-ব্রত তাঁহাদের পক্ষে বেকনের এই সন্দর্ভাবলী অমূল্য সম্পদ।

বেকনের নৈতিক আদর্শ খুব উচ্চ ছিল না বলিয়া তিনি অনেকের নিকট নিন্দাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক এই নিন্দা তাঁহার প্রাপ্য নহে। মানুষের আদর্শ কি হওয়া উচিত তাহা তাঁহার বক্তব্য বিষয় নয়। কিভাবে চলিলে আমাদের এই বাস্তব জীবনে আধিপত্য ও প্রভাব লাভ করা যায় সেই উপায়গুলি তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। এই যশ যাঁহাদের কাম্য, তাঁহাদের বেকন্-নির্দিষ্ট পথে চলিতেই হইবে। পার্থিব প্রতিষ্ঠার উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিতে চাই, অথচ যে আঁকা-বাঁকা, বন্ধুর পথ এই চূড়াতে পৌঁছাইয়া দিতে পারে তাহার প্রতি অবজ্ঞাসূচক নাসিকা-কুঞ্চন করিব—এই মনোবৃত্তি আদর্শবাদের প্রতি নিষ্ঠা ত নয়ই, বরং ভণ্ডামি।

গীতা ও উপনিষদের আদর্শে যেমন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বিচার চলিতে পারে না, তেমনি খৃষ্টধর্মের পর্বতে বাণী-প্রচারের (Sermon on the Mount) মানদণ্ডে বেকনের মূল্য নির্দ্ধারণ চেষ্টাও অবিধেয়। যেমন চাণক্য-নীতি তেমনই বেকনেরও সন্দর্ভ, বাস্তব প্রয়োজন ও অবস্থা হইতেই উদ্ভূত।

বেকনের চরিত্রে একটা আদর্শবাদের দিকও ছিল। কোন কোন সন্দর্ভে তিনি সত্য, ভগবানের আরাধনা প্রভৃতি উচ্চ আধ্যাত্মিক বিষয়েরও আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনাতেও গভীর আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাবনত বিশ্বাসের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। সংসারে উন্নতির কথা লিখিতে গিয়াও তিনি ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ, আকাশ-স্পর্শী মনন-শক্তি এই সমস্ত রহস্যের নিকট সম্ভ্রমে মাথা নীচু করিয়াছে। বাস্তবিক বেকনের চরিত্রের এই দুইটা দিকের মধ্যে সামঞ্জস্য করা কঠিন। তাঁহার এই দ্বৈত প্রকৃতি সমালোচকের নিকট একটা প্রহেলিকার মতই রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে এই সংশয় এক অদ্ভুত মতবাদে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কেহ কেহ এমন ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে বেকন্‌ই শেক্‌শপিয়ারের নাটকাবলীর প্রকৃত রচয়িতা।

আর একদিক দিয়াও বেকনের উপর যুগ-প্রভাব লক্ষিত হয়। তিনি কেবল সাহিত্যিক নহেন, বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রেও তিনি যুগান্তরকারী পরিকল্পনা প্রবর্তন করিয়াছেন। যাহাকে এখন বলা হয় Experimental Method, পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, তাহার ভবিষ্যৎ রূপ বেকন্ সর্ব্বপ্রথম প্রত্যক্ষ

করেন। অবশ্য তিনি নিজে বিজ্ঞান ও দর্শনে কোনও মৌলিক আবিষ্কার করেন নাই—কিন্তু নূতন পথ নির্দেশ করিয়াছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা বেকনের কৃতিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ও তাঁহার ঋণ স্বীকার করেন না। কিন্তু সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ের যে বিরাট্ কল্পনা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল তাহার অসমসাহসিকতা আমাদিগকে বিস্মিত করে। তিনি সমস্ত জ্ঞান আত্মসাৎ করিবার মহান্ ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে জ্ঞানচর্চা যেন একটা শুষ্ক, নীরস আলোচনা; জ্ঞানী জীবন হইতে দূরে থাকিয়া নিজ পাঠাগারে আবদ্ধ থাকেন। কিন্তু বেকনের যুগে জ্ঞান-আহরণ ছিল একটা অজ্ঞাত দেশাবিষ্কারের মত উন্মাদনাপূর্ণ। কলম্বস যেমন মহাসমুদ্রে পাড়ি দিয়া নূতন মহাদেশের তীরে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, বেকন্ও সেইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নূতন নূতন রাজ্য জয় করিবার কল্পনায় বিভোর ছিলেন। জ্ঞানার্জনে এই উন্মাদনাপূর্ণ মনোভাবই বেকনের উপর তাঁহার যুগের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় প্রভাব। এলিজাবেথীয় যুগের শেষ রশ্মিরেখা তাঁহার বুদ্ধিপ্রদীপ্ত মুখের উপর পড়িয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্য

(১৬২৫—১৭০০)

(১)

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংরাজী সাহিত্য আবার এক নূতন পথ ধরিল। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, সেইরূপ সামাজিক ও সাহিত্যিক জীবনেও প্রবল উদ্দীপনার পর শ্রান্তি ও অবসাদের ভাব আসে। এলিজাবেথীয় যুগের পর যে নূতন্ ধারা প্রবর্তিত হইল, তাহাতে কল্পনার উঁচু সুর অনেকটা নীচু গ্রামে নামিয়া গেল। শেক্‌শপীয়ারের রচনায় কবি-কল্পনার সহিত মনন-শক্তির একটা চমৎকার সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। পরবর্তী যুগে এই সমন্বয় বিচলিত হইল। বুদ্ধি এতদিন কল্পনার সহচরী ছিল; এখন সে স্ব-প্রধান হইয়া

উঠিল। এখন বরং কল্পনাই বুদ্ধির অধীন হইল। বুদ্ধির দৌড়ের সহিত পাল্লা দিতে গিয়া সে গলদ্‌ঘর্ম হইয়া পড়িল। এই বুদ্ধি-প্রাধান্য ও কল্পনার উদ্ভট মৌলিকতা সপ্তদশ শতাব্দীর কবিতার বৈশিষ্ট্য।

এই নূতন কবিতা-রীতির প্রতিষ্ঠাতা ডন্ (John Donne) এবং এই কবি-সম্প্রদায়ের সাধারণ নাম Metaphysical Poets বা দার্শনিক কবিসংঘ। ইঁহাদের কবিতাতে যে প্রধানতঃ দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা হইত, তাহা নহে, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে দার্শনিকের অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী ও মৌলিক চিন্তা-প্রণালী লক্ষিত হয়। যে চিন্তাধারা বা উপমা সহজে কাহারও মনে উদয় হয় না তাহাই ইঁহাদের কাব্যে প্রচুররূপে বিদ্যমান। সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি অপেক্ষা মনকে চমক দেওয়ার প্রতিই ইঁহাদের অধিক লক্ষ্য। সুষমা অপেক্ষা অভিনবত্বের প্রবর্তনই ইঁহাদের অধিক কাম্য। প্রেম-বর্ণনার যে চিরাগত প্রথা কাব্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইঁহারা তাহাকে পদে পদে উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন ও তাহার অতি-মাধুর্যের মধ্যে বাস্তবতার লবণাক্ত স্বাদ মিশাইয়াছেন। আমাদের সংস্কৃত কাব্য ও বৈষ্ণব কবিতার মত সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী কবিতাতেও কষ্ট-কল্পনার আতিশয্য দেখা যায়।

এই কষ্ট-কল্পনার একটা উদাহরণ দিলে ইহার প্রকৃতি বুঝা যাইবে। Donne 'মশকের' উপর এক কবিতা লিখিয়াছেন; ইহাতে তিনি কল্পনা করিয়াছেন যে এই মশক তাঁহাকে ও তাঁহার প্রিয়াকে একসঙ্গে দংশন করিয়া তাঁহাদের রক্তের সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছে এবং উভয়ের আত্মার মধ্যে সংযোগ-সেতু হইয়াছে। সুতরাং ইহা যেন তাঁহাদের সম্মিলিত ব্যক্তিত্বের অংশ ও তাঁহাদের মিলন-মন্দির স্বরূপ হইয়াছে।

কিন্তু এই কষ্ট-কল্পনা ও সৃষ্টি-ছাড়া চিন্তাসত্ত্বেও ডন ও তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত কবিরা প্রকৃত কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। সমস্ত ছদ্মবেশ ও অঙ্গ-বিকৃতির মধ্য দিয়াও তাঁহাদের প্রতিভার দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইয়াছে। বুদ্ধির মার-পেঁচের সহিত ভাবের আন্তরিকতা ও গভীরতার এক অপূর্ব সামঞ্জস্য ইঁহাদের কবিতায় লক্ষিত হয়। এক হিসাবে ইঁহারা কাব্য-পরিধির বিস্তার সাধন করিয়াছেন। আধুনিক যুগের মনন-শক্তির যত উন্মেষ ও পরিণতি হইতেছে, ভাব-গভীরতার স্থায়িত্ব ততই কমিয়া আসিতেছে। কোন

কবিই বর্তমান শতাব্দীতে বৈষ্ণব কবি বা রোমান্টিক যুগের কবিদের মত ভাবের তন্ময়তা ও একনিষ্ঠতা দেখাইতে পারেন না; নানারূপ সূক্ষ্ম ও জটিল চিন্তাস্রোত তাঁহার ভাবের সহিত গ্রথিত হইয়া পড়ে। কবিতার মধ্যে আধুনিক কবির উদ্‌ভ্রান্তচিত্ততা ও অস্থির-মতিত্ব প্রতিফলিত হইতেছে। গভীরতার অভাব ব্যাপ্তি, বিস্তার ও বৈচিত্র্যের দ্বারা পূর্ণ হইতেছে। এই বুদ্ধিবৃত্তির সক্রিয়তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছুই নাই—ইহাই আধুনিক মনের প্রকৃত প্রবণতা। আজকাল কবির মন ভাবের ইন্দ্রজালের সম্মোহনশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে চাহে না—অতি-সচেতন বুদ্ধিকে সৌন্দর্যের যাদুমন্ত্রে ঘুম পাড়ান যায় না। কোন কোন স্থলে সাময়িক প্রভাবে ভাবাবেশ নিবিড় হইয়া আসে, কিন্তু সাধারণতঃ এই নেশা টুটিতে বিশেষ বিলম্ব হয় না। আধুনিক কবিতার এই বুদ্ধিপ্রাধান্য সর্বপ্রথম ডন ও তাঁহার সমসাময়িক কবিদের রচনায় সূচিত হইয়াছে। এই হিসাবে তাঁহারা আধুনিকতার অগ্রদূত। প্রেম-কবিতার সনাতন Pattern বা গঠনপ্রণালী ইঁহাদের হাতেই নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কবিদের মধ্যে দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন মনোবৃত্তির পরিচয় মিলে। একদল রাজসভায় বর্ধিত। লঘু চাপল্য, ভোগ-বিলাস ও তরল আমোদ ইহাদের কবিতায় নৃত্যের চটুলছন্দে রূপান্তরিত হইয়াছে।

লভ্‌লেস (Lovelace), সাক্‌লিং (Suckling) প্রভৃতি কবিরা জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন। সেইজন্যই প্রত্যেক আনন্দময় মুহূর্তটিকে নিঃশেষে উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের তীব্রতর। কিন্তু ইঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী যতই হাল্‌কা হউক, ইঁহাদের কবিত্বশক্তি অবিসংবাদিত। সুখ-বুদ্‌বুদের প্রত্যেকটি ক্ষণস্থায়ী স্ফীতি, মোহভঙ্গের প্রত্যেকটি ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাস, স্মৃতির প্রত্যেকটি ছায়া-ধূসরিত পশ্চাদ্দৃষ্টি, নিখুঁত ছন্দ ও সঙ্গীতের সহিত ইঁহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুর ন্যায় উজ্জ্বল গীতি-কবিতায় ধৃত ও প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। আবার ইহারই মধ্যে স্থানে স্থানে হঠাৎ-প্রবুদ্ধ আভিজাত্য-গৌরব, বিপদের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন বেপরোয়া ভাব ও আদর্শ-নিষ্ঠার জন্য প্রাণ-বিসর্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প এক অপ্রত্যাশিত গভীর সুর ধ্বনিত করিয়াছে।

দ্বিতীয় দলের কবিতা ধর্ম-বিষয়ক। এই সময় রাজসভায় ব্যসনাসক্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এক কঠোর, আনন্দবর্জিত, আত্মনিপীড়নশীল ধর্মভাব মধ্যশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময়ই বিখ্যাত Puritan সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। এই Puritan মনোভাব দৈনিক আচার-ব্যবহারের সীমা লঙ্ঘন করিয়া ক্রমশঃ সাহিত্য ও আর্টে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইহার নিরানন্দ, শুষ্ক পরুষতা ততটা ততটা প্রকট হয় নাই; তখনও ইহাতে কল্পনার সরস স্পর্শ, উহার ক্রীড়াশীল ফেনপুঞ্জ সংলগ্ন ছিল। এই যুগের কবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যাকুল ধর্ম-জিজ্ঞাসা ও ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিবার আন্তরিক আগ্রহ ফুটিয়া উঠিয়াছে। Herbert, Vaughan, Crashaw প্রভৃতি কবি ধর্মশাস্ত্র-বর্ণিত ভগবানের সুদূর নির্লিপ্ততায় সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে নিকটতম আত্মীয়ের মত হৃদয়ের অভ্যন্তরে অনুভব করিতে চাহিয়াছেন; প্রেমের অশ্রু-পূর্ণ আবেগ ও বাষ্পরুদ্ধ প্রিয়সম্বোধন ঈশ্বর-আরাধনায় প্রয়োগ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। এই হিসাবে তাঁহাদের ধর্মকবিতার শ্রেষ্ঠত্ব আধুনিক যুগ পর্যন্ত অব্যাহত রহিয়াছে।

(২)

পিউরিট্যান মনোভাবের পূর্ণতম স্ফূর্তি ও সুন্দরতম বিকাশ হইয়াছে মহাকবি মিল্‌টনের (Milton) মধ্যে (১৬০৮-১৬৭৪)। শেক্‌শপিয়ার ও মিল্‌টন ইংরেজী সাহিত্যের দুই প্রধান কীর্তিস্তম্ভ। ইংরেজী সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের পরিচয় নাই, তাঁহাদেরও মুখে মুখে এই দুই নাম জনশ্রুতির মত প্রচলিত। কিন্তু ইঁহাদের মনোভাব ও সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে কি গভীর ব্যবধান! শেক্‌শপিয়ার উদার, অপক্ষপাত, মানুষের দুর্বলতার প্রতি ক্ষমাশীল ও কোনরূপ সংকীর্ণ মতবাদের বেষ্টনী-বহির্ভূত। মিল্‌টন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত—নৈতিক উচ্চভূমিতে বিচরণশীল, নিঃসঙ্গ, ইতর জনসাধারণের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ, পাপের প্রতি অসহিষ্ণু, একপ্রকার অসহ্য পুণ্য জ্যোতিঃ দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রজ্জ্বলিত হোমাগ্নির ন্যায় নির্মল তিনি, সাধারণ লোকের অনধিগম্য। তাঁহার কথাবার্তা, চাল-চলন, লিখনভঙ্গী সর্বত্রই এক দৃঢ়, অনমনীয় আভিজাত্যের ছাপ সুস্পষ্ট। সংসারের অগ্নি-পরীক্ষায় তিনি অচল, অটল; তাঁহার পূতচরিত্র

কলঙ্ক-লেশহীন; পাপের সঙ্গে তাঁহার আপোষহীন, প্রশ্রয়হীন যুদ্ধ। শেক্‌শপিয়ার ও মিল্‌টন দুই সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শের প্রতীক।

মিল্‌টনের কবিতার মধ্যে মধুর ও মহানের এক অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে। Renaissance বা ষোড়শ শতাব্দীর নব জাগরণের মধ্যে যে দুইটী ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছিল—সৌন্দর্যানুরাগ ও নীতিবোধস্ফূরণ—তাহারা মিল্‌টনের কাব্যের সাগর-সঙ্গমে আসিয়া মিশিয়াছে। মিল্‌টনের কবিতাবলীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার যৌবনের সৌন্দর্য-প্রীতি ক্রমশঃ কঠোর হইতে কঠোরতর সংযমের অধীন হইয়া শেষে Paradise Regained ও Samson Agonistesএর নগ্ন, বর্ণ লেশহীন, শুভ্র, প্রশান্ত গাম্ভীর্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। উপত্যকাস্থিত শ্যামল, বিচিত্র পুষ্পোদ্যান হইতে উন্নত শৈলশৃঙ্গের শ্বেত মহিমা—ইহাই যেন মিল্‌টন-কাব্যের ক্রমবিকাশের বিবর্তন-রেখা।

মিল্‌টনের তরুণ বয়সের রচনা L'Allegro ও Il Penserosoতেই তাঁহার প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় মিলে। প্রথম কবিতাটীতে আমোদ-প্রিয় ও দ্বিতীয়টীতে গম্ভীর-প্রকৃতি যুবকের বিভিন্ন রুচি ও দৈনিক কার্য-সূচি বর্ণিত। এই দুইটি কবিতা সম্বন্ধে বিখ্যাত সমালোচক জনসনের মন্তব্য স্মরণীয়—"তাঁহার আমোদেও চিন্তাশীলতার ছায়াপাত হইয়াছে, তাঁহার গাম্ভীর্যে চপলতার লেশমাত্র নাই।" এই উভয় কবিতাতেই কবির বিশুদ্ধ, সংযত রুচি, তাঁহার সাহিত্যিক সাধনা ও অশ্রান্ত জ্ঞানানুশীলন—এক কথায় তাঁহার উচ্চ আদর্শে উৎসর্গীকৃত জীবন—উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

Comus ও Lycidasএ তাঁহার Puritan মনোবৃত্তি ক্রমশঃ স্ফুটতর ও প্রখরতর হইয়াছে। আমোদমাত্রেরই দূষণীয়তা সম্বন্ধে তিনি যেন অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছেন। সৌন্দর্য সয়তানেরই মায়াজাল ও দুরূহ ব্রত-উদ্‌যাপনের সহিত তাহার স্বাভাবিক বিরোধিতা এই ধারণা তাঁহার মনে যেন ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইতেছে। কোমাসের সমস্ত আকর্ষণ, তাহার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতি ও নৃত্যগীত-কুশলতা তাহার নৈতিক বীভৎসতার ছদ্মবেশ-মাত্র। Lycidasএ পাপের প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরও তীব্র ও অনেকটা বিসদৃশ-ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার বাল্যবন্ধুর অকালমৃত্যুতে তিনি

শোক প্রকাশ করিতেছেন ও প্রাচীন যুগের সৌন্দর্য-স্মৃতির অলস রোমন্থনে ব্যাপৃত আছেন। হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল যে তাঁহার বন্ধু ধর্ম-যাজকের বৃত্তির জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই সম্পর্কে তৎকালীন যাজকবর্গের অর্থলোভ ও কর্তব্যচ্যুতি তাঁহার মনে এক প্রচণ্ড ক্রোধের উদ্রেক করিল। তাঁহার ভাবাবেশ ও সৌন্দর্যোপভোগ এক মুহূর্তেই ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। এই সমস্ত অসাধু, ধর্মহীন যাজকের বিরুদ্ধে তাঁহার তীব্র রোষ-হুংকার আকস্মিক বজ্র-নির্ঘোষের মত আমাদিগকে স্তম্ভিত করে।

Paradise Lost মহাকাব্য মিল্‌টনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা, পৃথিবীর মহাকাব্য-চয়ের মধ্যে অন্যতম। অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর অসাধারণ অধিকার, ভাষার ওজস্বিতা ও ধ্বনি-গাম্ভীর্য, ছন্দের গতি-বৈচিত্র ও দূর-বিসর্পিত, অবিচ্ছিন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ—(যাহাকে একজন বিখ্যাত সমালোচক গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষাবর্তনের সহিত তুলনা করিয়াছেন) এই সমস্ত এই অমর কাব্যের কতকগুলি অনমুকরণীয় গুণ। যদি দেবলোকের ভাষা কখনও মানুষের লেখনীতে ধ্বনিত হওয়া সম্ভব হইয়া থাকে, তবে তাহা মিল্‌টনের মহাকাব্যে হইয়াছে। এই মহাকাব্য উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে যেন তাহার ভাষার মধ্য হইতে মৃদঙ্গধ্বনির ন্যায় একপ্রকার সুললিত অথচ উদাত্ত-গম্ভীর সুর উত্থিত হইয়া পাঠককে অভিভূত করিয়া ফেলে।

মিল্‌টনের কল্পনাও তাহার ভাষাদেহের উপযুক্ত প্রাণশক্তি। ইহা স্থির, অকম্পিত জ্যোতিতে অপার্থিব, অলৌকিক বিষয়সমূহকে স্বচ্ছ ও আমাদের প্রত্যক্ষ-গোচর করিয়াছে। নরকের বীভৎসতা ও তীব্রজ্বালাময় আকাশ-বাতাস, স্বর্গের পুণ্য-সুরভিত শান্তি, নিষ্পাপ আদি মানব-দম্পতির রমণীয় আবাসস্থল স্বর্গোদ্যান—এই সমস্ত অপরিচিত দৃশ্যের মধ্যে তাঁহার কল্পনা দৃঢ়, দ্বিধাহীন পদক্ষেপের সহিত বিচরণ করিয়াছে। বিশেষতঃ নরক-বর্ণনা ও Chaos বা সৃষ্টির পূর্বে বস্তুপুঞ্জের আকারহীন, বিশৃঙ্খল অবস্থার চিত্র মিল্‌টনের কল্পনার চরম গৌরব। মানব-মন যতখানি বিভীষিকা পরিকল্পনা করিতে পারে, মিল্‌টনের নরক্-বর্ণনা সেই চরমসীমায় পৌঁছিয়াছে।

কিন্তু মিল্‌টনের এই স্বর্গ-নরক-বিহারী কল্পনারও মানবের পরিচিত জগতে পদস্খলন হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ,

আশা-আকাঙ্খার সহিত তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল না। তাঁহার একান্ত গম্ভীর অন্তঃকরণে হাস্য পরিহাসেরও সম্পূর্ণ অভাব। কাজেই মানবের ক্ষুদ্র জীবনের চিত্র আঁকিতে গিয়া তাঁহার বিরাট কল্পনা হোঁচট খাইয়াছে। আদি দম্পতির তিনি যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করে না। আদম ও ইভ যেন স্বতন্ত্র রাজ্যের অধিবাসী—আমাদের সহিত তাহাদের বিশেষ কোন একাত্মতা নাই। ইভের চরিত্রে মাধুর্য ও কমনীয়তার অভাব নাই, যদিও শেক্‌শপিয়ারের নায়িকাদের সহিত তুলনায় সে বিশেষত্ব-বর্জিত। আদমের গুরুমহাশয়গিরি আমাদের অত্যন্ত বিরক্তিজনক। ইভের সহিত কথাবার্তায় ও ব্যবহারে তাহার প্রণয় অপেক্ষা পুরুষোচিত শ্রেষ্ঠত্বাভিমানই বেশী ফুটিয়াছে। সদা-সর্বদাই এই কর্তৃত্ব-প্রিয়তার ঝাঁঝ একটা উগ্র গন্ধের মত তাহার চরিত্রের সহিত জড়িত হইয়াছে। ভগবানের আদেশ-লংঘনের প্রায় সম্পূর্ণ দায়িত্বই সে তাহার সহচারিণার স্কন্ধে চাপাইয়া নিজ অসৌজন্যের পরিচয় দিয়াছে। দাম্পত্য-সম্পর্কের এই মাধুর্যহীন চিত্র মিল্‌টনের নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে আহরিত হইয়াছে। স্ত্রীর প্রতি পরুষ ব্যবহার, নিজ উচ্চ-আদর্শের মানদণ্ডে তাহাকে বিচার করিবার কঠোর প্রবৃত্তি মিল্‌টনের ব্যক্তিগত জীবনের একটা প্রকাণ্ড দুর্বলতা।

স্বর্গের চিত্র আমাদের বিচার-বোধকে মোটামুটি পরিতৃপ্ত করিলেও মিল্‌টনের ঈশ্বর আমাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারেন না। আদমের আত্মগৌরব যেন শতগুণে বর্ধিত হইয়া Paradise Lostএর ঈশ্বর-পরিকল্পনায় মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। শেক্‌শপিয়রের সহিত মিল্‌টনের এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য। মিল্‌টনের ভগবান সর্বদাই আত্মপ্রসাদে স্ফীতমনা—বিদ্রোহী দেবদূতদিগকে শাস্তি দিয়া তিনি একপ্রকার নিষ্ঠুর আনন্দ অনুভব করেন। তিনি সর্বদাই যুক্তিতর্কের দ্বারা নিজ ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যস্ত। ভগবানের মুখে এইরূপ বাদপ্রতিবাদমূলক উক্তি বড়ই বিসদৃশ শোনায়। মানুষকে তিনি যে পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায়নিষ্ঠা অপেক্ষা মানবের অসহায়তাই বেশী ফুটিয়াছে। হয়ত মানুষ ভগবানের ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিলে, এইরূপ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে—সে ভগবানকে নিজের ছাঁচে না ফেলিয়া পারে

না। মানুষ যখন ভগবানের মুখে বাণী আরোপ করে, তখন তাঁহার মধ্যে নিজ অভ্রান্ততার গৌরব-ঘোষণার সুর অপরিহার্যভাবে ধ্বনিত হয়। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণীয় উক্তি, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ', ইহারই উদাহরণ। কোরাণেও বোধ হয় অনুরূপ নিঃসন্দিগ্ধতার প্রমাণ মিলিবে। তথাপি ধর্মতত্ত্ব হিসাবে ইহাদের শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই অনুভব করা যায়। গীতাতে ধর্মের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব ও উদার সর্বজনীন মত অভিব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের অর্জুনের প্রতি পরম সস্নেহ ব্যবহারের জন্যও, এই সর্বজ্ঞতার অহংকার অনেকটা চাপা পড়িয়াছে। মিল্‌টনের ধর্মালোচনায় উদারতা অপেক্ষা বিশেষ সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ মতবাদেরই প্রাধান্য—কাজেই ইহা যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিপক্ষের মত-খণ্ডনের অতিরিক্ত আগ্রহের দ্বারা ভারাক্রান্ত। বিশেষতঃ তাঁহার মতবাদ আধুনিক মনের উপযোগী নহে ; বর্তমান যুগ তাঁহার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে মিল্‌টনের প্রধান উদ্দেশ্য—ভগবানের মানুষের প্রতি আচরণের সমর্থন-প্রয়াস—অনেকাংশে ব্যর্থ হইয়াছে। সেইজন্য Paradise Lostএ ঈশ্বর অপেক্ষা সয়তানই অধিকতর জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে ও অনেক সমালোচকের মতে নায়কের গৌরব তাহারই প্রাপ্য।

সুগন্ধি বৃক্ষ-স্রাবের (amber) মধ্যে মক্ষিকার মৃতদেহের মত এই সমস্ত ক্ষুদ্র ত্রুটী মিল্‌টনের মহাকাব্যের অতুলনীয় গুণাবলীর সংসর্গে প্রায় উপেক্ষণীয়। তাঁহার মহাকাব্য হিমালয়ের শৃঙ্গের মত নিঃসঙ্গ গৌরবে মস্তক উন্নত করিয়া আছে। সমতল ভূমির লঘু, তরল সৌন্দর্য এখানে মিলিবে না ; কুটীরবাসী মানুষের হাঁসিকান্না এখানে নীরব ; হৃদয়বৃত্তির কোন বিশেষ জটিলতার এখানে একান্ত অভাব। এখানে জীবনের গতি একদিকে সহজ, সরল ; অন্যদিকে মহান, গম্ভীর, পবিত্র, মহিমাময়। মিল্‌টনের সঙ্কীর্ণতাকে উপহাস করা অতি সহজ ; তাঁহার অলৌকিক মহিমা এ পর্য্যন্ত অননুকরণীয়ই রহিয়াছে।

(৩)

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্য বিচিত্র ও বহুমুখীন ; স্বল্প পরিসরে ইহার পরিচয় দেওয়া কঠিন। নানা পরস্পর-বিরোধী প্রচেষ্টা ইহাতে পাশাপাশি ক্রিয়াশীল। ইহার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে আধুনিক মনো-

ভাবের স্ফুরণ। ষোড়শ শতাব্দীর রেণাসেন্স আন্দোলনে যাহার সূচনা, বর্তমান যুগে তাহা দৃঢ়ীভূত হইয়া সাহিত্য ও চিন্তাক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আধুনিক মনোভাবের প্রধান অঙ্গ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব। বেকনের রচনায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে কল্পনার প্রচুর সংমিশ্রণ ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে ইহা কল্পনাবর্জ্জিত হইয়া স্বপ্রধান হইয়া উঠিল। ধীর, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা চারিদিকে প্রকট হইল। Royal Society নামে প্রথম বৈজ্ঞানিক সংসদ স্থাপিত হইয়া বিচ্ছিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে সঙ্ঘবদ্ধ ও এক সাধারণ লক্ষ্যের দিকে নিয়ন্ত্রিত করিল। এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা সাহিত্যে ও ইতিহাসে পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইল। নির্ভুল তথ্য-সঙ্কলন ও যুক্তিবাদ সাহিত্য রচনার প্রধান লক্ষণ দাঁড়াইল। গদ্যের ভাষা পদ্যের প্রভাবমুক্ত হইয়া সহজ, সরল, দৈনন্দিন প্রয়োজন-সাধন ও ভাব-বিনিময়ের উপযোগী হইল। সাহিত্য আদর্শবাদের উচ্চভূমি হইতে অবতরণ করিয়া বাস্তবের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিল। ইহার সুর লঘু, ভাবাবেশ-মুক্ত, ব্যঙ্গাত্মক—এক কথায় বৈঠকে সম্মিলিত নাগরিক জীবনের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি হইয়া উঠিল। কবিতা-ধর্মী, কল্পনা-প্রধান গদ্যের শেষ উদাহরণ স্যার টমাস ব্রাউনের (Sir Thomas Browne) Urn Burial ও জেরেমি টেলারের (Jeremy Taylor) ধর্মবিষয়ক বক্তৃতাবলী। নূতন প্রয়োজনের চাপে ইহাদের সুদীর্ঘ বাক্যবিন্যাস হ্রস্ব, সংক্ষিপ্ত ও বাহুল্যবর্জিত হইয়া আসিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর এই নূতন ভঙ্গীর দ্বিবিধ অভিব্যক্তি—(১) ব্যঙ্গ-কবিতা, (২) দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির যুগের নাটক। ব্যঙ্গ-কবিতার প্রধান রচয়িতা ড্রাইডেন (Dryden) ও বাটলার (Butler)। বাটলারের Hudibras Puritanদের ভণ্ডামি ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ চাবুক—একজন Puritan ব্যবসায়ী ও তাহার ভৃত্যের হাস্যজনক ব্যঙ্গচিত্র। ড্রাইডেন এই নূতন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁহার গদ্য রচনা-রীতি ও সাহিত্য সমালোচনা এই নব আদর্শে অনুপ্রাণিত—আধুনিকতার সুর তাহাদের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে ধ্বনিত। ড্রাইডেনের ভাষা ও বচন-ভঙ্গি ঠিক যেন বিংশ শতাব্দীর ন্যায়। কিন্তু ব্যঙ্গ-কবিতাই তাঁহার

সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। তৎকালীন রাজনৈতিক ও ধর্মবিষয়ক যে তীব্র মতভেদ প্রচলিত ছিল, ড্রাইডেন তাহার এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রতিপক্ষকে তীক্ষ্ণতম বিদ্রূপাস্ত্রে বিদ্ধ করিয়াছেন। ব্যঙ্গ-কবিতা যে এত ধারাল ও মর্মভেদী হইতে পারে, তাহাতে প্রতিপক্ষকে যে এত হেয় ও হাস্যাস্পদ করিয়া দেখান যাইতে পারে তাহা ড্রাইডেনের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং ড্রাইডেনকে এই জাতীয় কবিতার প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে। তাঁহার প্রত্যেকটী পংক্তি যেন এক একটী অব্যর্থ শেলাঘাত। উপর্যুপরি কয়েকটী পংক্তি আঘাতের পর আঘাত স্তূপীকৃত করিয়া প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে। ড্রাইডেনের পয়ারকে একজন সমালোচক যুগলাশ্ব-বাহিত বিদ্যুন্ময় রথের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

ড্রাইডেনের ব্যঙ্গকবিতায় আরও কয়েকটী বিশেষত্ব আছে। প্রথম, কবিতার মধ্যে কূট-যুক্তিতর্কের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল রচনায় তাঁহার পারদর্শিতা অসামান্য। প্রতি যুগ্ম-পয়ারে এই শৃঙ্খলে একটী নূতন গ্রন্থি যোজনা হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ কবিতাটী যেন একটি মার্জিত ইস্পাতের অঙ্গাবরণের (armour) মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার ব্যঙ্গ-কবিতার একটা সনাতন সাহিত্যিক গুণ আছে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর কবিতা একটা বিশেষ উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া রচিত হয়। এই উপলক্ষ একটা সাময়িক তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করে; কিন্তু বাদ-বিতণ্ডা পুরাতন হইলে তাহা একেবারে শুষ্ক ও রসহীন হইয়া পড়ে। উদাহরণ স্বরূপ, গত শতাব্দীতে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের সহিত জড়িত বাদ-প্রতিবাদ ও বিদ্রূপাত্মক রচনা আধুনিক পাঠকের নিকট অর্থহীন কোলাহল ও ভোঁতা কাটারির খোঁচা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ড্রাইডেনের কবিতার বিষয়বস্তু পুরাতন হইলেও তাহার রস চির-নবীন। ক্ষণিক মতভেদের মধ্যে যে চিরন্তন সত্য নিহিত আছে তাহা তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়াছেন। সাময়িক তর্কের ধূলিজাল ও ঝড়ো হাওয়া যখন থামিয়া যায়, তখন এই দৃষ্টিরোধকারী বিক্ষোভের অভ্যন্তরে যে শাশ্বত দ্বৈতভাব স্থিরভাবে বিরাজিত তাহাই তাঁহার কবিতার ভিত্তিভূমি।

তৃতীয়তঃ, এই সমস্ত কবিতায় চরিত্র-সৃষ্টি আর একটী লক্ষণীয় বস্তু। সাধারণতঃ ব্যঙ্গ-কবিতা ব্যক্তি-বিশেষের বিরুদ্ধেই লিখিত হয়, এবং ড্রাইডেনেরও তাহাই হইয়াছে। কিন্তু প্রতি ব্যক্তিরই একটী প্রতিনিধিত্বমূলক রূপ আছে, উহা শ্রেণী বিশেষের বা কোন বিশেষ চারিত্রিক প্রবণতার মূর্ত বিকাশ। ড্রাইডেনের ব্যঙ্গ-কবিতা ব্যক্তিগত সীমা অতিক্রম করিয়া এই প্রতিনিধিত্বমূলক স্তরে পৌছিয়াছে। ব্যক্তিগুলি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কৌতূহল নাই; তাহারা অতীত যুগের বিস্মৃতির তলে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা যে শ্রেণীর বা চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধি, তাহারা সনাতন, সকল যুগেই বিদ্যমান। কাজেই ড্রাইডেনের কবিতা সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ ও রসবোধ কখনও লুপ্ত হইবার নহে।

(৪)

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ কৃতিত্ব হইতেছে ইহার নাটকে। রাজা দ্বিতীয় চার্লস তাঁহার নির্বাসনকালে ফরাসীদেশে বাস করিয়াছিলেন ও ফরাসী হাব-ভাব, আচার ও নৈতিক আদর্শ ইংলণ্ডে আমদানী করেন। এই সময়ে ফ্রান্স সভ্যতা, শিষ্টাচার ও আদব-কায়দায় ইউরোপের আদর্শ-স্থানীয় ছিল। একদিকে ইহার কথোপকথনের সরস চাতুর্য, বুদ্ধির তীক্ষ্ণ স্ফূর্তি ও আচার-ব্যবহারের সূক্ষ্ম সৌকুমার্য ও অপরদিকে ইহার কলুষিত নৈতিক জীবন আমাদের যুগপৎ শ্রদ্ধা ও ঘৃণার উদ্রেক করে। ফরাসী জীবনের ভাল ও মন্দ এই দুই দিকই রাজার অনুসরণ করিয়া ইংলণ্ডে পৌছিল। সাহিত্যে এই সামাজিক রীতি-নীতির প্রভাব এক নূতন ধরণের নাটকের প্রবর্তন করিল। ইহাকেই Restoration Comedy আখ্যায় অভিহিত করা হয়।

এই নাটকে দেশের দূষিত নৈতিক জীবন দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত হইয়াছে। ইহার নায়ক-নায়িকাদের জীবনের প্রধান কাম্য হইতেছে আমোদ ও ইন্দ্রিয়সুখ-স্পৃহা। কোনরূপ নীতির শাসন ইহারা মানে না। ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে ইহাদের মতামত অত্যন্ত উদার ও অসঙ্কোচ। ধর্ম ও পবিত্রতা, সংযম ও সুরুচি ইহাদের নিকট উপহাসের বস্তু। সমাজের সমর্থন ও

সহানুভূতি ইহাদেরই দিকে। যে ব্যক্তির গার্হস্থ্য জীবন ইহাদের দ্বারা বিপর্যস্ত, তাহাকে যতদূর সম্ভব হীন ও হাস্যাস্পদ করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। জীবনের করুণ ও মহান্ দিক এই নাটকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। ইহাতে জীবনের যে রূপ দর্শিত হইয়াছে তাহাতে ধারণা হয় যে জীবন-যাত্রা একেবারে কুসুমাস্তীর্ণ, 'জীবন যেন এক অন্তহীন, প্রমোদ-বিহ্বল বিলাস-রজনী। এই নাট্য-সাহিত্যের সাক্ষ্য অনুসারে সহজেই বোঝা যায় যে এই যুগে ইংরেজ জাতির নৈতিক অধোগতি নিম্নতম স্তরে পৌঁছিয়াছিল।

তবে এই নাটকের স্বপক্ষেও কিছু বলিবার আছে। ইহার ভাষা সূক্ষ্মাগ্র ও মার্জিত, ইহার রসিকতা শাণিত ও উজ্জ্বল, ইহার কথোপকথনের চটুল ঘাত-প্রতিঘাত নাট্যসাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। শেক্‌শপিয়ারের নাটকে যে পরিহাস-রসিকতা আছে, তাহা একদিকে যেমন বুদ্ধিতে ভাস্বর, তেমনি অপর দিকে গভীর ভাবাবেগে আর্দ্র ও সমবেদনায় স্নিগ্ধ। শেক্‌শপিয়ারের সহিত অন্য কোন নাট্যকারের তুলনা চলে না। কিন্তু শেক্‌শপিয়ারকে বাদ দিলে ও ইহার নৈতিক আবহাওয়া বরদাস্ত করিতে পারিলে অন্যান্য নাট্যসাহিত্যের সহিত তুলনায় ইহা একপ্রকার প্রতিযোগিতা করিতে পারে। এলিজাবেথীয় যুগের উচ্চ কবি-কল্পনা এখানে নাই, কিন্তু তাহার পরিবর্তে আছে গভীর সমাজ-জ্ঞান, সাধারণ মানুষের মানসিক প্রবণতার সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয়। বিশেষতঃ পূর্বতন যুগের ভাষাগত অসংযম ও ভাবগত অতিরঞ্জন এখানে নাই—সমস্তই স্বচ্ছ, পরিমিত ও স্বভাবানুযায়ী। দোষে গুণে সপ্তদশ শতাব্দীর নাট্যসাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

পঞ্চম অধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দী

(১৭০০—১৭৯৮)

(১)

অষ্টাদশ শতাব্দী ইংরাজী সাহিত্যে যুগ-পরিবর্তনের আর একটা সন্ধিক্ষণ। ছবির বইএর পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে যেমন প্রতি পাতায় নূতন দৃশ্য-সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত হয়, সেইরূপ সাহিত্যের ইতিহাসেও শতাব্দীর পৃষ্ঠা উল্‌টাইলে রূপ ও আদর্শের বৈচিত্র্যে বিস্মিত হইতে হয়। প্রতি শতাব্দীই পূর্ববর্তী যুগের কতকটা অনুসরণ ও পরিণতি এবং কতকটা বিদ্রোহ ও প্রতিক্রিয়া। সপ্তদশ শতকে মনন-শক্তির যে প্রাধান্য ধীরে ধীরে লক্ষিত হইতেছিল, অষ্টাদশ শতকে তাহার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। কল্পনার সহিত তাহার সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্নপ্রায় হইল। মনন-শক্তি ক্রমে কল্পনাবর্জিত হইয়া, দার্শনিক প্রসার ও মৌলিকতা হারাইয়া, কেবল কতকগুলি সাধারণ, সর্বজন-স্বীকৃত নীতিকথা ও ব্যবহারিক সত্যের আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়াইল। কাব্য গদ্য-সন্দর্ভের পদ্য রূপান্তরে মাত্র পরিণত হইল। ইহার পরিধি অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবনে সীমাবদ্ধ হইল। এই যুগের প্রতীক পোপের দুইটী উক্তি ইহার প্রকৃতির উপর আলোকপাত করে। প্রথম উক্তিটী—'মানুষের আলোচনার বিষয় মানুষই'; দ্বিতীয়—'প্রকৃত কাব্য পুরাতন চিন্তারই নববেশ মাত্র, বাস্তবের অনুবর্তন'। প্রথম উক্তির দ্বারা বহিঃপ্রকৃতিকে কাব্যের গণ্ডী হইতে নির্বাসিত করা হইয়াছে; দ্বিতীয়ের দ্বারা কল্পনার লীলা ও ভাবের মৌলিকতার উপর অনুরূপ নির্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি যে এই শতকের কাব্যে উচ্চতর কবিকল্পনার স্থান নাই।

এই যুগের সাহিত্যকে classical সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। Classical শব্দের সংজ্ঞা-নির্দেশ মোটেই সহজ নয়; অনেকগুলি পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট অর্থ-ব্যঞ্জনা ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে।

(১) যে অর্থ সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট তাহা ইহার শ্রেষ্ঠত্ববাচক। Classical সাহিত্য সেই সাহিত্য যাহার উৎকর্ষ উচ্চতম স্তরের ও সর্বরুচিসম্মত, যাহার সম্বন্ধে কালভেদের অবকাশ নাই, যাহা বিভিন্ন রুচির অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের মহাকাব্য কয়টী—হোমার, ভার্জিল, দান্তে ও পরবর্তী কালের শেক্‌শপিয়ার ও মিল্‌টন-এই শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য। অষ্টাদশ শতকের লেখকদের মনে এই শ্রেষ্ঠত্বাভিমান খুব প্রবল ছিল। তাহারা পূর্ববর্তী লেখকদের অপেক্ষা সর্ব-বিষয়েই অগ্রসর এই বদ্ধমূল ধারণা তাহাদের অহঙ্কারকে উত্তেজিত করিত। এই পূর্ববর্তীদের উপর তাহাদের একটা অনুকম্পা-মিশ্রিত অবজ্ঞা ছিল। এমন কি শেক্‌শপিয়ার পর্যন্ত এই মুরুব্বিয়ানার অপমান হইতে রক্ষা পান নাই। তাঁহার প্রতিভা অস্বীকার করার মত দুঃসাহস ইহাদের ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার রুচি অমার্জিত, ভাষা কর্কশ ও লালিত্যহীন, ভাব দুর্বোধ ও সাধারণ অভিজ্ঞতার বিরোধী ইত্যাদিরূপ অভিযোগ তাহাদের মুখে সর্বদাই শুনা যাইত। এমন কি, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া শেক্‌শপিয়ারের মার্জিত সংস্করণের হাস্যাস্পদ প্রয়াসও ইঁহারা করিয়াছিলেন ও নিজেদের বুদ্ধিহীনতা ও রসবোধের অভাবের স্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

(২) Classical শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে প্রাচীন রচনা-রীতির, বিশেষতঃ অগাষ্টান যুগের লাটিন সাহিত্যাদর্শের অনুগামী। এই লাটিন সাহিত্যের প্রতি অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ সাহিত্যিকদের অতিমাত্রায় শ্রদ্ধা ছিল—তাহারা বিনীত শিষ্যের ন্যায় ইহার পদাঙ্ক অনুবর্তন করিত। নৈতিক আলোচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অষ্টাদশ-শতক-সাহিত্যের এই দুই প্রধান বিভাগ লাটিন কবিতারই অনুকরণ। লাটিন কবিদের ভাব ও ভাষা তৎকালীন অবস্থার উপযোগী করিয়া সেই যুগের প্রধান চরিত্রদের প্রতি আরোপ করা হইত। Juvenal, Horace ও Perseusএর ব্যঙ্গ-কবিতা এইরূপে ড্রাইডেন ও পোপের দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া ইংরেজী পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ

শতকের এই দুই শ্রেষ্ঠ কবি যথাক্রমে ভার্জিল ও হোমারের অনুবাদ করিয়াছিলেন ও নিজ মৌলিক রচনার অপেক্ষা এই অনুবাদের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন।

এই অত্যধিক অনুকরণ-প্রিয়তা ও আনুগত্য-স্বীকার মৌলিকতার পক্ষে প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই অন্ধভক্তি এতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল যে লাটিন সাহিত্যের মধ্যবর্তিতা ছাড়া বহিঃপ্রকৃতি ও মনুষ্য-জীবনের প্রতি লক্ষ্য করাও যেন ইহাদের পক্ষে দুঃসাহসিকতা বলিয়া মনে হইত। এই যুগের প্রতিনিধি-কবি পোপ বলিয়াছেন যে হোমার ও প্রকৃতি একার্থ-বাচক। আমাদের দেশে ইহার অনুরূপ উক্তি—'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে।' অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-বর্ণনায় হোমারের অতিরিক্ত আর কিছু করিবার নাই। হয়ত হোমার এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত নহেন—কিন্তু এই মনোভাব-প্রধান কবি স্বাধীন সাহিত্য-রচনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না ইহাও স্বতঃসিদ্ধ।

এই অনুকরণপ্রবণতা অষ্টাদশ শতকের সাহিত্যে এক বিশেষ অপকর্ষের হেতু হইয়া দাঁড়াইল। লাটিন সাহিত্যের সহিত প্রত্যক্ষ জীবনের সংযোগ অল্পই ছিল, কারণ ইহা নিজে গ্রীক সাহিত্যের অনুকরণ। ইংরেজী সাহিত্য আবার ফরাসী সাহিত্যের মধ্যবর্তিতায় এই লাটিন সাহিত্য পাইয়াছিল। সুতরাং যে আকারে এই সাহিত্যিক প্রভাব ইংরেজী সাহিত্যে সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহা অনুকরণের অনুকরণ, তস্য অনুকরণ। সাহিত্য সুস্থ, স্বাভাবিক ও সার্বজনীন হইতে হইলে তাহা জীবনের প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি হওয়া চাই। জীবন হইতে ইহার দূরত্ব যত বেশী হইবে ততই ইহাতে জীবনীশক্তির অভাব অনুভুত হইবে। সাহিত্য-সৃষ্টিতে পরের মুখে ঝাল খাওয়া একেবারেই অচল। অন্যের চর্বিত খাদ্যে যেমন দেহের পুষ্টি হয় না, তেমনি অপরের সৃষ্ট সাহিত্যের অনুকরণে সাহিত্যিক উৎকর্ষের স্ফূর্তি ও বিকাশ হয় না। জীবনের যে ছবি ইহাতে প্রতিবিম্বিত হয় তাহা অসম্পূর্ণ, একদেশদর্শী ও পাণ্ডুর। অষ্টাদশ শতকের কবিতা-সাহিত্যে তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাতেও জীবনের অজস্র আলোচনা ও বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু নিগূঢ় প্রাণস্পন্দন নাই; চির-পরম্পরা-গত সাধারণ অভিজ্ঞতা আছে, কবির হৃদয় হইতে উৎসারিত নিজস্ব

বাণী নাই; প্রচলিত মতবাদের চমৎকার অভিব্যক্তি আছে, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী নাই।

(৩) তৃতীয়ত: Classical বা সনাতন-পন্থী কবিতায় এমন একটি বিশিষ্ট মনোভাব ও গুণ আছে, যাহার জন্য ভিন্নধর্মী, যথা romantic (কল্পনা-প্রধান) ও realistic (বস্তুতান্ত্রিক) কবিতার সহিত ইহার পার্থক্য। তা ছাড়া, ইহার একটি মানস প্রতিবেশ (Mental background) ও প্রকাশভঙ্গী আছে। ইহার এই সমস্ত উপাদান সম্বন্ধে মোটামুটি একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই কবিতার মনোভাব ধীর, উত্তেজনাহীন, আত্মসংযমশীল, পরিচিত গণ্ডী অতিক্রমে অনিচ্ছুক, অসামান্য ও অভিনবের প্রতি সন্দেহ-পরায়ণ। ভাবোচ্ছ্বাসের পরিবর্তে ভাব-গভীরতাই (the depth, not the tumult of the soul) ইহার প্রকৃতিগত লক্ষণ। কল্পনার মৌলিকতা অপেক্ষা বিষয়-বস্তুর গাম্ভীর্য ও ভাষার সরস ওজস্বিতাই ইহার প্রধান অবলম্বন। কল্পনা ও ভাবাবেগকেও ইহা দৃঢ়হস্তে নিয়ন্ত্রণ করে—গঠন-সৌষ্ঠবের (form) দিকে ইহার তীক্ষ্ণ লক্ষ্য। আবেগের আতিশয্য-জনিত অস্পষ্ট ধূম্রময়তা ইহা সযত্নে পরিহার করে। মানব-অদৃষ্টের দুর্জ্ঞেয়তা, নিয়তির অন্ধবিধান প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয়ে রহস্যময়তার যথেষ্ট অবসর আছে, সেখানেও এই শ্রেণীর কবিতা রহস্য অপেক্ষা অমোঘ নিয়ম-শৃঙ্খলের উপরই বেশী জোর দেয়। মিল্‌টন ও ওয়র্ড্‌স্‌ওয়ার্থ এই শ্রেণীর যোগ্যতম প্রতিনিধি।

ইহার প্রকাশভঙ্গির বৈশিষ্ট্যও উপরের বর্ণনা হইতে অনেকটা অনুমান করা যাইবে। ইহার ভাষার একপ্রকার দৃঢ়, কঠিন সংহতি আছে। রোমান্টিক কবিরা যাহা অনির্ব্বচনীয় তাহা আভাসে-ইঙ্গিতে, কতক ভাষায়, কতক ভাষাতীত ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। ক্লাসিকাল কবিতা ব্যঞ্জনা-সাঙ্কেতিকতার সাহায্য না লইয়া কেবলমাত্র শব্দের সুষ্ঠু ও সুনির্বাচিত প্রয়োগে যতটুকু প্রকাশ করা যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। প্রথমোক্তেরা বর্ণনীয় বস্তুর চারিদিকে একরূপ রঙীন আলোক-চক্র রচনা করেন, শেষোক্তেরা উহাকে শুভ্র, প্রখর সূর্য্যালোকে দেখাইয়া থাকেন। ইঁহাদের কাব্যের প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছ, জড়িমাহীন ও সহজবোধ্য।

বস্তুতান্ত্রিক লেখকদের সঙ্গেও ইহাদের প্রভেদ আছে। বাস্তবতা-

প্রধান রচনায় পুঞ্জীভূত তথ্য-সমাবেশের দ্বারা কোন বিশেষ বস্তু বা দৃশ্যকে রূপায়িত করা হয়। কিন্তু classical কাব্যে বর্ণনায় বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রভাবিত তথ্য-সঙ্কলনের চেষ্টা দেখা যায়। পূর্বোক্ত কবিরা যদি কোন রাজার বর্ণনা করেন, তবে তাহাতে সেই রাজার অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যই ফুটিয়া উঠিবে, তাহার ব্যক্তিত্বের কোণগুলিই তীক্ষ্ণ আকার গ্রহণ করিবে। শেষোক্ত কাব্যে রাজার চিরপ্রথাগত শাশ্বত ধারণাই ব্যক্তিত্বের ক্ষীণ আবরণের মধ্য দিয়া প্রকট হইবে—সনাতন রাজমহিমাই ব্যক্তিকে আড়াল করিয়া কবির বর্ণতুলিকায় অঙ্কিত হইবে। একজন ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যসূচক গুণ ও অপরজন শ্রেণীর প্রতিনিধিমূলক গুণের উপর বেশী জোর দিবেন।

এখন ক্লাসিক্যাল কবিতার মানস প্রতিবেশ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা দরকার। এই শ্রেণীর কবিতা এক বিশেষ সমাজ-সংস্থান হইতে উদ্ভূত। কোন কবি নিজ খেয়াল অনুসারে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ ভাবে ইহা রচনা করিতে পারেন না। অবশ্য ইহার বাহ্য ভাব-ভঙ্গী অনুকরণ করা যাইতে পারে; কিন্তু ইহার মর্মবাণী দেশ ও কালের অবদান। সমাজ-মনের আধ্যাত্মিক, নৈতিক বা রুচিগত সংহতি ইহার পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়। সমাজের সমস্ত লোক যখন একই চিন্তা বা আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত, যখন তাহারা স্বেচ্ছায় এক গভীর ভাবগত ঐক্যের নিয়ম-শৃঙ্খলা বরণ করিয়া লয়, যখন তাহাদের মাথার উপর বায়ব্য আকাশের ন্যায় হৃদয়-মনের উপরও এক অখণ্ড অধ্যাত্ম আকাশ অবনত হইয়া থাকে, তখনই Classical কবিতার উদ্ভব-যুগ। কবি সমস্ত সমাজ-মনের প্রতিধ্বনি করেন বলিয়াই তাঁহার সুরের মধ্যে এত উদাত্ত ধ্বনি-গাম্ভীর্য্য। তাঁহার সহজ, সরল কথার পশ্চাতে সমাজের সংহত শক্তি ঠেলা দেয় বলিয়াই তাহার এত ওজস্বিতা ও প্রভাব। যুগ-মনের সমুদ্র-মন্থনে যে বিপুল আলোড়ন জাগে তাহাই শান্ত হইয়া তাঁহার কাব্য-কমণ্ডলুতে প্রবিষ্ট হয়। দান্তে ও মিল্‌টন স্ব স্ব যুগের সমস্ত তুমুল ভাব-বিক্ষোভ ও ব্যাকুল ধর্ম-জিজ্ঞাসা নীলকণ্ঠের ন্যায় পান করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদের কাব্যের এরূপ অভ্রভেদী মহিমা।

অবশ্য সমাজ-জীবনের এই ঐক্যের বিভিন্ন স্তর আছে। অদৃশ্য বিশ্বনিয়ামক শক্তির প্রতি মনোভাব হইতে সামাজিক সুরুচি ও শিষ্টাচার, এমন কি আহার

বিহার, আদব-কায়দা ও পোষাক-পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য পর্য্যন্ত এই সমাজ-শৃঙ্খলার অনুশাসন বিস্তৃত হইতে পারে। বৃহৎ বা ক্ষুদ্র ব্যাপারে মিল—ইহার উপর ক্লাসিক্যাল কবিতার উৎকর্ষের তারতম্য নির্ভর করে। গ্রীক কাব্য ও নাটকে নিয়তির সহিত মানব-জীবনের রহস্যময় সম্পর্ক-বিষয়ে সমাজ মনের নিবিড়, সংশয়হীন ঐক্য পটভূমিকা স্বরূপ বর্তমান—সুতরাং এখানেই ক্লাসিক্যাল কাব্য চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ল্যাটিন কবিতায় আরও নিম্নস্তরের ঐক্য ক্রিয়াশীল—সমাজের শাশ্বত কল্যাণের জন্য যে নীতি শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা প্রয়োজন তাহাই মেরুদণ্ডের মত কাব্য-দেহকে ধারণ করিয়া আছে। সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশে নীতি-বন্ধন শিথিল হইয়াছে ও তৎপরিবর্তে ভব্যতা ও শিষ্টাচারের অনুশাসন সমাজ-মনকে অধিকার, ও কাব্যের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছে। অনিন্দনীয় আচার-ব্যবহার ও সুকুমার-শীলের মৃদু সৌরভে এই যুগের ফরাসী কাব্য পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতকের ইংরাজী কাব্য মোটামুটি ফরাসী কাব্যেরই মনোবৃত্তিসম্পন্ন; তবে জাতীয় চরিত্রে রুক্ষ ও পরুষভাবের আধিক্য থাকাতে ফরাসী কাব্যের লঘু স্পর্শ ইহা আয়ত্তে আনিতে পারে নাই। ইহার নৈতিক উপদেশ অশোভন উচ্চ গ্রামে ঘোষিত হইয়াছে; ইহার ব্যঙ্গ কবিতায় মৃদু তিরস্কার ও সহাস্য অনুযোগের স্থলে তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী বিদ্রূপ ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের জ্বালা অনুভূত হয়। কাজেই ক্লাসিক্যাল কবিতার যে প্রধান গুণ, ধৈর্য্য, ন্যায়নিষ্ঠা ও সংযম তাহাই ইহাতে রক্ষিত হয় নাই।

আর একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াই এই সাধারণ আলোচনার পরিসমাপ্তি করিব। এক গ্রীক সাহিত্য ছাড়া অন্য সমস্ত সাহিত্যেই ক্লাসিক্যাল যুগের সহিত ব্যঙ্গ-কবিতার প্রায় একটা নিত্য সম্বন্ধ আবিষ্কার করা যায়। এই সম্বন্ধের কারণ জানিতে কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ক্লাসিক্যাল কাব্যে পরিমিতি ও সামঞ্জস্যবোধ খুব সূক্ষ্ম। কাজেই সমাজ-জীবনে এই ভাব-সাম্য কোনও কারণে ক্ষুব্ধ হইলে ক্লাসিক্যাল কবি তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ যত্নবান্ হন। ব্যক্তিগত ব্যবহারে উৎকেন্দ্রিকতা (eccentricity) বা সামাজিক ব্যবহারে কাপট্য, অসাধুতা, ভণ্ডামি, আত্ম-সম্মানজ্ঞানের অভাব, অমার্জিত রুচি, ধন বা পদগৌরবের জন্য অভিমান,

বড়লোকের মোসায়েবী করিবার প্রবৃত্তি ইত্যাদি দোষের প্রাদুর্ভাব কবিকে অত্যন্ত পীড়িত ও প্রতিকার-চেষ্টায় উদ্বোধিত করে। ইঁহার প্রকৃত কার্য্যপ্রণালী হইতেছে নৈতিক উপদেশের দ্বারা সমাজ-মনকে সুস্থ করিবার প্রয়াস এবং এই নীতি-প্রচারকে গুরুগম্ভীর দোষ হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাহার সঙ্গে অতি মৃদু, ব্যক্তিনিরপেক্ষ ব্যঙ্গের ছিটেফোঁটা মেশান। ক্লাসিক্যাল কবি অতি সাবধানে নিজেকে ব্যক্তিগত বিদ্রূপপ্রবণতা হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিবেন—তাঁহার ব্যঙ্গাত্মক মনোবৃত্তি সর্বদা অপ্রধান থাকিবে। ব্যঙ্গ নৈতিক উদ্দেশ্যকে ছাড়াইয়া উঠিলে, যে পরিমিতি-বোধের তিনি উপাসক তাহা তাঁহার নিজের ব্যবহারের দ্বারাই ক্ষুণ্ণ হইবে—তিনি নিজের সনাতন নীতি হইতেই বিচ্যুত হইবেন। এক কথায়, ব্যঙ্গ হইতেছে ক্লাসিক্যাল কবিতার bye-product বা গৌণ উপাদান।

কিন্তু, কার্য্যতঃ অষ্টাদশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যে এই কার্য্যক্রম অনুসৃত হয় নাই। গৌণ উদ্দেশ্য মুখ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যঙ্গের অশোভন তীব্রতা ও অতি-প্রাধান্যের জন্য ড্রাইডেন ও পোপকে ঠিক ক্ল্যাসিক্যাল মনোবৃত্তি-সম্পন্ন বলা যায় না। তাঁহাদের প্রচণ্ড আঘাতে আঘাতে সমাজের বিচলিত ভাব-সাম্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক আরও প্রবলভাবে আন্দোলিত হইয়াছে ও সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছে। তাঁহাদের নির্ম্মম আক্রমণে বরং ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও বিদ্রোহ-পরায়ণতা আরও উত্তেজিত হইয়াছে এবং ক্লাসিক্যাল দুর্গে ফাটল ধরিয়াছে। এই ফাটলের মধ্যে এক-দিকে রুসো, ভলটেয়ার, গিবন প্রভৃতি যুক্তিবাদ-প্রধান ও ভাবাবেশ-প্রবণ লোকদের দ্বারা, অপর দিকে টমসন, কলিন্স ও কুপার প্রভৃতি বহিঃপ্রকৃতির অনুরাগী কবিদের দ্বারা, ফরাসী বিপ্লবের ও রোমাণ্টিক কবিতার বীজ উপ্ত হইয়াছে। এই হিসাবে ড্রাইডেন, পোপ অপেক্ষা আডিসন (Addison), ষ্টীলই (Steele) খাঁটি ক্লাসিক্যাল লেখক। ইঁহারা ধ্বংস অপেক্ষা গঠনমূলক কার্য্যেই অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইঁহাদের কাগজ Spectator সমাজের বর্বরতা, আচার-ব্যবহারের পরুষ কাঠিন্য, ইঁহার শিক্ষা, সুরুচি ও সংস্কৃতির প্রতি অবহেলা ইত্যাদি ছোট ছোট দোষ সম্বন্ধে মৃদু বিদ্রূপের সাহায্যে জনসাধারণকে সচেতন করিতে ও

পরিহাস-মিশ্রিত উপদেশের দ্বারা তাহাদিগকে মার্জ্জিত রুচি, সৌজন্য ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। বিশেষতঃ নারী-জাতির প্রসাধন-বাহুল্য, তাহাদের হাত-পাখা ঘুরাইবার বিচিত্র লীলাভঙ্গি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ে একান্ত ঔদাসীন্য এবং হাস্যাস্পদ অজ্ঞতা তাঁহাদের সকৌতুক ব্যঙ্গের বিশেষ লক্ষ্য হইয়াছে। স্পেক্‌টেটার পরিহাসোক্তি করিয়াছেন যে, এই সমস্ত অভিজাত-বংশের মহিলাদের মাথায় পালক-বসান টুপির ওজন তাহাদের ভিতরের মস্তিষ্ক অপেক্ষা অনেক বেশী। আজকাল ইংরেজী সমাজে নারী-পুরুষ সকলের মধ্যেই যে জ্ঞানানুশীলনের প্রশংসনীয় অভ্যাস ও প্রসার হইয়াছে, তাহার প্রধান প্রেরণা আসিয়াছে এই স্পেক্‌টেটার পত্রিকা হইতে। অষ্টাদশ শতকের ক্লাসিক্যাল কাব্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন ড্রাইডেন, ইহার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন পোপ ও ইহার আতিশয্যজনিত অবনতি ও ধ্বংসোন্মুখতা প্রকটিত হইয়াছে জনসনের হাতে।

(২)

এই শতকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা উপন্যাসের আবির্ভাব। আমরা রূপকথায় শুনি যে, একদা চারি বন্ধু দেশভ্রমণে বাহির হইয়া একস্থানে কতকগুলি ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত অস্থিস্তূপ দেখিতে পান। পরে প্রত্যেকে মন্ত্রপ্রভাবে এই অস্থিগুলি পুনরায় যোজনা করিয়া এক সিংহের কঙ্কালে পরিণত করেন এবং সর্ব্বশেষে উহাদের মধ্যে যিনি মন্ত্রসাধনায় সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী তিনি ইহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। রূপকথাতে ইহাও কথিত আছে যে, ঐ সিংহ প্রাণ পাইয়া তাহার প্রাণদাতাদিগকেই সর্ব্বপ্রথম উদরস্থ করে। উপন্যাসের জন্মবৃত্তান্ত সম্বন্ধেও ঐ রূপকথার কাহিনী প্রয়োগ করা যায়। উপন্যাসের মৌলিক উপাদানগুলি এককভাবে ও অবিন্যস্ত অবস্থায় বহুপূর্ব শতাব্দী হইতেই বিদ্যমান ছিল। 'গল্প, সাহিত্যের অগ্রজ না হইলেও, যমজ সহোদর। স্মরণাতীত কাল হইতে গল্প বলিবার ও শুনিবার প্রবৃত্তি ক্রিয়াশীল। তারপর গল্পের সহিত গৌণ-সম্পর্কান্বিত চরিত্র-সৃষ্টি নাটক ও মহাকাব্যে দৃষ্ট হয়।

পরবর্তী স্তরে কাল্পনিক বা অবিশ্বাস্য কাহিনীকে নিখুঁত ও নিপুণ তথ্য সমাবেশের দ্বারা সত্য বলিয়া চালাইবার চেষ্টাও ভাবী উপন্যাসের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। যেমন ডি' ফোর (De Foe) রবিনসন্ ক্রুসো (Robinson Crusoe)। এই কাহিনীতে চরিত্র-সৃষ্টি ও বিভিন্ন নরনারীর চরিত্রগত ঘাত-প্রতিঘাত ছাড়া উপন্যাসের আর সমস্ত লক্ষণই আছে। জনহীন দ্বীপে পরিত্যক্ত নাবিকের অসহায় মনোভাব ও ধীরে ধীরে প্রতিকূল অবস্থাকে আয়ত্তে আনিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া খুব সূক্ষ্ম না হউক বাস্তবানুগ বটে। ইহার মধ্যে ভগবানের মাহাত্ম্য-ঘোষণা ও নীতিপ্রচার অতিশয় প্রবল হইয়া খাঁটি উপন্যাসের সুরকে চাপা দিয়াছে। কিন্তু অনেক খাঁটি উপন্যাসেও এই দোষ বর্ত্তমান। বস্তুতঃ নীতির শাসন ছাড়াইয়া উঠিতে উপন্যাসকে বহুদিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া, কোন কোন ধর্ম্মবিষয়ক রূপকও প্রবলরূপে উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত, যেমন বুনিয়ানের (Bunyan) Pilgrims' Progress বা (তীর্থযাত্রীর অগ্রগতি)। ইহার চরিত্রগুলি কেহই রক্তমাংসের মানুষ নয়, কতকগুলি অশরীরী গুণের চিত্র-মূর্তি মাত্র। কিন্তু লেখকের কল্পনাগত উপলব্ধি এত গভীর যে, এই সমস্ত ছায়াগুলিও কায়া পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অ্যাডিসনের Spectator পত্রে Sir Roger de Coverley প্রভৃতি কতকগুলি জীবন্ত চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে, যাহারা গল্পসূত্রে গ্রথিত ও পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইলেই খাঁটি ঔপন্যাসিক সৃষ্টি হইতে পারিত। যাহা হউক, এই বিচ্ছিন্ন পরমাণুগুলিকে একটি জটিলতর জীবদেহে (complex organism) রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের পূর্বে কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

এই পরিকল্পনা যখন আবির্ভূত হইল, তখন ইহার আকস্মিকতাই আমাদিগকে চমৎকৃত করিল। যিনি এই নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করিলেন, তাঁহার সাহিত্যিক কোন প্রতিভা বা পূর্ব্বপ্রবণতা ছিল না। রিচার্ডসন (Richardson) একজন পুস্তক-ব্যবসায়ী ছিলেন। বইএর ভিতর অপেক্ষা বাহিরেরই পরিচয় তাঁহার বেশী ছিল; সাহিত্যরসবোধ অপেক্ষা ব্যবসায়বুদ্ধিতেই তাঁহার অধিক পারদর্শিতা ছিল। পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি কোনরূপ সাহিত্য-সাধনার পরিচয় দেন নাই, নিতান্ত গতানুগতিক ভাবে নিজ ব্যবসায় চালাইতেছিলেন।

উপন্যাস লিখিবার পক্ষে তাঁহার একটীমাত্র উপযোগিতা ছিল—নারী-হৃদয়ের রহস্যে বিশেষ অভিজ্ঞতার খ্যাতি তিনি অর্জন করিয়াছিলেন। এই খ্যাতির জন্য তাঁহার প্রতিবেশিনী সমস্ত ঝি-চাকরাণীর দল তাহাদের প্রেমপত্র লিখাই-বার প্রয়োজন হইলে তাঁহার শরণাপন্ন হইত। তাঁহার যখন পঞ্চাশ বৎসর বয়স তখন কোন প্রকাশক কয়েকটী আদর্শ পত্রাবলী রচনার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধের ফলেই হইল যুগান্তকারী সৃষ্টি—ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'পামেলা' (Pamela) (১৭৪০)।

ঘটনা ও চরিত্র-সৃষ্টি এই উভয় উপাদানই স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান ছিল। ইহাদের উভয়ের সংযোগে এক অদ্ভুত রাসায়নিক পরিবর্তন হইয়া উপন্যাসের অভিনব রসসৃষ্টি হইল। 'পামেলা' প্রতিপন্ন করিল যে, যেমন রন্ধনের সামান্য উপকরণ নিপুণ পাচকের হাতে উপাদেয় ভোজ্য-বস্তুতে পরিণত হইতে পারে, তেমনি অতি সাধারণ, অকিঞ্চিৎকর বিষয়ও রসানুভূতির দ্বারা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-পর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে। 'পামেলা' একটা চাকরাণীর কাহিনী। তাহার প্রভুপুত্র তাহার প্রণয়াসক্ত হইয়া তাহার প্রতি কুৎসিত প্রস্তাব করে, কিন্তু পামেলার নৈতিক ও সাংসারিক জ্ঞান উভয়ই তুল্যরূপ প্রখর। কাজেই সে মুনিবের নিকট আত্মসমর্পণ করিল না। এই দৃঢ়তার ফল সে হাতে হাতেই পাইল। তাহার মুনিবপুত্র শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল এবং এই প্রস্তাবে সে সঙ্গে সঙ্গেই সম্মত হইল। পত্রাবলীর সাহায্যে তাহার মুনিবের অনুসরণ ও তাহার প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার বিভিন্ন পর্যায়গুলি এমন কৌতূহলোদ্দীপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঘটনাবলীর মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু না থাকিলেও আমরা রুদ্ধনিশ্বাসে সমস্ত কাহিনীটা আগাগোড়া পাঠ করি। মানুষের জীবনের ইতিহাস যে সর্ব অবস্থাতেই মানুষের চিত্তাকর্ষক ও রস-সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে, 'পামেলা' ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছে। রিচার্ডসনের শ্রেষ্ঠ রচনা 'ক্লারিসা হার্লো' (Clarissa Harlowe) নামক উপন্যাসের বিষাদময় পরিণতিতে লেখকের করুণ-রস-সৃজনে অদ্ভুত নিপুণতার পরিচয় মিলে।

রিচার্ডসনের এই নূতন সৃষ্টি অধিকাংশ পাঠকেরই সাতিশয় শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল, কিন্তু সংশয়-বাদীরও একেবারে অভাব ছিল না, যাঁহারা

প্রশংসার পরিবর্তে বিদ্রূপ ও উপহাসের দ্বারা এই নবীন আবির্ভাবকে বরণ করিয়াছিলেন। পামেলার ব্যবহারে ও রিচার্ডসনের গল্প বলিবার ভঙ্গী ও মন্তব্যের মধ্যে একটা হাস্যাস্পদ দিকও ছিল। চাকরাণীর সতীত্ব রক্ষার জন্য অতিরিক্ত উদ্বেগ অথচ অত্যাচারকারীকে বিবাহ করিবার আগ্রহ; সামান্য কারণে অতিরিক্ত উত্তেজনা ও বান্ধবীকে প্রত্যেকটী খুটিনাটি ব্যাপার জানাইবার জন্য ব্যগ্রতা, এবং লেখকের দ্বারা এই আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন ব্যবহারের পোষকতা ও অনুমোদন এক পরিহাস-রসিকের ব্যঙ্গপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিল। ফিল্ডিং (Fielding) পামেলার ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণরূপে (parody) Joseph Andrews নামে একটী উপন্যাস রচনা করিলেন। ইহাতে তিনি পামেলার এক ভ্রাতা জোসেফের অবতারণা করিয়া তাহাকে তাহার প্রভু-পত্নীর প্রণয়ানুসরণের পাত্ররূপে চিত্রিত করিলেন। জোসেফও নিজ ভগ্নী পামেলার ন্যায় অবিচলিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত নিজ সতীত্ব (!) রক্ষার জন্য কোমর বাঁধিল। স্ত্রীলোকের পক্ষে যাহা শোভন, পুরুষের পক্ষে তাহা হাস্যাস্পদ। এইরূপে Fielding তাঁহার পূর্ববর্তীর রচনার মধ্যে হাস্যজনক অসঙ্গতির দিকটা পরিস্ফুট করিয়াছেন।

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, যাহারা উপহাস করিতে আসে, তাহারা শেষ পর্যন্ত উপাসনাকারীদের দলে ভিড়িয়া যায়। Fieldingএরও তাহাই হইয়াছিল। তিনি অপরকে ঠাট্টা করিতে গিয়া নিজ প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ ছাড়িয়া তিনি মৌলিক উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিলেন ও অষ্টাদশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস টম্ জোন্সের (Tom Jones) রচয়িতারূপে প্রসিদ্ধ হইলেন। এই উপন্যাস ভাবে-ভঙ্গীতে ধরণ-ধারণে, চরিত্রাঙ্কন-রীতি ও টীকা-টিপ্পনীতে রিচার্ডসনের উপন্যাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। কোথায় গেল রিচার্ডসনের গম্ভীর হাস্যলেশহীন বর্ণনা-পদ্ধতি, কোথায় বা তাঁহার আনুবীক্ষণিক পর্যবেক্ষণ-প্রণালী, কোথায় বা তাঁহার ব্যবসায়-বুদ্ধি-প্রভাবিত নীতি-প্রচার। Fielding হাস্যরসে, বিদ্রূপে, লঘু-তরল ইঙ্গিত ও কটাক্ষে, অফুরন্ত প্রাণশক্তির লীলা প্রাচুর্যে, সরস বর্ণনাভঙ্গী ও অবান্তর বিষয়-বাহুল্যে, ক্ষমা-স্নিগ্ধ এবং উদার মনোভাবে পাঠকের সহিত একটা মধুর, হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপনে রিচার্ডসনের

বদ্ধ ঘরের সব কয়েকটা জানালা খুলিয়া দিয়া তাহার ভিতর দক্ষিণ বায়ুর হিল্লোল বহাইয়া দিলেন। অতি-সতর্ক শুচিবায়ুগ্রস্ত নৈতিকতা, নিক্তির ওজনে পাপ-পুণ্য বিচার করিয়া দণ্ড-পুরস্কার বিতরণ তাঁহার একান্ত অরুচিকর ছিল। তাঁহার নায়ক টম্ জোন্স্ বার বার প্রলুব্ধ হইয়াছে ও রূপমোহের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু তাহার উদার সরলতা, কোমল, পরদুঃখকাতর হৃদয় ও স্বার্থলেশহীন মনোবৃত্তি তাহার সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষালন করিয়াছে। তাহার জীবন নানা বিচিত্র ঘটনা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছে—ঘটনা-বৈচিত্র্য ও চরিত্র-বিশ্লেষণ উভয়ই উপন্যাসটীর আকর্ষণের হেতু হইয়াছে। রিচার্ডসনের উপন্যাসে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ আছে, কিন্তু ঘটনার গতি অতি মন্থর। ফিল্‌ডিংএ বিশ্লেষণ খুব-সূক্ষ্ম নহে, কিন্তু বর্ণিত জীবনযাত্রা গতিবেগে চঞ্চল। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ নাগরিক ও গ্রাম্য জীবনের অতি জীবন্ত ছবি আমরা এই উপন্যাসে পাই। কি অবাধ স্ফূর্তি -আমোদ, কি প্রচণ্ড কর্মতৎপরতা, বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশে কি জটিল ঘাত-প্রতিঘাত, শক্তির কি অজস্রতা, ঘটনা-প্রবাহের কি অশ্রান্ত ঘূর্ণিপাক, ব্যক্তিত্বের কি তীব্র, উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি! Tom Jonesই উপন্যাসের ভবিষ্যৎ গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়াছে।

নব-জাত উপন্যাসের রূপবৈচিত্র্যের সম্ভাবনা কত বেশী তাহা স্টার্ণের (Sterne) Tristram Shandy ও A Sentimental Journey নামে দুইখানি উপন্যাসে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই দুইখানি উপন্যাসের মধ্যে উপন্যাসের একটি মৌলিক উপাদান—ঘটনার ধারাবাহিকতা একেবারেই নাই। গল্প, লেখকের মর্জি ও খেয়াল অনুসারে, কখন একেবারে নিশ্চল—কখন বা দীর্ঘপদক্ষেপে মাঝে অনেকখানি ফাঁক রাখিয়া ধাবমান। শ্রেণীবদ্ধ তারকা চিহ্নগুলি (* * *) গল্পের এই পৌর্বাপর্য্যের অভাবের জ্বলন্ত সাক্ষ্য। গল্পের ফাঁক খেয়ালী কল্পনার অতি-পল্লবিত প্রাচুর্যে পূর্ণ হইয়াছে। Sterneএর প্রধান গুণ অতি সূক্ষ্ম রসানুভূতি ও ভাববিলাস (sentimentality), বিশেষতঃ, করুণ রসে ও হাস্যরসে সিদ্ধহস্ততা ও চরিত্র-সৃষ্টি। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রদের মধ্যে Uncle Toby অমর হইয়া থাকিবে।

অষ্টাদশ শতক প্রধানতঃ গদ্য-রচনার যুগ—ম্যাথিউ আর্ণল্ড (Matthew Arnold) ইহাকে "অতি-প্রয়োজনীয় যুক্তিবাদ ও গদ্যের" যুগ সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। এই যুগে আধুনিক গদ্যরীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতকের গদ্য কবি-কল্পনার সংমিশ্রণে আর্দ্র, সুদীর্ঘ বাক্য-বিন্যাসে শ্লথ-মন্থর ও দৃঢ় ও সরল পদক্ষেপের জন্য অনুপযুক্ত। অষ্টাদশ শতক গদ্যের এই উভচর-বৃত্তি (amphibiousness) উচ্ছেদ করিয়াছে—কাব্যের সুমধুর, অথচ শ্বাসরোধকারী আলিঙ্গন হইতে ইহাকে মুক্ত করিয়া স্বচ্ছন্দ-গতি ও স্বাধীন সত্তা অর্পণ করিয়াছে। এই গদ্যের প্রধান কর্তব্য হইল বিবৃতি, যুক্তি সাহায্যে প্রতিপাদন ও সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় তত্ত্বালোচনা ও তথ্য-সন্নিবেশ। ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, সন্দর্ভ-রচনা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই ইহার কার্য্য-কারিতা ও ক্রমোন্নতি পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার ভাষা একটু গুরুগম্ভীর, আড়ম্বরপূর্ণ ও লাটিন-বহুল ; কিন্তু বাক্যগুলি (sentences) হ্রস্ব, সংক্ষিপ্ত ও সুগঠিত। এই শতকের প্রকাশ-ভঙ্গী, সামান্যরূপ পরিবর্তিত হইয়া, কতকটা গাম্ভীর্য ও আড়ম্বরের বোঝা হালকা করিয়া, বর্তমান যুগেও বজায় আছে।

ইতিহাস ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে এই নূতন গদ্যরীতির কীর্তি-স্তম্ভ প্রোথিত। গিবনের (Gibbon) 'রোম-সাম্রাজ্যের অবনতি ও পতন' (Decline and Fall of the Roman Empire) ইতিহাসের অবিনশ্বর কীর্তি। ইহার গুরুগম্ভীর অথচ সুনিয়ন্ত্রিত ও ছন্দ-নিয়মিত বাক্যবিন্যাস ভারী বুটপরা সৈনিক দলের সমতালে পদক্ষেপের কথা স্মরণ করায়। এই ভাষা বিষয়-গৌরবের সম্পূর্ণ উপযোগী। মাঝে মাঝে গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশে শ্লেষ ও বক্রোক্তি ইহার উপভোগ্যতা আরও বাড়াইয়া দেয়।

রাজনৈতিক বক্তৃতা নিশ্চয়ই অমরত্বের জন্য কল্পিত হয় নাই। সাময়িক প্রয়োজনে যাহার জন্ম, প্রয়োজন ফুরাইলে তাহাকে মনে রাখিতে কাহারও বাধ্য-বাধকতা নাই। ভূতপূর্ব্ব বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিলেরও জ্বালাময়ী,

উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা হয়ত যুদ্ধের শেষে যে নীরবতা নামিয়া আসিবে তাঁহাতে বিলীন হইয়া যাইবে। এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম বাগ্মিপ্রবর এডমণ্ড বার্ক (Edmund Burke)। তাঁহার বক্তৃতাবলী পার্লিয়ামেণ্ট সভাগৃহ হইতে সাহিত্যের গৌরব-লোকে উন্নীত হইয়া সেখানে চিরস্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ যে, বার্ক সাময়িক আলোচনার মধ্যে চিরন্তনের সুর আনিয়া দিতে পারেন। আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদ্রোহ ও ফরাসী-বিপ্লব আজ সুদূর অতীতের ঘটনা। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে বার্কের মতবাদও যে একেবারে অভ্রান্ত তাহা বলা যায় না। স্বাধীনতার যিনি পক্ষ-সমর্থনকারী, স্বৈরাচারের তিনি ঘোরতর বিদ্বেষী। স্বাধীনতার সঙ্গত ও অসঙ্গত ব্যবহারের মধ্যে সীমারেখা যে অনেক সময়ই অস্পষ্ট এবং অপব্যবহারের দায়িত্ব যে সর্বত্র বিদ্রোহী প্রজাপুঞ্জের নহে, উপরন্তু অতীত কুশাসনের শোচনীয় অপরিহার্য পরিণতি এই সত্য তিনি অনেক সময় নিজ বদ্ধমূল সংস্কারের জন্য স্বীকার করিতে চাহেন নাই। তথাপি কোন বিশেষ বিষয়ে তাঁহার মত ভ্রান্ত বা পক্ষপাতদুষ্ট হইলেও, তাঁহার বক্তৃতা রাজনৈতিক বিজ্ঞতা ও উদার শাসন-নীতিবিষয়ক উপদেশের মহামূল্য রত্ন-ভাণ্ডার। রাজনীতি তাঁহার নিকট সুবিধাবাদ নহে, একটা গুরুতর নৈতিক দায়িত্ব। জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ—উদার মনোভাব, সুদূরপ্রসারী কল্পনা ও অবিচলিত ন্যায়নিষ্ঠা ভিন্ন অসম্ভব। "বৃহৎ সাম্রাজ্য ও ক্ষুদ্র মন একসূত্রে গ্রথিত হইতে পারে না।" "বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে প্রীতি ও হৃদয়ের বন্ধনই অচ্ছেদ্য—পশুবলের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ সূক্ষ্ম সূত্রের মতই অসার ও ক্ষণভঙ্গুর।" এই জাতীয় নীতিবাদ প্রচুর পরিমাণে তাঁহার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

বার্কের বক্তৃতার মধ্যে এমন একটা গভীর সুর শোনা যায়, যাহা উপরের বায়ুতাড়িত ফেন-বুদ্বুদ মাত্র নহে, পরন্তু হৃদয়ের গভীরতম আলোড়নের অভিব্যক্তি। যাহা তিনি সমস্ত প্রাণ দিয়া অনুভব করিতেন, সমস্ত হৃদয় ও বুদ্ধি-বৃত্তি দিয়া আয়ত্ত করিতেন, তাহাই তাঁহার বক্তৃতায় আত্মপ্রকাশ করিত। ইহার মধ্যে শুধু ভাষার ইন্দ্রজাল নাই, আছে প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও প্রবল বিশ্বাস। তাঁহার রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে কতকগুলি অসাধারণ

বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার মনে যুক্তিবাদের সঙ্গে গভীর ধর্মভাব, অতীতের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও একপ্রকারের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (mysticism) মিশ্রিত ছিল—কাজেই তাঁহার আলোচনায় নিছক বুদ্ধিবৃত্তি ছাড়া আরও গূঢ়তর দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাইত। সমাজ-বিবর্তন সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা সাধারণ যুক্তিবাদী হইতে স্বতন্ত্র ছিল। যুক্তিবাদীর বিশ্বাস যে, সমাজ-গঠনে কেবল মানুষের সুবিধাবাদেরই প্রভাব দেখা যায়—আদিম যুগের বিপদ-বাহুল্যই তাহাকে সঙ্ঘবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা শিখাইয়াছিল ও সমাজের ভিত্তিস্থাপনে প্রণোদিত করিয়াছিল। বার্ক এই সমাজ-সংস্থাপনের পিছনে নিগূঢ় দৈবশক্তির লীলা প্রত্যক্ষ করেন—ইহা যেন ভগবানের সৃষ্টি-রহস্যের একটা ক্ষুদ্রতর বিকাশ। সুতরাং সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ, তাহার বিবর্তনের প্রত্যেকটি রেখা, অতীতযুগের প্রত্যেক আচার ও সংস্কার তাঁহার নিকট পবিত্র। এই সমাজের অনেক দোষ-ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু যুক্তিবাদী সংস্কারকের অত্যুগ্র সংস্কার-প্রচেষ্টা তাঁহার চক্ষে পরশুরামের মাতৃহত্যার মতই একটা মহাপাপ। যদি কোন পরিবর্তন অপরিহার্য হয়, তাহা ধীরে ধীরে, সশ্রদ্ধভাবে, অতীত ইতিহাসের ধারার সহিত মিলাইয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে। পিতৃপিতামহের স্মৃতি-জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলিকে নূতন পরিকল্পনার পরীক্ষা-ক্ষেত্ররূপে ব্যবহার করিলে চলিবে না। তাঁহার এই মতবাদগুলির দ্বারা বার্ক রক্ষণশীলদের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করিয়াছেন। এই সমস্ত গুণের জন্যই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিষ্ঠা চিরন্তন।

অষ্টাদশ শতকের গদ্য-লেখকদের মধ্যে আর এক ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য —যিনি যুগের শেষার্ধের একচ্ছত্র সাহিত্য-সম্রাট্ ছিলেন। ডাঃ জনসন (Dr. Samuel Johnson), তাঁহার জীবন-চরিতকার বস্ওয়েলের অনুগ্রহে, আমাদের অত্যন্ত সুপরিচিত। বোধ হয় অতীতের কোন লোকই এত জীবন্ত-মূর্তিতে, জীবনের প্রতি কার্যে, অঙ্গভঙ্গী ও কথোপকথনে, ভবিষ্যৎ যুগের চোখের সামনে প্রতিভাত হন নাই। ডাঃ জনসনের মেজাজ একটু রুক্ষ, ধরণ-ধারণ জবরদস্তী ও প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু, আচার-ব্যবহার একটু মুরুব্বিয়ানার ঝাঁজযুক্ত, কিন্তু তাঁহার বাহ্য কঠোরতার অন্তরালে একটী কোমল, দয়ার্দ্র, বন্ধু-বৎসল হৃদয় লুক্কায়িত ছিল। তিনি তাঁহার চারিদিকে একটী সুহৃদ্মণ্ডলী গঠন

করিয়া তাহাদের সহিত সাহিত্যালোচনায় সময় কাটাইতে ভালবাসিতেন। লেখক হিসাবে তিনি খুব বড় ছিলেন না, কিন্তু সরস সুযুক্তিপূর্ণ কথোপকথন ও বাদ-প্রতিবাদে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তর্কশক্তিতে তাঁহার অদ্বিতীয় ক্ষমতা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিত। যে কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার দুঃসাহস দেখাইত তাহাকেই তিনি সুতীক্ষ্ণ তর্কাস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ছাড়িতেন। এই সমস্ত তর্কযুদ্ধের যে বিবরণ তাঁহার জীবন-চরিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার উপস্থিতবুদ্ধি, প্রতিবাদীর যুক্তিখণ্ডনের অপূর্ব কৌশল ও বলিবার দৃঢ়ভঙ্গীতে বিপক্ষকে একেবারে নাস্তা-নাবুদ করার ক্ষমতার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

তাঁহার লিখিবার ও কথোপকথনের ভাষার মধ্যে প্রচুর প্রভেদ দেখা যায়। লেখ্য ভাষা শব্দ-ভারাক্রান্ত, দীর্ঘবাক্য-বিড়ম্বিত ও লাটিন-বহুল ; কথ্য ভাষা সরস, তীক্ষ্ণ ও বাহুল্য-বর্জিত, একেবারে সরল-গতিতে বক্তব্য বিষয়ের মর্মস্থানে প্রবেশ করে। জনসনের সাহিত্য-সমালোচনা ও গ্রন্থাদি সম্পর্কে মতামত তাঁহার সমসাময়িকদের দ্বারা প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলিয়া গৃহীত হইত। তিনি কোনও বিষয়ে মত প্রকাশ করিলে তাহা প্রত্যেক সাহিত্যিক মজলিসে প্রচারিত হইত ও দেখিতে দেখিতে তাহা চূড়ান্ত বিচারের মর্যাদা লাভ করিত। অবশ্য পরবর্ত্তী যুগে তাঁহার এই মর্যাদা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ও তাঁহার মতের বিরুদ্ধে নানারূপ প্রতিবাদ শোনা গিয়াছে। তাঁহার রস-জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। ক্লাসিকাল গণ্ডীর বহির্ভূত কোন লেখকের অনভ্যস্ত প্রণালী তাঁহার অনুমোদন লাভ করিতে পারিত না। তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনা অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতবাদের দ্বারাও প্রভাবিত হইত। মিল্‌টন গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ও রাজবিদ্রোহী ছিলেন বলিয়া, জনসন তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার যোগ্য সমাদর করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন ; গ্রে (Gray) ইংরাজি কাব্য সাহিত্যে নূতন ধরণের রচনার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু জনসন তাঁহার সে মৌলিকতা অবহেলা করিয়া তাঁহাকে বিদ্রূপ-বাণে বিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে রস-বিচার প্রায় অভ্রান্ত ও অনবদ্য ছিল। তাঁহার বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ, সঙ্গতি-অসঙ্গতি বোধ এত প্রখর, তাঁহার বিচারশক্তি এত সজাগ ও আবেশ-

জড়িমাহীন ছিল যে, অনেক সময় তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি সমস্ত অবান্তর প্রসঙ্গ ভেদ করিয়া একেবারে বিচার্য বিষয়ের মর্মস্থলে পৌছিয়াছে। এমন কি মিল্‌টন ও গ্রের সম্বন্ধেও তিনি যে প্রতিকূল মন্তব্য করিয়াছেন তাহাকে সম্পূর্ণ ভুল বলিয়া কোনমতে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

(৪)

অষ্টাদশ শতকের কবিতার মধ্যে দুইটি বিপরীত ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। (১) ক্লাসিকাল রীতির অনুবর্তন; (২) রোমান্টিক মনোভাবের অঙ্কুরোদ্গম ও ক্রম-বিস্তার। কল্পনাশক্তি (Imagination) কবিতার মুখ্য উপাদান। ইহাকে দীর্ঘকাল বাদ দিয়া কবিতা কখনই সুস্থ জীবন লাভ করিতে পারে না। কাজেই অষ্টাদশ শতকের কাব্যে কল্পনাক্রীড়াকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা, ইহার অফুরন্ত বৈচিত্র্যকে এক ছাঁচে ঢালিবার প্রবৃত্তি ভিতরে ভিতরে সৌন্দর্য-পিয়াসী কবিচিত্তকে পীড়িত করিতেছিল। সেইজন্য ক্লাসিকাল রীতির অত্যধিক কেন্দ্র-সংহতির বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে একটা অসন্তোষ মাথা তুলিয়া উঠিল। এই অসন্তোষ বাহ্যতঃ ক্লাসিকাল রীতির প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করিয়াছে—ইহার শ্লেষ, যুক্তিবাদ, নৈতিক আলোচনার ধারা বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু অলক্ষিতে একটা উতলা ভাব, একটা গূঢ় অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ইহাদের কাব্যের আত্মপ্রসাদকে বিচলিত করিয়াছে। এই অভাব-বোধকে মিটাইবার জন্য কবিরা নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহাদের আসল উদ্দেশ্য কাব্য-রাজ্যে রোমান্সের পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

ক্লাসিকালের ন্যায় রোমান্টিক শব্দেরও সংজ্ঞা অত্যন্ত জটিল ও সুদুর-প্রসারী। ইহার গূঢ়তম ও ব্যাপকতম অর্থ 'বিস্ময়-বোধের পুনরুদ্বোধন' বলা যাইতে পারে। পৃথিবীর নবীন সৌন্দর্য অতি-পরিচয়ের ফলে আমাদের চোখে ম্লান হইয়া যায়—ইহার শ্যাম দূর্বাদলে শিশিরবিন্দুর ঝলমল আভা অভ্যাস ও পুনরাবৃত্তির প্রখর সূর্যতাপে শুষ্ক হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ হইতে

কবির পার্থক্য এই যে, তাঁহার চোখে এই চির-নবীন সৌন্দর্যবোধ নীলাঞ্জনের মতই জড়াইয়া থাকে।

সুতরাং পৃথিবী ও মনুষ্য-জীবনের শুষ্ক, শীর্ণ মূর্তি কবির নিকট সর্বদাই সৃষ্টি-প্রারম্ভের আদিম-বিস্ময়মণ্ডিত। কিন্তু কবিও যুগ-প্রভাবের অধীন। পৃথিবীর সহিত আমাদের পরিচয়ের মিয়াদ যতই দীর্ঘতর হইতেছে ততই তাহার বিস্ময়ের দিকটা কমিয়া তাহার শৃঙ্খলা ও নিয়মবন্ধনের দিকটাই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে। যে সূর্যোদয়ের মহিমা আমাদের বৈদিক মন্ত্রে প্রত্যক্ষ দেবতার আবির্ভাবের ন্যায় অভিনন্দিত হইয়াছে, তাহা আমাদের নিকট একটা জ্বলন্ত জড়পিণ্ডের বাধ্যতামূলক কক্ষাবর্তন। যে প্রাকৃতিক নিয়ম-রহস্য আমাদের পূর্বপুরুষের অজ্ঞাত ছিল তাহা বিজ্ঞান আমাদের আয়ত্তাধীন করিয়াছে, সুতরাং আদিম যুগের বিস্ময়-বোধ আধুনিকদের মনে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। অবশ্য সমস্ত সৌর-জগতের অপরিমেয় বিশালতা ও অগণিত গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে এক অচ্ছেদ্য নিয়ম-শৃঙ্খলের অস্তিত্ব কবি-কল্পনাকে নূতন ভাবে অভিভূত, উত্তেজিত ও তাহার মনে একপ্রকার নূতন বিস্ময়-চমকের সৃষ্টি করিতেছে। কিন্তু মোটের উপর বিজ্ঞানের অগ্রগতি আমাদের সমস্ত প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর যেরূপ তীক্ষ্ণ সন্ধানী আলোক-ক্ষেপ করিয়াছে, তাহাতে ইহাদের রহস্যচ্ছায়াচ্ছন্ন কোণগুলি যে সংখ্যায় ও আয়তনে অনেক সঙ্কুচিত হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এই হিসাবে পরবর্তী যুগের কবিদের, তাঁহাদের পূর্বগামীদের সহিত তুলনায়, একটু বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভ হইতেই এই বিস্ময়-বোধের পুনরুদ্বোধন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠার নানা বিচিত্র চেষ্টা চলিয়াছে। (১) বহিঃ-প্রকৃতির সহিত মিলনানন্দ ক্রমশঃ তীব্রতর ও দৃঢ়তর হইয়াছে। ক্লাসিকাল যুগের কবিতায় বহিঃপ্রকৃতির স্থান অতি গৌণ। নাগরিক জীবনে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের বিশেষ সুবিধা থাকে না; বিশেষতঃ সেই নাগরিক জীবন যদি দ্বন্দ্ব-কোলাহলে মুখর ও হিংসা-বিদ্বেষের অস্বাভাবিক উত্তেজনায় চঞ্চল থাকে, তবে সে দিকে চিত্তের প্রবণতাই ক্রমশঃ লোপ পায়। অষ্টাদশ শতকের কাব্যে যে প্রকৃতি-বর্ণনা দেখা যায়, তাহা অত্যন্ত মামুলি, রসহীন ও কতকগুলি বাঁধা-ধরা বুলির

পুনরাবৃত্তি মাত্র। গাছ-পালা, ফুল, নদী-পর্বত প্রভৃতি বর্ণনা করিতে হইলে কবিরা নিজ প্রত্যক্ষ দৃষ্টির কোন প্রমাণ দিতেন না—পূর্বতন কবিদের মধ্যবর্তিতায় তাঁহারা ইহাদের রসোপভোগ করিতেন। ক্রমশঃ তাঁহাদের দৃষ্টি আবার নূতন করিয়া বহিঃপ্রকৃতির দিকে আকৃষ্ট হইল। প্রকৃতির সনাতন অথচ চির-নবীন সৌন্দর্য-আস্বাদনের আগ্রহ তাঁহাদের পর্যবেক্ষণ-শক্তিকে নূতন ভাবে উত্তেজিত করিল।

স্কট্‌লাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চল ও ইংলণ্ডের গ্রাম্য এলাকায় অনেক কবি, যাঁহারা ড্রাইডেন, পোপের প্রভাবমুক্ত ছিলেন, আবার প্রকৃতির বন্দনাগীতির সুর গাহিতে লাগিলেন। "Seasons" এর বিখ্যাত কবি টমসন (Thomson) বিভিন্ন ঋতুর আবর্তনে বহিঃ-প্রকৃতির পরিবর্তনশীল মুখশ্রীর ছবি অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণ তুলিকায় আঁকিলেন। বিশেষতঃ প্রকৃতির বর্ণোচ্ছ্বাস, তাহার রংএর বিচিত্রলীলা ও সূক্ষ্মতম পার্থক্য তাঁহার চোখে নিখুঁতভাবে ধরা পড়িল। দীর্ঘ ব্যবচ্ছেদের পরে এমন একজন কবি আসিলেন যিনি বইএর পাতার অন্তরাল হইতে বা পাঠাগারের জানালা দিয়া, প্রকৃতিকে দেখেন নাই। তাঁহার ভাষা শব্দ-বহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ ছিল; সময়ে অসময়ে নীতিমূলক ভাবোচ্ছ্বাস-প্রবণতা (tendency to moralise) তাঁহার রচনাকে গুরুভারপীড়িত করিয়াছে। তথাপি পুরাতন রচনারীতির জীর্ণতার ভিতর দিয়াও এক নূতন ভাবের স্পন্দন তাঁহার কবিতার মধ্যে ধরা যায়।

এই যে বহিঃপ্রকৃতির উপাসনা নূতন করিয়া সুরু হইল, তাহা প্রায় এক শতাব্দী পরে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের (Wordsworth) কবিতায় চরম পরিণতি লাভ করিল। বহিঃপ্রকৃতির আকর্ষণ ক্রমশঃ চক্ষুকে ছাড়াইয়া কবিদের অন্তর-লোকে নিজ মায়া বিস্তার করিল। বহিঃ ও অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে একটা নিবিড়, অন্তরঙ্গ যোগের ধারণা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইয়া উঠিল। বাহ্য প্রতিবেশ ধীরে ধীরে কবির অন্তর হইতে বিচ্ছুরিত কামনার আলোকে রঞ্জিত হইল। অন্তর ও বাহিরের এই নিবিড় আত্মীয়তা-বোধের ফলে বহিঃপ্রকৃতির স্বরূপ সম্পূর্ণ নূতন অর্থ পরিগ্রহ করিল। মানবের অতৃপ্ত, পীড়িত মন বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে শান্তি ও গভীর পরিতৃপ্তি খুঁজিতে উৎসুক হইল। এমন কি মানুষের অন্তরের যে গভীরতম রহস্যবোধ, ভগবানকে

বুঝিবার ও তাঁহার সহিত মিলিবার যে পরম আকুতি, তাহাও যেন এই বহিঃপ্রকৃতির মধ্যেই এক অপূর্ব সমাধান লাভ করিল। প্রকৃতি কেবল চক্ষুর বিলাস নহে, গভীরতম ধ্যান-ধারণা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিষয় হইল। কবিরা তাহার মধ্যে ঐশীলীলার নিগূঢ়তম বিকাশ ও ভগবানের স্পষ্টতম আবির্ভাবের প্রমাণ আবিষ্কার করিয়া প্রাণের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তাহাকে নিবেদন করিলেন। এইরূপে এক অভিনব নিসর্গ-কবিতার সৃষ্টি হইল ও আমাদের আদিম বিস্ময়বোধ এক নূতন চেতনা-প্রাবল্যের বিপুল শক্তি লইয়া নবজন্ম-পরিগ্রহ করিল।

টমসন হইতে আরম্ভ করিয়া ওয়ার্ডসওয়ার্থ পর্য্যন্ত যে দৃষ্টিভঙ্গী পরিণতি লাভ করিয়াছে, কুপার (Cowper) তাহার মধ্যবর্ত্তী স্তরের কবি। তাঁহার জীবন ড্রাইডেন-পোপ-জাতীয় কবির জীবন হইতে একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতি। শান্ত নির্জন পল্লীবাসে, একটি নিঃসম্পর্কীয় পরিবারের স্নেহাঞ্চলের আশ্রয়ে, বন্ধুত্ব ও ভালবাসার স্নিগ্ধ কোমল আবেষ্টনে, নাগরিক উত্তেজনা ও ঘাত-প্রতিঘাতকে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া তাঁহার জীবন-ধারাটী তাঁহার অতি প্রিয় ধীরগতি আউস নদীটীর মতই প্রবাহিত হইয়াছে। কিন্তু অতি নিস্তরঙ্গ নদীতেও যেমন আকস্মিক আবর্ত্তের সৃষ্টি হইতে পারে, সেইরূপ তাঁহার শান্তিময়, ঘটনাবিরল জীবনেও এক ঘোরতর বিষাদের ছায়াপাত হইয়াছিল। তাঁহার অতি কোমল, সংসার-বিরাগী মনে একপ্রকার আধ্যাত্মিক নৈরাশ্যভাব বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তিনি ভগবানের স্নেহাশ্রয় হইতে চিরদিনের মত বিচ্যুত হইয়া অনন্ত নরক-বাস ও উদ্ধারহীন যন্ত্রণাভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছেন। এই ধারণা সময় সময় এরূপ তীব্র হইয়া উঠিত যে, তাহার প্রভাবে তিনি উন্মাদ-রোগাক্রান্ত হইতেন। এই আসন্ন চিত্তবিকারের ছায়াতলেই তাঁহার কবিতা রচিত রচিত হইয়াছে।

তাঁহার কবিতা সাধারণতঃ অতি সহজ, সরল—তাঁহার শান্ত জীবনের ছোট ছোট কাজ ও অবসরগুলির বর্ণনা ও তাহারই ফাঁকে ফাঁকে তাঁহার কোমল, সহানুভূতি-স্নিগ্ধ মনে যে সমস্ত চিন্তা ও ভাবের উদয় হইত তাহাদের অভিব্যক্তি। সংসার হইতে প্রতিহত হইয়া তাঁহার সমস্ত মনন-শক্তি ও

কৌতূহল বহিঃপ্রকৃতির প্রতি বদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার প্রকৃতি-বর্ণনা এক দিকে অনন্যকর্ম্মার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তির ও অপর দিকে পারিবারিক সৌভাগ্যবঞ্চিত হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি-ভালবাসার স্নেহার্দ্র স্পর্শের পরিচয় দেয়। তাঁহার স্নেহ-বুভুক্ষিত মন প্রকৃতির মধ্যে চোখের সৌন্দর্য-তৃপ্তি ছাড়া একটা গভীরতর শান্তি-উৎসের সন্ধান পাইয়াছিল—প্রকৃতির মধ্য দিয়া তিনি যেন ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করিতেন। কাজেই তাঁহার নিসর্গ-কবিতা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পূর্বসূচনা, আধ্যাত্মিক উচ্চ সুরে বাঁধা। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার কবিতা উচ্চাভিলাষহীন জীবনের পরিপূর্ণ শান্তি ও সন্তোষে ভরপূর, কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, ইহার পিছনে এক ভয়াবহ সম্ভাবনা তাহার দীর্ঘ শীর্ণ প্রেতচ্ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে। সূর্যালোকে ঝলমল তুষারক্ষেত্রের সূক্ষ্ম শ্বেত আবরণের নীচে যেমন হ্রদের জলরাশি তাহার সমস্ত ক্ষুব্ধ আলোড়ন লইয়া বহির্গমনের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ কুপারের কবিতায় শান্তি ও আনন্দের বহিরাবরণের তলে এক সুগভীর, উদ্বেল-প্রায় অশ্রুসমুদ্র প্রচ্ছন্ন আছে।

(২) বর্ত্তমানের প্রতি বিরাগ অতীতে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রবৃত্তিকে জাগরিত করে। নূতন ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করার মত প্রতিভা সুলভ নহে। কাজেই যে পর্য্যন্ত এইরূপ প্রতিভার আবির্ভাব না হয় সে পর্য্যন্ত অতীতের অনুকরণই বর্ত্তমান-বিরাগী কবিদের প্রধান অবলম্বন হয়। এই সময় মধ্যযুগ ও আরও সুদূর অতীতকাল লেখকদের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। অতীতের নানাবিধ বিচিত্র আচার ব্যবহার, কুসংস্কার, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস, আধ্যাত্মিক মনোভাব—এগুলি বিশেষভাবে শুষ্কযুক্তিবাদের দ্বারা পীড়িত মনকে আকর্ষণ করিতে থাকে।

কেল্‌ট ও ইংরেজদের পূর্বপুরুষের আদিম আবাসস্থল স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার নানা অপ্রাকৃত উপাখ্যান ও অলৌকিক সংস্কার গ্রে, কলিন্স, ওয়ার্টন ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি কবিদের কল্পনাকে উত্তেজিত করিল। মধ্যযুগের অপেক্ষাকৃত সন্নিহিত অতীতও কবিতার বিষয় হইল। অবশ্য এই অতীত-পন্থী কবিতার কাব্যমূল্য খুব উচ্চ নহে। অতীতের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপনের জন্য যে ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা এই কবিদের ছিল না।

এই জীবন-যাত্রার বাস্তব ভিত্তি পর্য্যন্ত ইঁহারা পৌছাইতে পারেন নাই—বর্তমানের সহিত তুলনায় ইহার আচার ব্যবহারের ও সমাজ-ব্যবস্থার পার্থক্য, ইহার ধর্মবিশ্বাসের কল্পনা-প্রবণতা, ইহার উপরিভাগের রং-এর ঘটাই ইঁহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ইঁহাদের কবিতার আসল মূল্য এই যে, ইঁহারা আগামী যুগের রোমান্টিক কবিতার পথ নির্দেশ করিয়াছে। যুক্তির নিরবচ্ছিন্ন শাসনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইহারা দীর্ঘকাল-সুপ্ত কল্পনা ও ভাবাবেগের কুম্ভকর্ণ-নিদ্রা, বৈধ ও অবৈধ, সহজ ও কৃত্রিম, যে কোন উপায়ে ভাঙ্গাইতে চেষ্টা করিয়াছে। ফলের তুলনায় চেষ্টাটা একটু অতিরিক্ত, কল্পনার সাবলীল সৃষ্টির পরিবর্তে মন্ত্রোচ্চারণ ও উপকরণ-বাহুল্যের মাত্রাই অত্যধিক হইয়াছে। বিখ্যাত সমালোচক ডাঃ জনসন এই কবিদের এই গলদ্‌ঘর্ম সচেষ্টতার দিকটাকেই পরিহাস করিয়া লিখিয়াছেন "Double, double, toil and trouble"। ইহা সত্ত্বেও গ্রে ও কলিন্সের (Collins) কবিতার একটা চিরস্থায়ী মূল্য আছে। গ্রের Elegy ও কলিন্সের Ode to Evening কবিতাদ্বয়ের মধ্যে বহিঃপ্রকৃতির প্রতি ঘনীভূত অনুরাগের, এক বিশেষ ভাব-ব্যঞ্জনার মধ্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলিকে ধরিয়া তাহাদিগকে সমগ্রভাবে রূপায়িত করার সার্থক চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই যুগে অতীত-প্রীতি এক উদ্ভট ও অসাধারণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, কবিযশঃ-প্রার্থীরা পরের লেখা নিজের লেখা বলিয়া চালাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সময় ঠিক ইহার বিপরীতই ঘটিয়াছে। তৎকালীন নিবিড় অতীত-মোহের সুযোগ লইয়া অন্ততঃ দুইজন লোক নিজেদের রচনা অতীত যুগের কাব্যের অনুবাদরূপে প্রচার করিয়াছেন। মৌলিকতার কৃতিত্ব পরিহার করিয়া প্রাচীন কবির অনুবাদক-রূপে পরিচিত হওয়ার চেষ্টায় বুঝা যায় যে, সে যুগে বর্ত্তমানের প্রতি বিরক্তি কি তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। ম্যাকফার্শন (Macpherson) তাঁহার ওশিয়ান কাব্যে (Ossian) কেল্‌ট জাতির সুদূর অতীতের বিস্মৃতি-বিলুপ্ত এক মহাকবির বাণী আধুনিক ভাষায় রূপান্তরিত করার দাবী করিয়াছেন। জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত, প্রাক্তন গৌরবের করুণ-স্মৃতিমাত্র-সম্বল, বন্য প্রকৃতির বিষাদচ্ছায়ার সহিত সহানুভূতিসূত্রে গ্রথিত জাতীয় জীবনের মর্ম্ম হইতে উদ্ভূত দীর্ঘনিশ্বাস এই

কাব্যের ধ্বনিবহুল, বিলম্বিতগতি গদ্যছন্দের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ভাষাবিদ্ ও অতীত ইতিহাসে বিশেষজ্ঞদের নিকট এই জুয়াচুরি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ম্যাকফার্শনের কাব্যে আধুনিক মনোভাবই অতীতের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হয়ত হাইল্যাণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে এইজাতীয় কিছু বিচ্ছিন্ন খণ্ড কবিতার সন্ধান তিনি পাইলেও পাইতে পারেন। কিন্তু তাহার সমগ্র রূপ ও আকার তাঁহার নিজেরই সৃষ্টি। ম্যাকফার্শনের কুহেলিকা-মণ্ডিত কল্পনায় মধ্যেই এই তথাকথিত প্রাচীন মহাকাব্যের কলেবর-স্ফীতি ও বর্ণনা-ভঙ্গী-গৌরবের উদ্ভব-রহস্য নিহিত।

এই জুয়াচুরির দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটী আরও করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। পনর বৎসরের ছেলে চ্যাটারটন (Chatterton) কবি-প্রতিভার স্ফূরণ অনুভব করিল। তাহার পিতা ব্রিষ্টল নগরের মধ্যযুগীয় গীর্জার কর্মচারী। বালকের মনে মধ্যযুগের শিল্প, স্থাপত্য, সৌন্দর্যরীতি, ইহার চিত্রিত পুঁথি ও গীর্জার নানাবর্ণ-রঞ্জিত কাচের জানালা গভীর রেখাপাত করিল—সে মধ্যযুগের স্বপ্নে বিভোর হইয়া মন্দিরের স্বল্পালোকিত কক্ষগুলির মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল। এই ধ্যান-তন্ময় অবস্থার মধ্যে তাহার মনে হইল যে, নিজের কবিতাগুলি এক মধ্যযুগীয় কাল্পনিক কবির নামে চালাইয়া দিলে ক্ষতি কি? এই পরিকল্পনা অনুসারে বালক একদিন হঠাৎ প্রচার করিল যে, সে মন্দিরের মধ্যে এক পুরাতন সিন্দুকে রক্ষিত হস্তলিখিত পুঁথি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাহার মধ্যে রোলি নামক এক কবির রচনা আবিষ্কার করিয়াছে এবং নমুনা স্বরূপ কয়েকটী স্বরচিত কবিতা মধ্যযুগের ইংরাজী ভাষায় রূপান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত রহস্য ধরা পড়িয়া গেল। পঞ্চদশ শতাব্দীর ভাষা ও বাক্যপ্রয়োগ-রীতি (idiom) সম্বন্ধে চ্যাটারটনের কিছুই জ্ঞান ছিল না—সে কবিতাগুলি আগাগোড়া আধুনিক-ভাষায় লিখিয়া অভিধানের সাহায্যে কয়েকটি শব্দের মধ্যযুগীয় প্রতিশব্দ প্রয়োগ করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এইরূপ কৃত্রিম প্রণালীতে লিখিত হইয়াও কবিতাগুলি তাহাদের কাব্যরস হারায় নাই। চ্যাটারটন প্রকৃত কবি; ভাষার অপরিচয় ও দুরূহতা তাহার কবিত্ব-প্রবাহকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য্যের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, ভাষার নিটোল পরিপূর্ণতা ও ইন্দ্রজালকৌশল পরবর্তী যুগের মহাকবি কীট্‌সের কথা মনে পড়াইয়া দেয়। কিন্তু তখনকার কালে এই সমস্ত গুণের রসবোধ করিবার লোক খুব বেশী ছিল না। চ্যাটারটন তিন বৎসর পর্য্যন্ত জীবিকার্জ্জনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিল—কিন্তু অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ ও নিরুপায় হইয়া আঠার বৎসর মাত্র বয়সে আত্মহত্যার দ্বারা নিজ যন্ত্রণার অবসান করিল। বাঙ্গালা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের "ভানুসিংহের পদাবলী" এইরূপ নির্দোষ রহস্যপ্রিয়তার উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের পরিহাস-প্রবৃত্তি নিজ আত্মীয়-বন্ধু-মণ্ডলীতেই সীমাবদ্ধ ছিল—তিনি বাহিরের সাহিত্য জগৎকে ঠকাইতে চেষ্টা করেন নাই। সৌভাগ্যক্রমে জীবিকার্জ্জনের পথ উন্মুক্ত করার কঠোর প্রয়োজন তাঁহাকে এই পথে প্রণোদিত করে নাই। বাল-সুলভ কৌতুক-প্রিয়তার যে নিদারুণ বিষাদময় পরিণতি চ্যাটারটনের জীবনে সংঘটিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাহার পুনরাবৃত্তি হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের কি সর্ব্বনাশ হইত ভাবিতে হৃৎকম্প হয়।

অতীত যুগের কবির মধ্যে যাঁহারা অষ্টাদশ শতকের মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্পেন্‌সার ও মিলটন এই যুগের কবিদের সশ্রদ্ধ অনুকরণের পাত্র হইলেন। স্পেন্‌সারের স্বপ্নময়, অবাস্তব সৌন্দর্য ও মিলটনের প্রকৃতির সহিত সূক্ষ্ম-সম্পর্কান্বিত, চিন্তাশীল বিষাদ-প্রবণতা ইঁহাদিগকে প্রবল ভাবে আকর্ষণ করিল। টমসন, গ্রে, কলিন্স প্রভৃতি মুখ্য কবিদেরও উপর এই দুই মহাকবির প্রভাব লক্ষিত হয়। টমসনের (Castle of Indolence) 'আলস্য-মন্দির' স্পেনসারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুকরণ। ইহার শ্লথ-মন্থর ছন্দোবিন্যাস ও স্বপ্নাবেশ-পূর্ণ কল্পনা-সৌন্দর্য অষ্টাদশ শতকের যুধ্যমান, তর্কপ্রবণ মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। গ্রে ও কলিন্সের খণ্ড কবিতায় মিলটনের ভাব ও ভাষার সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি অনুভূত হয়। বিশেষতঃ ইহাদের কবিতায় মৃদু, শান্ত বিষাদপ্রবণতার প্রাদুর্ভাব ড্রাইডেন্ পোপের ঐহিক-সুখসর্ব্বস্ব, আত্মতৃপ্ত ভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে। এইরূপে তিলে তিলে রোমাণ্টিক যুগের চিত্তক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। কবি-মনোরাজ্যের দূরদিগন্তে যে কুহেলিকা-জাল বিস্তৃত, যে মেঘপুঞ্জ সঞ্চিত হইতে লাগিল,

তাহারই নেপথ্য অন্তরালে কবিকল্পনার নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, রহস্যবোধের অভিনব বিস্ময় বিদ্যুৎবিকাশের ন্যায় আবির্ভাবের অবসর-প্রতীক্ষায় রহিল। নূতন শতাব্দীর উষাগমের কিছু পূর্বেই এই অরুণোদয় কাব্যজগতের এক নূতন অধ্যায় উদ্ঘাটিত করিল।

বার্ণস (Burns) প্রায়-অশিক্ষিত কৃষক; কৃত্রিম নাগরিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসেন নাই। কাজেই তাঁহার ভাব-প্রবাহ সভ্য সমাজের বিধি-নিষেধের দ্বারা অবরুদ্ধ নহে। তাঁহার ভাষারও সহজ অকুণ্ঠিত প্রকাশ-ভঙ্গী, প্রচলিত সাহিত্যিক প্রথার আড়ষ্ট গতি ও শব্দ-বাহুল্যকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়াছে। সকল প্রকার ভাব-বর্ণনাতেই তিনি তুল্যরূপ সিদ্ধহস্ত; সর্ব্বত্রই তীব্র, বেগবান্ প্রাণস্পন্দন ও স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি অনুভূত হয়। তাঁহার প্রেম কবিতায় এক দুর্ব্বার, সঙ্কোচহীন আশঙ্কা, প্রচণ্ড বুভুক্ষা অভিব্যক্ত হইয়াছে—প্রত্যেকটীর মধ্যে যেন উষ্ণ রক্তধারা প্রবাহিত। কবি ভালবাসা লইয়া আদর্শবাদের স্বপ্নজাল বুনেন নাই, তাহার আধাররূপে কোন অতীন্দ্রিয় মায়ালোক সৃষ্টি করেন নাই। ইহা তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ উপভোগের বিষয়; ইহার বাস্তব স্পর্শ তাঁহার রক্তে যে উন্মাদনা জাগাইয়াছে তাহাই তিনি কবিতার ছন্দে ও ভাষার ঋজু ওজস্বিতায় ফুটাইয়াছেন। প্রেমের সর্ববিধ ভাব-বৈচিত্র্য—মিলনের আনন্দ, বিদায়ের বেদনা, আহ্বানের আদর-সোহাগ, অভিমানের ক্ষুব্ধ ঔদাসীন্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজয়ের গ্লানি ও প্রত্যাখ্যানের নির্মম আঘাত —সমস্তই তাঁহার মনে ও কবিতায় প্রগাঢ় অনুভূতিতে তরঙ্গায়িত হইয়াছে! তাঁহার ব্যঙ্গ ও শ্লেষ কবিতায়, তাঁহার সাধারণ মানবত্বের মহত্ত্ব-প্রচারে ও আভিজাত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণাতেও সেই স্থির, অভ্রান্ত লক্ষ্য, বিদ্যুৎশিখার ন্যায় মর্মভেদী দাহিকা শক্তি ও সহজ, উদাত্ত সম্ভ্রম-জ্ঞানের পরিচয় মিলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কাব্যক্ষেত্রে শুষ্ক নৈতিকতা, যুক্তিবাদ ও কেবলমাত্র চোখে দেখা, ভাবধারায় অস্নাত বস্তুপুঞ্জের যে কঠিন মৃত্তিকাস্তূপ জমা হইয়াছিল, এই প্রতিভার বরপুত্র অখ্যাত প্রাদেশিক ভাষায় রচনাকারী কৃষক কবি তাঁহার অপূর্ব্ব হল-চালনার দ্বারা সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিলেন; তাহার ভিতর দিয়া আমাদের সনাতন মানবজীবনের হাসি-কান্না, মৈত্রী-বিরোধের প্রবল ভাগীরথী-স্রোত বহাইয়া, ক্ষেত্রকে গুল্মকণ্টকহীন ও

উর্ব্বর করিয়া, ইহাকে আগামী যুগের অভাবনীয়রূপে প্রচুর ও বিচিত্র শস্য-সম্ভারের জন্য উপযোগী করিয়া তুলিলেন।

বার্ণস অপেক্ষা ব্লেক (Blake) রোমান্টিক যুগের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কান্বিত। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি তাঁহার জীবন ও কবিতার প্রাণস্বরূপ। ব্লেক অষ্টাদশ শতকের যুক্তিবাদ, সাধারণ জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভবকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়া খাঁটি অধ্যাত্ম-দৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়াছেন। ধ্যানলোকে তিনি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহার কবিতায় সেই ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি-গুলিকেই তিনি রূপ দিয়াছেন। তাঁহার চোখের সম্মুখে তিনি দেবদূতগণকে স্বর্গ হইতে ওঠা-নামা করিতে দেখিতেন ; ঘুমন্ত শিশুর নিকট শ্বেতবস্ত্র-পরিহিত পরীগণ সুখ-স্বপ্নের উজ্জ্বল দৃশ্যাবলী উন্মুক্ত করিত। জগতের সমস্ত জটিলতা ও গ্রন্থিবদ্ধ মিথ্যাপাশ তিনি শিশুসুলভ সরল, বিশ্বাস-ভরা দৃষ্টিতে ছিন্ন করিয়াছেন। মানব-জীবনকে একদিকে তিনি শিশুর আনন্দ-কোলাহলে মুখর ও অপর দিকে সন্ধ্যাগমে অন্ধকার-ভীরু, মাতার স্নেহ-শীতল ক্রোড়ের জন্য উন্মুখ, শিশুর অসহায় ভীতিবিহ্বলতায় করুণ ও রহস্যমণ্ডিতরূপে অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার প্রায় সমস্ত কবিতাতেই শিশু-মনোরাজ্য লইয়াই কারবার। শিশু যখন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ অজ্ঞানাবস্থা হইতে পার্থিব অভিজ্ঞতায় প্রথম পদক্ষেপ করে, তখন যে সমস্ত ব্যাকুল, উত্তরহীন প্রশ্ন তাহার কৌতূহল-বিস্ফারিত চক্ষে নামহীন ভয়ের ছায়াপাত করে, সেই ভয়ের হিমস্পর্শ ব্লেক তাঁহার কবিতায় সার্থক ব্যঞ্জনায় ফুটাইয়াছেন। একই ঈশ্বর যে নিরীহ মেষশাবক ও হিংস্র ব্যাঘ্রকে সৃষ্টি করিয়াছেন ইহাই তাঁহার নিকট সৃষ্টিরহস্যের দুর্জ্ঞেয়তার প্রমাণ ও প্রতীক। ভগবানের কল্যাণহস্ত হইতে শান্তি ও বজ্র কেন একসঙ্গে নামিয়া আসিয়াছে এই চিরন্তন সমস্যা তাঁহার মনকে প্রশ্নমথিত করিয়াছে। ব্যাঘ্রের জ্বলন্ত, উল্কাপিণ্ডবৎ চক্ষুতে তিনি স্রষ্টার সুবিপুল, বজ্র-কঠোর শক্তির অগ্নিশিখা প্রত্যক্ষ করিয়া মূঢ়, স্তম্ভিতভাবে ইহার কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়াছেন।

একদিক দিয়া দেখিতে গেলে ব্লেকের অধ্যাত্মবাদ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলির অপেক্ষা অধিকতর একনিষ্ঠ ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার আত্মজীবন-কাহিনীতে তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টির উদ্বোধনের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে

অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বিভিন্ন দৃশ্যগুলি যুক্তি-শৃঙ্খলায় বদ্ধ, ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা সহজবোধ্য করিয়া পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন—তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের নিগূঢ় রহস্যকে সর্ব্বসাধারণের অনুভবগম্য করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। শেলীর আকাশ-বিহার যুক্তিবাদের রজ্জুধৃত। ব্লেক কিন্তু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা একেবারেই স্বীকার করেন নাই—তাঁহার মন্ত্ররহস্যে তিনি অন্য কাহাকেও দীক্ষিত করিতে চাহেন নাই। তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও সাধারণ পাঠকের বোধশক্তির মধ্যের ব্যবধানের উপর সেতুরচনার জন্য কোন উপকরণই তিনি সংগ্রহ করেন নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে এই যে তাঁহার শেষ বয়সের রচনাগুলি একেবারে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে—পাঠকের সহিত কবির যোগসূত্র একেবারেই ছিন্ন হইয়াছে। তাঁহার ভবিষ্যৎ-বাণী-সংবলিত পুস্তিকাগুলিতে (Prophetic Books) যে ভাষা ও রূপক-প্রণালী ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা তাঁহার নিজের মনের কুহেলিকাজালেই সমাচ্ছন্ন—তাঁহার মনে যে সমস্ত অস্পষ্ট, অর্দ্ধভাস্বর ছায়া-মূর্ত্তি বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে তাহারা পাঠকের মনে কোন সুস্পষ্ট আলোক-রেখার বেষ্টনীতে ধৃত হয় না। বরং তাঁহার পত্রাবলীতে তাঁহার জীবন-দর্শনের কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। সেখানে কবি আমাদের জানাইয়াছেন যে চক্ষু-কর্ণের সাক্ষ্য ভ্রান্তির দ্বার, যুক্তিতর্ক শয়তানের বেড়াজাল, নিয়ম-সংযম বিষয়ে ধর্ম্মের অনুশাসন মূর্ত্তিমান্ পাপ, নিজ কল্পনার অনুসরণ ও সুস্থ, স্বাধীন প্রবৃত্তির নির্ভীক চরিতার্থতা-সাধনই পবিত্র কর্ত্তব্য। এই মৌলিক দার্শনিকতার পটভূমিতেই তাঁহার কবিতাগুলি রচিত। এই ক্ষেত্র হইতেই তাহারা রসগাঢ়তা, হীরকখণ্ডের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন দীপ্তি ও নিক্ষিপ্ত তীরের ন্যায় গতিবেগ আহরণ করিয়াছে। তাঁহার প্রথম বয়সের কবিতাগ্রন্থ দুইখানি স্বচ্ছ অধ্যাত্মদৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময় ও অপার্থিব সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিতে অর্থগূঢ়। ব্লেক উষাগমের বহুপূর্ব্বে, প্রায় মধ্য রাত্রিতে, রোমান্স-নিশীথিনীর ডাক শুনিতে পাইয়াছিলেন। রোমান্টিক কবিবংশের তিনিই প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোমাণ্টিক যুগ

(১৭৯৮—১৮৩২)

(১)

রোমাণ্টিক যুগ ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে এলিজাবেথীয় যুগের ন্যায় আর একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এক হিসাবে এলিজাবেথীয় যুগ অপেক্ষাও ইহার আবেদন আরও সার্ব্বভৌম। এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্যের পটভূমিকায় আছে কর্ম্মবহুল, কীর্ত্তিভাস্বর, অসাধ্যসাধনে উন্মুখ জাতীয়তাবোধ। ড্রেক ও র‍্যালের পৃথিবী প্রদক্ষিণ ও নব দেশাবিষ্কার, প্রবল আক্রমণোদ্যত বৈদেশিক শত্রুর ধ্বংস, সদ্যজাগ্রত জাতীয় জীবনের উদ্দীপনা, অপরিমিত আশা-আকাঙ্ক্ষায় স্ফীত কল্পনা, দিকে দিকে অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ গণ্ডীর প্রসারণ—এই প্রতিবেশের মধ্যে শেক্সপিয়ার-বেকনের সাহিত্য অভ্রভেদী গৌরবে মাথা তুলিয়াছে। যে সকল জাতির অদৃষ্টে এই ঐতিহ্য-সম্পদ্ নাই—তাহাদের নিকট ষোড়শ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্য নিজ চরম অর্থগৌরব উদ্‌ঘাটন করে না। ভারতবাসী আমাদের প্রতিও এই মন্তব্য প্রযোজ্য। আমরা শেক্সপিয়ারের প্রতি উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে অধিষ্ঠিত দেব-মন্দিরের ন্যায় সবিনয় শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্য পাঠাই। তাঁহার অভিজ্ঞতা যে কোনও দিন আমাদের হইবে এরূপ আশা করিতে পারি না। বাস্তবিক যে বাত্যা-বিক্ষুব্ধ, দুরবগাহ মহাসমুদ্রে অবতরণ করিয়া শেক্সপিয়ার তাঁহার অমূল্য রত্নরাজি আহরণ, যে নরকাগ্নি-প্রোৎক্ষিপ্ত, কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশির মধ্যে তাঁহার ঐশী দৃষ্টি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা আমাদের কোনকালে অধিগম্য হইবে বলিয়া ভরসা হয় না। কাজেই এলিজাবেথীয় যুগের সহিত আমাদের দুস্তর ব্যবধান কেবল সপ্রশংস রসানুভূতির দ্বারা খণ্ডিত হয় না।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে কাব্যধারা উদ্ভূত হইল, তাহার সহিত আমরা একটা নিবিড় আত্মীয়তাবোধ, এমন কি সম্পূর্ণ একাত্মতাও অনুভব

করি। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আমাদের জীবনের চরম সাধনা ও পরম আদর্শ যেন এই যুগের কবিতাতেই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। আমাদের সমৃদ্ধি ও রিক্ততা, যেখানে আমরা শক্তিশালী ও যেখানে আমরা দুর্বল—সমস্তই এই যুগের কাব্যে মূর্ত্ত হইয়াছে। ওয়ার্ডসৃওয়ার্থ যেন আমাদেরই সনাতন ঋষির মত প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের জ্যোতির্ম্ময় আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার শান্তিমন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। শেলী (Shelley) উপনিষদের স্রষ্টার ন্যায় বিশ্বের অণুপরমাণুতে 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' ঐশী লীলার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন। আমাদের বাস্তব-বিড়ম্বিত, ব্যর্থ জীবনের করুণ অসহায়তা, আমাদের আদর্শ-লোকে পক্ষবিস্তারের ক্ষণস্থায়ী, ক্লান্ত প্রচেষ্টা যেন তাঁহার গীতিকবিতায় অপরূপ অভিব্যক্তিলাভ করিয়াছে। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যোপাসনা আমাদের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম কিনা, তাহা খুবই অনিশ্চিত—হয়ত আমাদের সদা জাগ্রত, তীক্ষ্ণ ধর্ম্মজ্ঞানের প্রবল অভিভব হইতে আমাদের সৌন্দর্য্যবোধ কোনও দিন সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে নাই। তথাপি যখন আমরা কীট্‌সের (Keats) অবিমিশ্র সৌন্দর্য্যরসে অভিষিক্ত কবিতা পাঠ করি, পৃথিবীর আদিম যুগের যে শৈশবকল্পনা ক্রীড়াচ্ছলে নানা সুন্দর রূপক ও দেবমূর্ত্তি উদ্ভাবন করিয়াছিল তাহার বিস্ময়কর পুনর্বিকাশ দেখিতে পাই, তখন যেন আমাদের মানস-জগতের এক দীর্ঘদিনরুদ্ধ দ্বার খুলিয়া যায় ও আমরা যেন বৈদিক-ঋষি-কল্পিত সপ্তাশ্ববাহিত, অরুণ-সারথি সূর্য্য ও কুহেলিকাজাল হইতে উদ্ভূত রক্তিম-বসনা উষাদেবীর সৃষ্টি-রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করি। মানবহৃদয়ের সনাতন সৌন্দর্য্যবোধ ও রহস্যানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই এই রোমান্টিক যুগের কবিতা সমগ্র বিশ্বমানবের সাধারণ উপভোগের বিষয়। তাই এত সহজে আমাদের অমর কবি রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের সুরটী ধরিয়া ইহাকে আমাদের পরিচিত প্রতিবেশের মধ্যে, আমাদেরই জীবন-বীণায়, নূতন ব্যঞ্জনা ও বিস্তারের সহিত ঝঙ্কৃত করিয়াছেন।

অবশ্য এই কাব্যের সৌন্দর্য্যসৃষ্টির পশ্চাতে ফরাসী-বিপ্লবের প্রচণ্ড বিস্ফোরক শক্তির প্রেরণা আছে। ওয়ার্ডসৃওয়ার্থ, শেলী ও বাইরণের কবিতায় এই বিপ্লব-ঝটিকার বায়ুস্রোত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বহিয়া গিয়াছে। ফরাসী দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও নেপোলিয়নের সহিত

জীবনপণ যুদ্ধ—ইহারাই এই যুগের কাব্যের সামাজিক পটভূমিকা। ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের ধ্যান-সমাহিত শান্তিবাদের পিছনে আছে বিপ্লবের তুমুল আলোড়নের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি। তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যে শক্র-আক্রমণ প্রতিরোধের অনমনীয় দৃঢ়-সংকল্প, ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, আত্মিক শক্তির উপর একান্ত নির্ভরের ছাপ মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি যেন তূর্য্যধ্বনি করিয়া দেশকে হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, তুচ্ছ সুবিধাবাদ ও বণিকবৃত্তির লোলুপতা পরিহারপূর্ব্বক নৈতিক সাহসের বর্ম্মাবৃত হইয়া শত্রুর সম্মুখে নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান হইতে আহ্বান করিয়াছেন। শেলীর কবিতার প্রত্যেক ছত্রই এই বাত্যাবিক্ষুব্ধ বিপ্লবসিন্ধুর লবণশীকরসিক্ত। তাঁহার আশাবাদী কল্পনা ধ্বংসলীলার পশ্চাতে এক নিখুঁত সমাজ ও নীতি-ব্যবস্থার উজ্জ্বল ছবি, এক অনবদ্য কল্পলোকের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করিয়াছে—ঝঞ্ঝাতাড়িত তরঙ্গ-বিক্ষোভের পরপারে স্বর্ণময় যুগের সপ্তবর্ণ-রঞ্জিত ইন্দ্রধনু-প্রসার দেখিয়াছে। বাইরণের (Byron) কবিতায় এই ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব এক প্রবল উচ্ছৃঙ্খল ঘূর্ণীবায়ুরূপে প্রাচীন ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়াছে। তাঁহার তীব্র, সর্ব্বব্যাপী শ্লেষে ইহার ভগ্নাবশেষগুলি ধূলিকণার ন্যায় দিগ্‌বিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বিপ্লবের বারুদে সনাতন সমাজনীতির সুদৃঢ় প্রাকার ফাটিয়া পড়িলে বাইরণের শ্লেষ-সম্মার্জনী ইহার চূর্ণীকৃত উপাদানগুলিকে আবর্জনা-স্তূপের শেষ আশ্রয়স্থলে ঝাঁটাইয়া ফেলিয়াছে। কোলরিজের প্রথম যুগের কবিতায় ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক মতবাদ ও নৈতিক সমর্থন বিষয়ে আলোচনা আছে। তবে এগুলি কবির অপরিণত রচনা বলিয়া ইহাদের মধ্যে সেরূপ কাব্যোৎকর্ষ নাই। এক কীট্‌সের কবিতায় সমসাময়িক রাজনৈতিক সংঘটনের কোন উল্লেখ নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সে সময় ফরাসী-বিপ্লবের আদর্শবাদ ও ভাবোন্মাদনা সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হইয়াছিল—সুতরাং তরুণ কবি বহির্জগৎকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া সৌন্দর্য্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং যে স্বচ্ছ, সহজাত অন্তর্দৃষ্টির বলে সত্য, শিব ও সুন্দরের অভিন্নত্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠে তাহারই অনুশীলনে ব্যাপৃত ছিলেন।

ফরাসী বিপ্লবের মত আন্দোলন আমাদের ইতিহাসে ঘটে নাই ইহা সত্য—তথাপি ইহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না।

অন্যান্য সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সহিত তুলনায় ফরাসী-বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য—ইহার সার্ব্বভৌম প্রসার ও আবেদন। ইহার সুদূর-প্রসারী আলোড়ন দেশ-কালের গণ্ডী ছাড়াইয়া নিখিল মানবের চিত্ততটে প্রহৃত হয়। সংশ্লিষ্ট বহির্ঘটনাপুঞ্জকে ছাড়াইয়া ইহার সাঙ্কেতিক ও আধ্যাত্মিক মহিমা ভাবরাজ্যের উর্দ্ধাকাশে আরোহণ করে। ইহা কেবল শাসন-প্রণালী ও রাজ্যব্যবস্থার পরিবর্ত্তন নহে—চিন্তা ও কর্ম্মজগতের সর্ব্বপ্রকার খর্ব্বকারী শৃঙ্খল হইতে মানবমনের মুক্তিঘোষণা। কাজেই সকল যুগের ও দেশের লোকই ইহার সহিত হৃদয়ের নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব করে। ইহার দক্ষিণ বায়ু হিল্লোলে বিশ্ব-মানবের চিত্ত নব-নব আশা-আকাঙ্ক্ষায় মুকুলিত হইয়া উঠে—তাহার কল্পনার সম্মুখে অভূতপূর্ব্ব সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। সেইজন্যই যে শক্তির প্রভাবে ওয়ার্ডসৃওয়ার্থ ও শেলীর কবিতা এত উদ্দীপনা-ময় ও প্রাণশক্তিসমৃদ্ধ তাহা আমাদের মনেও পূর্ণভাবে সংক্রামিত হয়; যে অক্সিজেন বাষ্প তাঁহাদের কাব্যে এত প্রচুর ধারায় প্রবাহিত, আমরাও পূর্ণ-ভাবে তাহা নিঃশ্বাস-বায়ুর সঙ্গে টানিয়া লই। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী রক্তকলুষিত জড় ঘটনাপুঞ্জের বন্ধনমুক্ত হইয়া এক সার্ব্বভৌম আদর্শের পতাকা-রূপে আমাদের চিত্তাকাশে উড্ডীন হইতে থাকে। তাই ইংরেজ শাসনের প্রথম যুগে আবির্ভূত বাঙালী রাজা রামমোহন রায়, ছয়শত বৎসরের রাজ-নৈতিক পরাধীনতা সবলে অস্বীকার করিয়া, সামাজিক বিবর্ত্তন-প্রথার অপরিহার্য্যতা ভুলিয়া, সুদূর প্রতীচ্যের এই উদাত্ত ঘোষণা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছেন ও ফ্রান্সকে নিজ দ্বিতীয় মাতৃভূমিরূপে অভিনন্দন করিয়াছেন। এই ধাত্রীস্তন্যরস-পুষ্ট হইয়াই ভারতবাসী ইউরোপের উন্নতিশীল জাতিসমূহের সহিত ভ্রাতৃসম্বন্ধ অনুভব করিয়াছে; এই অধিকার বলেই, কর্ম্মশক্তিতে বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিয়াও, কাব্য ও চিন্তা জগতে তাহাদের সহিত সমতালে অগ্রসর হইয়াছে।

(২)

এইবার রোমান্টিক যুগের প্রধান বিশেষত্ব ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিব। অষ্টাদশ শতাব্দীর আলোচনা প্রসঙ্গে যে পূর্ব্বলক্ষণগুলি উল্লিখিত হইয়াছিল, এই যুগে তাহাদের পূর্ণ পরিণতি।

এই যুগের নিসর্গ-কবিতা অতুলনীয়। প্রকৃতির সহিত মানবের সংস্পর্শ, এরূপ নিবিড় অন্তরঙ্গতা, এরূপ বিস্তার ও ব্যাপকতা লাভ করিল, যাহা পূর্ব্ব যুগে অচিন্তনীয় ছিল। প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ উপভোগে কবির ইন্দ্রিয় অভূতপূর্ব্ব সূক্ষ্ম চেতনার পরিচয় দিল। তাহার মুখের প্রত্যেকটী রেখা ও আলোছায়ার খেলা, তাহার সঙ্গীতের সূক্ষ্মতম রেশ ও অনুরণন, তাহার বর্ণের অফুরন্ত বৈচিত্র্য ও গন্ধের ক্ষীণতম প্রবাহ কবির অনুভূতির নিকট ধরা পড়িয়া গেল। শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতির অন্তরতম রূপটী অনুভব করা যায় না—বাহিরের রূপের চারিদিকে যে আত্মার সুকুমার জ্যোতির্মণ্ডল বিস্তৃত আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে ধ্যানময়, অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির প্রয়োজন। প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালবাসা, নিবিড় একাত্মতাবোধ কবির এই ধ্যানচক্ষু খুলিয়া দিল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির সহিত মানব-চিত্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূচক যে দার্শনিক মতবাদ নিজ প্রত্যক্ষ অনুভূতির ভিত্তিতে প্রচার করিলেন, তাহা এই যুগের সমস্ত কবিই সামান্য কিছু মত-বৈশিষ্ট্যের সহিত গ্রহণ করিলেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সহিত মূল সুরে সকলেই সুর মিলাইলেন। টম্‌সন, গ্রে, কলিন্স, কুপার প্রভৃতি যে বিশিষ্ট মনোভাব নিজ নিজ কবিতায় বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিতরূপে প্রকাশ করিতেছিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে পৌঁছিয়া তাহা এক অখণ্ড, প্রগাঢ় দার্শনিক অনুভূতির রূপ লাভ করিল। প্রকৃতি ও মানব মনের আদান-প্রদান, ভাববিনিময় যুগ-কবিতার প্রধান আশ্রয় ও উপজীব্য হইয়া উঠিল।

এই যুগের কাব্যে প্রকৃতিবর্ণনার বৈচিত্র্য এত বেশী যে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। ফুল ও পাখী সম্বন্ধেই বিভিন্ন কবির কল্পনার লীলাবৈচিত্র্যের কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পুষ্প-কবিতাগুলি ফুলের বর্ণ ও গন্ধ সম্বন্ধে তাদৃশ সচেতন নহে। তাঁহার তপস্বী সাধকের মন সৌন্দর্য্যহীন, অতি সাধারণ, পথিপার্শ্বে অনাদৃতভাবে উৎপন্ন ফুলগুলির মধ্যেই বিশেষ প্রেরণা পাইয়াছে। এই দরিদ্রের দুলালগুলির উপেক্ষিত ম্লান সৌন্দর্য্য, তাহাদের অস্বীকৃত মহিমা তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে মানবের শিক্ষণীয় অনেক গুণ তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন ও ইহাদের বর্ণনাব্যপদেশে গার্হস্থ্য জীবনের উপযোগী নীতি-কথা প্রচার করিয়াছেন। শেলীর পুষ্পকবিতায় ফুলের বহিঃসৌন্দর্য্যের বর্ণনা ও

রসোপলব্ধি আছে; কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আছে ইহার শিশিরাশ্রুসিক্ত, ক্ষণস্থায়ী জীবনের করুণ আবেদন, ইহার মানব জীবনের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন সূক্ষ্ম চেতনাবোধ ও ইহার অসীম ব্যঞ্জনা। ফুলের বর্ণনাত্মক বিশেষণ-গুলির মধ্যে ইহাদের মানস প্রকৃতির ইঙ্গিতই পরিস্ফুট। শেলির নিকট ফুল একদিকে মানুষের মত জীবন্ত ও সূক্ষ্ম-অনুভূতিশীল; অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্য-মাল্যের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত।

কীট্‌স আবার ফুলের বর্ণগন্ধাত্মক রূপটাই বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন। মাটির রস কি নিগূঢ় প্রক্রিয়ায় পুষ্পের বিচিত্র পেলবতা ও বর্ণ-প্লাবনে বিকশিত হইয়া উঠে তাহারই সূক্ষ্ম, সুকুমার অনুভূতি কীট্‌সের বর্ণনায় মূর্ত হইয়াছে। তাঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, ফুলের কোমল স্পর্শ যেন আমাদের মুষ্টিতে ধরা দিয়াছে, তাহার শীতল সুরভি যেন আমাদের চারিপাশে ঘন বায়ুমণ্ডল সৃজন করিয়াছে। তাহার ক্ষণস্থায়িত্বের জন্য শোক শেলির মত তাহাকে অপার্থিব ইঙ্গিতে রহস্যময় করে না; তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটাকে আরও নিবিড় ও মোহময় করিয়া তোলে। পুষ্পসৌন্দর্য্যের নিখুঁত বর্ণনা ও রসোপভোগের মধ্য দিয়া ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকটিত করিয়াছেন তাঁহার নীতিপ্রচার; শেলী তাঁহার অসীমের উপলব্ধি ও ঊর্ধ্বলোক-প্রয়াণ; আর কীট্‌স তাঁহার সৌন্দর্য-পিপাসা ও মৃত্তিকার মাধ্যাকর্ষণের নিগূঢ় অনুভূতি।

পক্ষী-সম্বন্ধীয় কবিতাতেও এই তিন কবির বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ফুটিয়াছে।—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পাখীর উপর অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছেন—ইহাদের প্রত্যেকটী ভিন্ন-ধর্ম্মী। তাঁহার 'To a Skylark' কবিতায় বাস্তব পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তাঁহার অভ্যস্ত নীতি-প্রতিপাদন-প্রয়াসের সম্মিলন ঘটিয়াছে। 'The Cuckoo' কবিতায় কিন্তু নীতিপ্রতিপাদন একেবারেই নাই —আছে তাহার পরিবর্তে বাস্তব-বিলোপী অতীন্দ্রিয় অনুভূতি। তৃতীয় একটি কবিতায় কবি নাইটিঙ্গেলের উচ্ছ্বাসময়, আবেগকম্পিত স্বরলহরী অপেক্ষা ঘুঘুর করুণ, আত্মসমাহিত মৃদু কূজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আবেগের কবি নহেন, উচ্ছ্বাসহীন ভাব-তন্ময়তার কবি, কাজেই তাঁহার এই বিচার তাঁহার প্রকৃতি অনুযায়ীই হইয়াছে। 'The Green

Linnet' কবিতায় কবি সূর্যকরোজ্জ্বল, প্রভাত-প্রফুল্ল, আলো-ছায়া-চঞ্চল উদ্যান-শোভার সহিত পাখীর একাত্মতা অনুভব করিয়াছেন। আবার কবির মধ্যে যখন দার্শনিকভাবের প্রাধান্য, তখন যেন তিনি পাখীর নৃত্যভঙ্গীতে ও ফুলের সাধারণ সৌন্দর্যে অতীন্দ্রিয় ভাবের আভাস পাইয়াছেন।

শেলীর 'To The Skylark' নামক কবিতাতে যে মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা ওয়ার্ডসওয়ার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। শেলীর পাখী মাটির সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার করিয়া আকাশমার্গে উধাও হইয়াছে; সূর্যাস্তের বর্ণপ্লাবনে স্নান করিয়া, তাহার আভারঞ্জিত মেঘপুঞ্জে বিলীন হইয়া, মাটির চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে লোপ করিয়াছে। তাহার গান অগ্নিস্তম্ভের ন্যায় ভাস্বর, রজত-শুভ্র জ্যোৎস্নাধারার ন্যায় সর্বপ্লাবী; আবার প্রভাতম্লান চন্দ্রকিরণের ন্যায় চোখের দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াও অনুভূতিতে অলক্ষ্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠ। শেষ পর্য্যন্ত কবি অনুমান করিয়াছেন যে জীবনমৃত্যুর যে চিরন্তন রহস্য মানবের চিন্তাধারাকে ব্যাহত ও তাহার গানকে আকস্মিক ও ছেদবহুল করে, পাখী কোন অলৌকিক উপায়ে সেই রহস্যের মর্মভেদ করিয়াছে। এই পাখীকে উপলক্ষ করিয়াই কবির সমস্ত ব্যাকুল আত্মজিজ্ঞাসা, ব্যর্থ আদর্শানুসরণের সমস্ত অশান্ত চিত্তবিক্ষোভ মুক্তিলাভ করিয়াছে। মোট কথা শেলীর অবিমিশ্র আদর্শবাদই কবিতাটীর মধ্যে মূর্ত হইয়াছে; ছন্দের হ্রস্ব প্রসার ও ক্ষিপ্র গতিতে, উপমার মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনে ও সুরের তীক্ষ্ণ, মর্মভেদী মূর্চ্ছনায় পাখীর আকাশ-বিহারের তীব্র প্রেরণা ও তাহার ডানার দ্রুত, অশান্ত ঝাপট আশ্চর্যরূপে ধ্বনিত হইয়াছে।

কীট্‌সের 'Ode to a Nightingale' শেলীর মনোবৃত্তির সঙ্গে মিল ও পার্থক্য—উভয়েরই পরিচয় দেয়। কীট্‌সও শেলীর মত আদর্শবাদী, কিন্তু কীট্‌সের আদর্শবাদের মধ্যে মৃত্তিকার সহিত সম্পর্ক-ছেদ ও আকাশবিহারের প্রবণতা নাই। কীট্‌স চাহেন এই মাটির পৃথিবীর পরিপক্ব, অম্লান সৌন্দর্যরসের বাধাবন্ধহীন, পরিপূর্ণ উপভোগ। যে অকালমৃত্যু, মোহভঙ্গ, অতৃপ্তি ও অবসাদ এই ভোগের পরিপন্থী তাহাদেরই বিরুদ্ধে তাঁহার অভিমান ও অনুযোগ। শেলী বিপ্লবপন্থী, তিনি চাহেন সমাজ-ব্যবহারগত মৌলিক নীতির সম্পূর্ণ উন্মূলন। এই ঐতিহ্যরিক্ত, নগ্ন মানব-সমাজকে তিনি নূতন

করিয়া গড়িবার প্রয়াসী। বাহির হইতে আরোপিত বিধিনিষেধের পরিবর্তে অবাধ, অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণই এই নবগঠিত সমাজের নিয়ামক শক্তি হইবে। আদর্শবাদের স্বপ্ন জীবনবৃন্তে ফুটিয়া উঠুক, আশা ও আনন্দ সূর্যালোকের মত উজ্জ্বল ও সর্বব্যাপী হউক, জীবনের গতিচ্ছন্দ অন্তর-বাসনার তালে নিয়মিত হউক ইহাই ছিল শেলীর কাম্য। কীট্‌সের সৌন্দর্যোপাসনার মধ্যে কোন বৈপ্লবিকতার বিদ্যুৎ-শিখা বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নাই। নাইটিঙ্গেল কবিতায় কীট্‌স সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারার পরিবর্তে সৌন্দর্যলোকের বঙ্কিম, বিসর্পিত রেখার অনুসরণ করিয়াছেন। অবসাদ ও আনন্দের বিপরীতমুখী দোলায় তাঁহার চিত্ত তরঙ্গায়িত হইয়াছে, ইহাদেরই উত্থান-পতন ধরিয়া তাঁহার চিন্তা অগ্রসর হইয়াছে। নাইটিঙ্গেলের গানের সূত্র ধরিয়া তিনি নানা বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন—ফ্রান্স ইটালীর সূর্য্যকরোজ্জ্বল দ্রাক্ষাক্ষেত্র, বিগলিত সূর্য্যালোকধারার ন্যায় স্বচ্ছ, রক্তিম, বুদ্‌বুদ্‌বহুল মদ্য ও সুরভিত অন্ধকারে রহস্যময়, আঁকাবাঁকা অরণ্যবীথিকা। পাখীর স্বতঃ-উৎসারিত গীতিকে তিনি এই সৌন্দর্য্যপ্রতিবেশে বেষ্টিত করিয়া, এক চির-অম্লান, পরিবর্তনাতীত কল্পলোকের অন্তরবাণীরূপে অনুভব করিয়াছেন। ইহারই বিপরীত চিন্তাধারার অনুবর্তনে তিনি ক্ষয়শীল, ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনের অতৃপ্ত সৌন্দর্য্যপিপাসা, অর্দ্ধপথে বাধাপ্রাপ্ত, অকাল-বার্দ্ধক্য-বিড়ম্বিত তারুণ্যের বুভুক্ষু হাহাকারকে তীব্র অভিব্যক্তি দিয়াছেন। তিনি সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে পাখীকে অমর বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছেন। যে মানুষের জীবননীতি যোগ্যতমের উদ্বর্তন ও অযোগ্যের উৎসাদনের উপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে অনেকের ক্ষুধার উপর একের অন্ন নির্ভরশীল, পাখী তাহা হইতে স্বতন্ত্র জগতের অধিবাসী। সে মরণশীল সত্য, কিন্তু মানুষের ন্যায় তাহার সমস্ত জীবনযাত্রা মৃত্যুবীজাণুদুষ্ট নহে। এই অমরত্বের প্রমাণ যে—পাখীর গানের সুর যুগযুগান্তর ধরিয়া একই ভাবে মানবচিত্তকে প্রভাবিত করিয়া আসিতেছে। ইহা যেমন একদিকে স্বজন-বিরহ-ব্যথার সান্ত্বনা-প্রলেপ, অপর দিকে তেমনি অন্তরের নিভৃততম রহস্য-লোকের চেতনা-উদ্বোধক মন্ত্র। এইখানে কবির চিন্তাসূত্র আবার ছিন্ন হইয়াছে, আবার তিনি সৌন্দর্যের আদর্শ লোক হইতে বাস্তব জগতে নামিয়া আসিয়াছেন।

(৩)

সূক্ষ্ম বাস্তব-পর্য্যবেক্ষণ এই যুগের নিসর্গ-বর্ণনাত্মক কবিতার সাধারণ গুণ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পৃথিবীর পর্বত-উপত্যকা-হ্রদ-নদীতে মূর্ত চিরন্তন, অপরিবর্ত্তনীয় রূপ, শেলী উহার মুহূর্ত-স্থায়ী মেঘ-কুয়াশা-ইন্দ্রধনুর দ্রুত বিলীয়মান আকৃতি-রেখা ও কীট্‌স ইহার বৃক্ষলতা-পুষ্পসমন্বিত কোমল শ্যামলিমার অপূর্ব উজ্জ্বল ছবি আঁকিয়াছেন। তা ছাড়া, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিশেষ ভাব-ব্যঞ্জনা, মানব-মনের প্রতি ইহার নিগূঢ় আবেদন, আশ্চর্য্য সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত অনুভূত ও অভিব্যক্ত হইয়াছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পার্বত্য প্রকৃতির নিঃসঙ্গ গাম্ভীর্য্য, গিরিবেষ্টিত হ্রদের নিঃশব্দ বিজনতা, হেমন্ত-প্রভাতের প্রৌঢ়মনের প্রতি আবেদনশীল বিষাদচ্ছায়া, ঘুমন্ত মহানগরীর প্রভাত-সূর্য্যের কিরণোজ্জ্বল সুগভীর শান্তি, আকাশে-বাতাসে ব্যাপ্ত, গৃহহারা উদাস আনন্দের সুর চমৎকারভাবে ফুটাইয়াছেন। শেলীর পার্ব্বত্য প্রকৃতির চিত্র ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত—ইহা ইটালীর স্মৃতি ও বর্ণরঞ্জিত। আল্পসের অপরিমেয় বিশালতা, ইহার স্তরবিন্যস্ত আকাশভেদী শৃঙ্গশ্রেণী, ইহার পার্শ্বদেশে ঘন দুর্ভেদ্য অরণ্যানীর অজস্র, বিশৃঙ্খল প্রাচুর্য, ইহার উপত্যকায় নানাবিধ ফুলের বিচিত্র বর্ণপ্লাবন, সকলের উপর তুষারস্তূপ-বিচ্ছুরিত, কঠিন শুভ্র দীপ্তির অস্থির ঝলক—এই সমস্তের মধ্য দিয়া পর্বতের দুরধিগম্য রহস্য সত্য সত্যই আমাদের সম্মুখে মূর্ত হইয়াছে। শেলীর Alastor ও Prometheus Unbound প্রভৃতি কাব্যে প্রকৃতি মানব-মনের পরিবর্তনশীল ভাবরাজির দর্পণ স্বরূপ পরিকল্পিত হইয়াছে; মানব-মনের সহিত প্রতি সূক্ষ্ম অণুপরমাণুতে, প্রতি গ্রহ-উপগ্রহে নিগূঢ় আত্মীয়তা-বন্ধন অনুভব করিয়া এক অপূর্ব দ্বৈত গীত রচনা করিয়াছে।

কীট্‌সের নিসর্গ-কবিতায় সাধারণতঃ মানব-মনের প্রতিচ্ছবি লক্ষিত হয় না। তাঁহার বিশেষত্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সূক্ষ্ম ও সুকুমার ইন্দ্রিয়ানুভূতি। তাঁহার দৃষ্টির মধ্যে এমন একটা সহজ, সরল, আদিম মানবের বিস্ময়মুগ্ধ ভাব আছে, যাহাতে অতি-পরিচিত দৃশ্যের মধ্যেও তিনি প্রথম পরিচয়ের সরসতা ও আনন্দ-শিহরণ অনুভব করিতে পারেন; সৌন্দর্যের পাপড়ির সমস্ত স্তরগুলি

ভেদ করিয়া তাঁহার দৃষ্টি ইহার নিগূঢ়তম, রক্তিম মধ্য বিন্দুটির উপর নিবদ্ধ হয়। তথাপি মাঝে মধ্যে মানব-মনের সহিত সহানুভূতিশীল প্রকৃতি-চিত্রও তিনি আঁকিয়াছেন। তাঁহার চন্দ্র কখনও বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য-হিল্লোল ও প্রাণ-স্পন্দনের মূল উৎস (Endymion) ; কখনও বা ম্লান, বিস্মৃতি-কুহেলিকাচ্ছন্ন অন্যমনস্কতায় মানবের ব্যগ্র আবেগের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন (Hyperion)। হেমন্ত-সায়াহ্নের বৃষ্টিধারার মধ্যে সলিসূবেরির নির্জন প্রান্তরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাষাণ-দেবতামূর্তিগুলির ভগ্নাবশেষ তাঁহার মনে সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির নিবিড় নিঃসঙ্গতার বেদনা ঘনাইয়া আনিয়াছে। আবার নিশীথ রাত্রে নক্ষত্রপুঞ্জের ঝিকিমিকি আলোকে অভিষিক্ত, নিবাত-নিষ্কম্প, স্বপ্ন-বিভোর বৃহৎ বনস্পতিগুলি তাঁহার মনে এক অবর্ণনীয় রহস্যবোধের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছে।

ঋতু বর্ণনাতেও প্রত্যেক কবি আপন আপন বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন। ওয়ার্ডসৃওয়ার্থ কোনও ঋতুর বিস্তৃত চিত্র দেন নাই ; কিন্তু প্রত্যেক ঋতুরই মূল সুরের আভাস দিয়াছেন। শীতের জড়তামুক্ত বসন্তের নবীন প্রাণোন্মেষ ও আনন্দ-চাঞ্চল্য তাঁহার একাধিক কবিতায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। গ্রীষ্ম ও শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতও তাঁহার মনে প্রশান্ত আনন্দের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার চিন্তাশীল প্রকৃতি সর্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হইয়াছে হেমন্ত প্রভাতের ম্লান গাম্ভীর্যের প্রতি।

শেলির Ode to the West Wind বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে ঋতু-বর্ণনার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা। ঋতুশেষের এই ঝটিকা-প্রবাহকে শেলি সৃজন ও ধ্বংসরূপী বিশ্বশক্তির সহিত একীভূত করিয়াছেন ; ইহাকে কেবল বহিঃপ্রকৃতির তাণ্ডব হইতে নিখিল বিধানের ছন্দের পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। এই ঝড়, জল, স্থল আকাশে ও কবির মনে অপ্রতিহত প্রভাবে আবর্তিত হইয়াছে—সর্বত্র একই প্রক্রিয়ার পুনরভিনয় করিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-প্রকৃতির সর্বত্র ইহায় রুদ্রলীলা, ইহার অমোঘ কার্যকারিতা অনুভূত হইয়াছে। ঝঞ্ঝার বিপুল গতিবেগ, ইহার মত্ত মঞ্জীর-নিক্কণ কবির মনে ও ছন্দের উদাত্ত ভঙ্গীতে তুল্যভাবে সংক্রামিত হইয়াছে। ঝড়ের প্রকৃতি ও ক্রিয়া বিশদ করিবার জন্য কবির উত্তেজিত কল্পনা নানা আকর হইতে আপাত দৃষ্টিতে অনেক বিসদৃশ, উদ্ভট উপমা ও বস্তু-

চিত্র পুঞ্জীভূত করিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ যাহা কষ্ট-কল্পনার উদাহরণ বলিয়া গণ্য হইত, তাহাও বর্তমান ক্ষেত্রে কল্পনানুভূতির তীব্রতায় সমস্ত অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য হারাইয়া এক অখণ্ড ঐক্যে সংহত হইয়াছে। মহাদেবের জটার মধ্যে উত্তাল ভাগীরথী-ধারার ন্যায় ঝড়ের সমস্ত মত্ত বিক্ষোভ এই শ্রেষ্ঠ কবিতার দৃঢ় বেষ্টনীরেখা ও কল্পনাপরিধির মধ্যে স্থির-সংহতরূপে ধৃত হইয়াছে। বহির্জগৎ হইতে কবির অন্তর-জগতে ইহার সংক্রমণ আশ্চর্য কলাকুশলতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অগস্ত্যমুনির সমুদ্রশোষণের ন্যায় কবি এই বিরাট শক্তিকে গ্রাস করিয়া নিজ অন্তরলোকের অঙ্গীভূত করিয়াছেন। কবির জীর্ণ শীর্ণ চিন্তা, তাঁহার ম্লান অবসাদ ও অক্ষমতার খেদ, পুরাতনের সমস্ত পুঞ্জীভূত ক্লেদ এই ঝড় উড়াইয়া লইয়া গিয়া তাহাদের পরিবর্তে নবীন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছে। তাঁহার সংশয়ক্লিষ্ট, ধূম্রান্ধ মনে ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ঋষির অন্তর্দৃষ্টির শিখা আবার প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই নবদীপ্ত আলোকে তিনি অনাগত কালের অন্ধকারময় অধ্যায়গুলির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া মানুষকে চিরন্তন আশার বাণী শোনাইয়াছেন—শীত বসন্তেরই অগ্রদূত—শীত আসিলে বসন্তের আগমন কি বিলম্বিত হইতে পারে! জগতের শ্রেষ্ঠতম কবিতাগুলির মধ্যে আসন পাইবার উপযুক্ত এই কবিতাটীতে মানবমনের সহিত বহিঃপ্রকৃতির নিবিড়তম একাত্মতা দার্শনিক-মতবাদ-নিরপেক্ষ প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা গৃহীত ও পূর্ণতম কল্পনা-সমৃদ্ধির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কীটসের Ode to Autumn ঋতু-বর্ণনার মধ্য দিয়া মানবের মানস চেতনার সহিত প্রকৃতির গভীর শান্তি ও সরস ফল-পুষ্প-সম্ভারের নিবিড় একাত্মতা স্থাপনের আর এক উদাহরণ। এখানে ঝটিকার তাণ্ডব নৃত্য ও সৃষ্টি-বিপর্য্যয়ের পরিবর্তে আছে—ধরিত্রীর উৎপাদিকাশক্তির হেতু, নিগূঢ় প্রাণ-রসধারার গোপন অলক্ষ্য সঞ্চার। কবিতার মধ্যে এই রস-নির্ঝর যেন স্নিগ্ধ, শান্ত প্রবাহে বহিয়া গিয়াছে। কবির বর্ণনার মধ্যে ফুলের মধুভরা মধুচক্র ও ফলের সুপুষ্ট, পরিপক্ক রসঘনতায় সিক্ত কোমল স্পর্শ যেন আমরা অনুভব করি। শরতের পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে যে একটি নিবিড় আত্মসমাহিত শান্তি, একটি সুগভীর তৃপ্তি ও সন্তোষ আছে, যাহা অতীতের

দিকে তাকাইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে না, যাহা ভবিষ্যতের অনাগত রিক্ততার চিন্তায় বিব্রত হয় না, তাহাই কবিতায় সাধারণ শব্দ ও দৃশ্য বর্ণনার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই বাস্তব সৌন্দর্যের যাদুমন্ত্রে আমাদের সমস্ত অশান্ত চিন্তা, সমস্ত ক্ষুব্ধ অসন্তোষ, অপ্রাপণীয়ের জন্য সমস্ত লোলুপতা যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! প্রকৃতিদেবী ফুলফলের মধ্যে যে অমৃত-নির্ঝর বহাইয়া দিয়াছেন, আমাদের মনও তাহাতে স্নাত ও অভিষিক্ত হইয়া সার্থকতার সহজ প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কবিতাটির দ্বিতীয় stanzaতে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একরূপ নূতন মিলনের ইঙ্গিত আছে। যে চারিটি মানব মূর্তির দ্বারা—শরতের, কৃষি-কার্য-নিরতা ধরিত্রীর অকৃপণ দানে নিজ ভাণ্ডার-পূরণে নিবিষ্ট-চিত্ততার রূপটী রেখাঙ্কিত হইয়াছে, তাহারা অর্ধমানব ও অর্ধপ্রকৃতির সংমিশ্রণে গঠিত। তাহাদের চক্ষে অনাসক্ত, ধ্যানমগ্ন ভাব, মুখের চারিদিকে দিগন্ত-প্রসারিত শ্যামরেখার স্নিগ্ধ আবেষ্টন, বহিঃপ্রকৃতির সহিত তাহাদের আত্মীয়তার সম্পর্কটি পরিস্ফুট করিয়াছে। শরৎ ঋতুতে মানুষ-প্রকৃতিতে অন্তরঙ্গ, মাখামাখি ভাব, মানুষের কর্মশীলতার মধ্যে প্রকৃতির উদার, অচঞ্চল, লোলুপতাহীন শান্ত-ছন্দের অনুপ্রবেশ, ধরিত্রীর ধন আহরণে ধরিত্রীর মতই ধীর, ত্বরাহীন পদক্ষেপ—এই অপূর্ব সম্বন্ধ-রহস্যটি পূর্বের মূর্তিগুলির দ্বারা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। শেলির Ode to the West Windএর মত কীট্‌সের Ode to Autumn পরস্পরের মানস-বৈশিষ্ট্যের পূর্ণতম অভিব্যক্তি।

(৪)

প্রকৃতির মধ্য দিয়া রহস্যলোকের অনুভূতি, ধ্যান-তন্ময়তার আবির্ভাবের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের The Prelude নামক আত্ম-জীবনচরিতমূলক মহাকাব্যে এইরূপ ধ্যানলোক-বিহারের, অতীন্দ্রিয় জগতের গভীর অনুভবের অনেকগুলি দৃশ্য বর্ণিত হইয়াছে। কবি সেখানে দেখাইয়াছেন—প্রকৃতি কেমন করিয়া ক্রীড়াসক্ত বালককে ডাক দিয়াছেন, অতর্কিতভাবে তাহার হৃদয়-দ্বারে আঘাত করিয়া তাহার মনে ভয়, কৌতূহল, বিস্ময়, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিদ্যুৎচমকের ন্যায় রহস্যবোধের উন্মেষ প্রভৃতি বিচিত্র ভাব-তরঙ্গের উদ্রেক করিয়াছেন। এই সমস্ত তরঙ্গিত ভাবলহরী ক্রমশঃ নিগূঢ়, ঘনীভূত

আনন্দে রূপান্তরিত হইয়াছে ও শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির মধ্যে ঐশী শক্তির লীলা সম্বন্ধে এক অসংশয় স্থির বিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছে। সহজ আনন্দের সুর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রৌঢ়াবস্থা পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক খণ্ড-কবিতাতেই ধ্বনিত হইয়াছে। আনন্দের উৎস যখন শুকাইয়া আসিয়াছে তখনও তিনি আশাবাদকে কর্তব্য হিসাবে দৃঢ় মুষ্টিতে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন, যত দিন সম্ভব নিরাশার হাতে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তাঁহার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি প্রায়ই ক্ষণিক ঝলকে, নিমেষের আত্মবিস্মৃতিতে, বাস্তব প্রতিবেশের মুহূর্তব্যাপী অস্বীকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মাঠে এক বালিকা একাকী কাজ করিতে করিতে গান করিতেছে; আর এক বালিকা সূর্যাস্তকালে এক হ্রদের ধারে তাঁহার গন্তব্য স্থল সম্বন্ধে তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছে। এক বৃদ্ধ নির্জন প্রান্তরে পার্বত্য প্রদেশে বর্ষণের ফলে যে ক্ষুদ্র পল্বলের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবিকার্জনের উপায়স্বরূপ জোঁকের অনুসন্ধান করিতে করিতে নিজ জীবন-কাহিনী বিবৃত করিয়াছে। এই সমস্ত অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা তাঁহার মনে সুপ্ত রহস্যবোধ জাগরিত করিয়া তাঁহাকে অতীন্দ্রিয় জগতের ইঙ্গিত দিয়াছে—তাঁহার কল্পনা এই ইঙ্গিতের অনুসরণ করিয়া বাস্তব জগৎ ভুলিয়া কল্পলোকে উধাও হইয়াছে। Tintern Abbey কবিতায় কবি প্রকৃতির ইঙ্গিতে তাঁহার রহস্যবোধের উদ্বোধনের চমৎকার কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়াছেন। সুন্দর দৃশ্য দেখার মধ্যে যে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি আছে, তাহাই স্মৃতির কটাহে পাক খাইয়া দেহ-মন-আত্মা সর্বত্র সঞ্চরণশীল নিগূঢ় আনন্দ-রসে রূপান্তরিত হয়, ও পরিশেষে যে ধ্যানদৃষ্টিতে আমরা সৃষ্টি-রহস্যের মর্মভেদ করিতে পারি তাহাই উন্মীলিত করে। সুতরাং চোখের নেশা হইতে দিব্যদৃষ্টিলাভ সমস্তই একসূত্রে গাঁথা। Yew Trees নামক একটী কবিতায় কবি এক বিশাল বটবৃক্ষতলে আধ-আলো, আধ-ছায়ায় মানসভাবের রূপক কতকগুলি ছায়ামূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভয় ও কম্পিত-দেহ আশা, স্তব্ধতা ও দূরদৃষ্টি, কঙ্কালশেষ মৃত্যু ও ছায়াবয়ব মহাকাল যেন মন্দিরতলে সমবেত উপাসনার জন্য একত্রিত হইয়াছেন বা নীরবে শায়িত হইয়া দূর পর্বতগুহায় প্রতিধ্বনিত নির্ঝর-মর্মর শ্রবণ করিতেছেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অপার্থিব জ্যোতি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শেষে একেবারে সাধারণ দিবালোকে বিলীন হইয়াছে।

কবি তাঁহার একাধিক কবিতায় এই পরিবর্তনের জন্য খেদ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহার পর হইতে তাঁহার কবিতার অপরূপত্ব অনেকটা ম্লান হইয়াছে।

যে অধ্যাত্মবোধ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যে শান্ত নিঃসংশয় উপলব্ধিতে স্থির দীপশিখার ন্যায় প্রোজ্জ্বল, তাহাই শেলির কবিতায় নানা ভাব-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া বিচিত্র বর্ণে বিচ্ছুরিত। এই আলোক-রেখা কোথাও সন্দেহে ম্লান, কোথাও প্রবল ব্যাকুল আবেগে কম্পিত, কোথাও আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্বে দোদুল, কোথাও ভাবার্দ্রতার অশ্রু-বাষ্প-সংস্পর্শে সপ্তবর্ণ-রঞ্জিত, কোথাও বা প্রত্যয়ের অসাধারণ বেগবান্ উচ্ছ্বাসে বৈদ্যুতিক-শক্তিপূর্ণ। Alastorএ কবির নায়ক ব্যাকুল, উন্মনা ভাবে এই চঞ্চল, অপসরণশীল জ্যোতির অনুসরণ করিয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছে। Hymn to Intellectual Beautyতে স্থূল বস্তুপুঞ্জের মধ্যে বিদ্যুৎ-ঝলকের ন্যায় ঈষৎ প্রকাশমানা এই সঞ্চারিণী শিখা কবির নিকট মাঝে মাঝে ধরা দিয়া ইহার রহস্যময় আকর্ষণকে গাঢ়তর করিয়াছে। Prometheus Unboundএ এই অধ্যাত্মবোধ বিশ্বব্যাপী নবসৃষ্টির বীজশক্তি-প্রেমের বিরাট রূপকে অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই গীতি কাব্যের Hymn to Asia নামক গানে আধ্যাত্মিক, দেহাতীত, অথচ দেহাশ্রয়ী প্রেমের নিগূঢ় অপরূপতা সাঙ্কেতিক ভাস্বরতায় ফুটিয়াছে। Epipsychidionএ যে ব্যাকুল, অতৃপ্ত প্রেমের আবেগ নিজ জ্বলন্ত প্রাণ-শক্তিতে খধূপের ন্যায় আদর্শলোকের উচ্চাকাশে উঠিয়া হাহাকারে ফাটিয়া পড়িয়াছে, তাহা বিভিন্ন নারীকে আশ্রয় করিয়া সার্থকতা লাভের বৃথা চেষ্টায় এই ধরা ছোঁয়ার অতীত, বিভ্রান্তকারী অধ্যাত্মবোধের সহিত সমধর্মী। Adonaisএ মৃত্যুর বিরাট রহস্যের সম্মুখীন হইয়া কবি এই নিখিলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিচরণশীল ঐশী শক্তির নিকট সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন ও দার্শনিকোচিত সূক্ষ্ম বিচারের সহিত ইহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। শেলির সমস্ত কাব্যজগৎ ওতপ্রোতভাবে এই অধ্যাত্মবোধের বিদ্যুৎ-দীপ্তিতে ভাস্বর। তাঁহার অসমাপ্ত শেষ কাব্য The Trimph of Lifeএ যে অর্ধোচ্চারিত প্রশ্ন (জীবন কি?) তাঁহার কাব্য-জীবনের অন্তিম বাণী তাহাই তাঁহার অধ্যাত্ম ব্যাকুলতার অমর নিদর্শন!—এই বিরাট জিজ্ঞাসা-চিহ্ন তাঁহার কাব্যজগতের সৌধচূড়ায় জ্বলন্ত অক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে।

(৫)

এই যুগের নিসর্গ কবিতার অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে আর একটি আত্ম-প্রকাশ লক্ষ্য করিতে আছে। ইহার নেতৃস্থানীয় কবিরা প্রকৃতির প্রতি আদিম যুগের বিস্ময়জড়িত দৃষ্টিভঙ্গীর পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। শিশু মানবের যে ক্রীড়াশীল কল্পনা প্রকৃতির সৌন্দর্যে নানা দেবদেবী ও রূপক মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, জীবনের মানস জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে ও জগতের নিয়ম-রহস্য ক্রমশঃ উদ্‌ঘাটিত হওয়ার ফলে সেই দৃষ্টিভঙ্গী বিলুপ্ত হইয়াছে। আজ প্রকৃতি আমাদের নিকট অমোঘ-নিয়ম চালিত, যন্ত্রবদ্ধ জড়স্তূপ মাত্র, তাহার মধ্যে কোন স্বাধীন ইচ্ছাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বা লীলাচঞ্চল, আনন্দোদ্বেল মানবমূর্তির প্রতিচ্ছায়া আমরা অনুভব করি না। আধুনিক বিজ্ঞান জড় প্রকৃতির মধ্যে যে প্রাণস্পন্দন আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাও একটা রূপ-নিরপেক্ষ (abstract) শক্তির মতই আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে স্পর্শ করে, আমাদের কল্পনা ও সৌন্দর্য-বোধকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রকৃতির সঙ্গে কবির যে নব পরিচয় হইল, তাহাতে এই দীর্ঘকাল-লুপ্ত কল্পনা-বৈশিষ্ট্য পুনর্জীবন লাভ করিল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রকৃতিকে মানবের সুখদুঃখে সহানুভূতি-শীল, তাহার চিন্তার উদ্দীপক ও অবসরের সুহৃদ্‌রূপে কল্পনা করিয়া এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূত্রপাত করিলেন। কিন্তু তাঁহার অধ্যাত্মচেতনা ও নীতিজ্ঞান এত প্রবল ছিল যে, তাঁহার কবিতায় দায়িত্বহীন, লঘু সৌন্দর্যবোধ প্রবল হইতে পারে নাই। তাই তাঁহার ফুলগুলি জীবন্ত হইলেও আদিম যুগের বর্ণোজ্জ্বল বিস্ময় নয়, কোন নৃত্যশীলা পরী নয়, (যদিও পরীর উপমা তিনি তাঁহার কোন কোন কবিতায় দিয়াছেন), কিন্তু আধুনিক যুগের উপযোগী চিন্তা ও নীতির বাহন। তিনি প্রকৃতিতে যে জীবন আরোপ করিয়াছেন তাহা উচ্চতর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হইয়াছে। তাঁহার শৈশবকালে প্রকৃতি তাঁহাকে যে খেলার জন্য ডাক দিয়াছে, তাহা ঠিক ছেলেখেলা নয়; ক্রীড়ার সহজ আনন্দ শীঘ্রই তাঁহার নিকট নিগূঢ়তর উপলব্ধিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। অতি বিরল ক্ষেত্রে, নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সুদূর অতীতের এই বিস্ময়-বিমুগ্ধ সৌন্দর্যানুভবশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার এক বিখ্যাত সনেটে ইংলণ্ডের হীন বণিক্‌-বৃত্তির

বিরুদ্ধে উচ্ছ্বসিত প্রতিবাদ-স্বরূপ তিনি প্রাচীন গ্রীসের মূর্তি-পরিকল্পনার প্রশংসা করিয়াছেন। সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া যে গ্রীক কবি জলরাশির মধ্যে বরুণ দেবতার শঙ্খধ্বনি শুনিয়াছেন বা সদা-চঞ্চল উর্মিভঙ্গের মধ্যে অপর কোন জলচর দেবের মুহুর্মুহুঃ পরিবর্তনশীল রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, উনবিংশ শতাব্দীর কবি তাহার সহিত মুহূর্তের জন্য নিকট আত্মীয়তা অনুভব করিয়াছেন।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের আবিষ্কার শেলি ও কীট্‌স গ্রহণ করিয়া তাহাকে নূতন ভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের কল্পনা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ন্যায় অটুট গাম্ভীর্যের বর্মপরিহিত ছিল না। তাঁহারা অনেক সময় সুদূর অতীতের নিশ্চিন্ত, ক্রীড়াশীল কল্পনা-লীলা আধুনিক মানুষের জটিল, সমস্যা-পীড়িত জীবনে আনিতে সক্ষম হইয়াছেন। শেলির চক্ষে নব-পরিচয়ের বিস্ময়-ঘোর লাগিয়াই ছিল। তিনি পৃথিবীর বহু শতাব্দীব্যাপী ঐতিহাসিক বিবর্তনকে মিথ্যা মায়াবাদ বলিয়া এক মুহূর্তেই অস্বীকার করিতে পারিতেন। আধুনিক যুগের সমস্ত জটিল ব্যবস্থার স্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়া প্রাথমিক, অবিকৃত আদর্শ সর্বদাই তাঁহার মানস-চক্ষের নিকট প্রত্যক্ষ ছিল। বিশেষতঃ ফরাসী বিপ্লবের ভূমিকম্পে সমাজের মূলদেশ পর্যন্ত যে আলোড়ন অনুভূত হইতেছিল, তাহা তাঁহার কল্পনাকে প্রভাবিত করিয়া তাঁহাকে নবযুগের অরুণোদয়ের স্বপ্নে বিভোর করিয়াছিল। প্রভাত-পাখীর বৈতালিক সঙ্গীতের ন্যায় তিনি শত শত উচ্ছ্বসিত গীতি-কবিতায় পৃথিবীতে এই স্বর্গরাজ্যের আবির্ভাবের অভি-নন্দন-পত্র রচনা করিয়াছেন। তিনি সত্য সত্যই নিজেকে এই নবসৃষ্ট জগতের আদিম মানুষরূপে অনুভব করিয়াছেন। স্বর্গোদ্যানের প্রথম দম্পতির নিষ্পাপ, উলঙ্গ স্বাধীনতাবোধ তাঁহার কাব্যের সহস্র নির্গম-পথে উদ্দামবেগে প্রবাহিত হইয়াছে।

এই স্বচ্ছ, সরল অনুভূতির বলে শেলী অতি সহজেই গ্রীক কবির ন্যায় প্রকৃতি-সৌন্দর্যের মধ্যে মনুষ্যমূর্তির আভাস প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। ইহার সহিত দার্শনিক অধ্যাত্মদৃষ্টি সংযুক্ত হইয়া তাঁহার পরিকল্পনাকে অসামান্য সৌকুমার্যে ও অনুভবতীক্ষ্ণতায় মণ্ডিত করিয়াছে। 'তিনি যেমন স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্ম,' জড়ের মধ্যে প্রাণস্পন্দন অনুভব করিয়াছেন, সেইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে শুধু মানুষের রূপ নহে, সুখদুঃখঅনুভবশীল, হর্ষ-বিষাদে দোলায়মান,

বিচিত্র ক্রীড়াশীলতায় রঙ্গকৌতুকময়, অন্তর-চেতনা লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রকৃতির মধ্যে এই প্রাণের আরোপে আদিম কল্পনা, বৈজ্ঞানিকের সত্যসন্ধানী দৃষ্টি ও দার্শনিকের রহস্যোদ্ভেদী দিব্যানুভূতি তুল্যভাবে ক্রিয়াশীল। এই বিভিন্ন স্তরের দৃষ্টিভঙ্গীর সমাবেশ তাঁহার সৃষ্ট মূর্তিগুলিকে জীবনের নিগূঢ় বৈদ্যুতীশক্তিতে পূর্ণ করিয়াছে। সেইজন্য তাঁহার কবিতায় এই অতি পুরাতন, যন্ত্রবদ্ধ বিশ্বজগৎ ও মানবজীবনের জীর্ণ, জরা-সঙ্কুচিত ধমনী দিয়া নব রূপ ও সৌন্দর্য্যের, মাথায় মাণিক-জ্বলা ঢেউ বহিয়া গিয়াছে। এই সৌন্দর্য্য-প্লাবনের প্রত্যেকটী তরঙ্গকে তিনি জীবন্ত, অধ্যাত্মরাজ্যের সূক্ষ্মদেহ অধিবাসি-রূপে কল্পনা করিয়াছেন। আশা, বেদনা, ভালবাসা, বিষাদ, আনন্দ, অধ্যাত্ম-দৃষ্টি প্রভৃতি মানব-হৃদয়ের অশরীরী ভাবরাজি; পুষ্পের সুবাস, তৃণের উপরিস্থ রৌদ্রোজ্জ্বল শিশির-বিন্দু, দূর-শ্রুত পার্ব্বত্য-নির্ঝরের মৃদু কুলুধ্বনি প্রভৃতি বহিঃপ্রকৃতির সূক্ষ্ম, সুকুমার সৌন্দর্য্যনিচয়; সৌর-জগতের বিশাল, অপরিমেয় গতিচ্ছন্দ, গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রাদির পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল কক্ষাবর্ত্তন,—এই সমস্তই তাঁহার নিকট প্রাণময়রূপে উদ্ভাসিত হইয়া এক বিরাট আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়াছে; এমন কি শুষ্ক বৈজ্ঞানিক সত্যও তাঁহার কল্পনার নবীনতায় হর্ষোদ্বেল শৈশব-ক্রীড়ায় রূপান্তরিত হইয়াছে। তাঁহার The Clouds কবিতায় মেঘের গঠন-বিলয়-সম্বন্ধে প্রত্যেকটী বৈজ্ঞানিক তথ্য এইরূপে বালকের মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তনশীল খেয়াল, নূতন নূতন ক্রীড়া-কৌতুকপ্রিয়তার রূপ ধারণ করিয়াছে। শিশিরবিন্দুর জলীয় ও বাষ্পরূপ গ্রহণ বালখিল্য পরীদের লুকোচুরি খেলাতে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু এই রূপ-কল্পনা প্রবণতা কীট্‌সের কবিতাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কীট্‌সের সৌন্দর্য্যানুরাগ আদিম মানবের বিস্ময়-মণ্ডিত। তিনিই বর্ত্তমান কালে প্রকৃতির রূপ হইতে দেব-দেবী-সৃষ্টির পরিকল্পনার মধ্যে নূতন জীবন সঞ্চার করিয়াছেন। তাঁহার Endymion কাব্যে এই নবসৃজনের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গ্রীস দেশের দেবমূর্তিগুলি আবার সজীব হইয়া তাঁহার কাব্যে পদচারণা করিয়াছে। যে মানস প্রতিবেশ ও প্রবণতা হইতে প্রাকৃতিক শক্তিকে মানবধর্ম্মবিশিষ্ট করিয়া দেখা সম্ভব, কীট্‌সের স্বভাব-তরুণ মনে তাহা অক্ষুণ্ণভাবেই বিদ্যমান ছিল। তাই তিনি

মরাগাছে ফুল ফুটাইয়াছেন, মরা গাঙ্গে বান বহাইয়াছেন। অবশ্য স্থানে স্থানে তাঁহার এই মূর্ত্তি-পরিকল্পনার মধ্যে সচেষ্টতার ভাব লক্ষিত হয়; কোথাও কোথাও পাপড়ি-সন্নিবেশের আতিশয্যে কেন্দ্রস্থ কোরক ও তাহার অন্তর্নিহিত সৌরভটী কতকটা চাপা পড়িয়াছে। এই সমস্ত দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও কীট্‌স এ বিষয়ে অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার Endymionএ তিনি Pan ও Bacchus নামক দুই প্রসিদ্ধ গ্রীক দেবতার স্তোত্র রচনা করিয়াছেন; তাহাতে বুঝা যায় যে, কিরূপ সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত এই দেবমূর্ত্তি-সৃজনের মৌলিক প্রেরণাটুকু তিনি ধরিয়াছেন। পূজা-প্রণালীর উপচার-বহুল বর্ণনার সহিত পূজকের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়ও তাঁহার কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ মদ্যধারাসিক্ত, দ্রাক্ষালতার পত্রফলভূষিত মকর-বাহন সুরাদেবের (Bacchus) শোভাযাত্রা-সমারোহের পিছনে প্রাচীন গ্রীসের যে দুর্ব্বার দিগ্বিজয়স্পৃহার উন্মত্ত কল্পনা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা কীট্‌সের কবিতায় চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। Hyperionএ তিনি গ্রীক দেবদেবীদের পরাজয়-ম্লান গাম্ভীর্য্য-গৌরব ও বিজেতা তরুণ সূর্য্যদেবের (Apollo) নবলব্ধ অভিজ্ঞতায় মহিমান্বিত, অজ্ঞাতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবোধের উন্মেষ-বেদনায় স্নিগ্ধ ও করুণ, দীপ্তোজ্জ্বল শ্রীর যে চিত্র দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আর এই সমস্ত অমরবৃন্দের মুখে তিনি যে ভাষা দিয়াছেন তাহা দেবতারই উপযুক্ত। তাঁহার Ode to Psycheতে তিনি পুষ্পসৌরভপূর্ণ, শ্যামল বনস্থলীর মধ্যে কামপ্রিয়া রতিদেবীর আবেশ-শিথিল, বিলাস-বিভ্রমে এলায়িত, মোহময় সৌন্দর্য্যের ছবি আঁকিয়াছেন। তাঁহার Ode to Autumnএ তিনি যে কয়েকটী মানবমূর্তি আঁকিয়াছেন তাহারা ঠিক যেন গ্রীক শিল্পীর ক্ষোদিত; এবং Ode on a Grecian Urnএ তিনি গ্রীক ভাস্কর্য্যশিল্পের ব্যঞ্জনাপূর্ণ সৌন্দর্য্যের বিচিত্র স্বাদ নিজে গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে অনুভব করাইয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রতিবেশে লালিত ও বর্দ্ধিত তরুণ ইংরেজ কবির পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

(৬)

প্রাচীন গ্রীক সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার পুনরুজ্জীবন অতীতে প্রত্যাবর্ত্তনের একটা দিক। কিন্তু অতীতের যে যুগ এই কবি-গোষ্ঠীর কল্পনাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা মধ্যযুগ। মধ্যযুগের সঙ্গে রোমান্টিক যুগের একটা নাড়ীর সম্পর্ক ছিল। উভয়েই যুক্তিবাদ অস্বীকার করিয়া কবি-কল্পনা ও অধ্যাত্ম মনোভাবকে প্রাধান্য দিয়াছে। মধ্যযুগের জীবন-যাত্রার ছন্দ দ্রুততর ছিল ; যুদ্ধ-বিগ্রহ, অবাস্তব আদর্শবাদের অনুপ্রেরণা সর্ব্বদাই তাহার হৃৎ-স্পন্দনে গতিবেগ সঞ্চার করিত। আধ্যাত্মিক সাধনা ও ধর্ম্মবিশ্বাস তাহার চিত্তবৃত্তিকে বহির্জগৎ হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্তর্মুখীন করিয়াছিল। মধ্যযুগের এই সমস্ত বিশেষত্বই রোমান্টিক যুগের কবিদের পক্ষে তীব্র আকর্ষণের হেতু ছিল। স্কট (Scott) তাঁহার কাব্যে ও উপন্যাসে ইহার জীবন-ধারার ব্যাপক চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহার সামন্ত-তন্ত্র যে কেবল বাহিরের শাসন-ব্যবস্থা মাত্র ছিল না, ইহা যে জাতির অস্থিমজ্জা পর্য্যন্ত সংক্রামিত হইয়াছিল তাহা তিনি দেখাইয়াছেন। ইউরোপের সমস্ত দেশে, বিশেষতঃ স্কটল্যাণ্ডে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে দলপতির প্রতি আনুগত্য ধর্ম্মের অলঙ্ঘনীয় অনুশাসনের মতই বিবেচিত হইত। যখন পর্ব্বতশিখরে প্রজ্বলিত সঙ্কেত-শিখা যুদ্ধঘোষণার অগ্নিময় পতাকার ন্যায় দিকে দিকে আন্দোলিত হইত, তখন গোষ্ঠীভুক্ত প্রত্যেক লোক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেই রুদ্র আহ্বানে নিমেষের মধ্যে সাড়া দিত। এক মুহূর্ত্তে শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা এক বিরাট যুদ্ধোদ্যমে পরিণত হইত। এই বীরত্বপূর্ণ প্রতিবেশে মানুষের জীবন-বীণা সর্ব্বদা উঁচুসুরে বাঁধা থাকিত। একদিকে প্রেমে অবিচলিত একনিষ্ঠতা ও দুঃসাহসিক কৃচ্ছ সাধন, আদর্শের অনুসরণে অনমনীয় দৃঢ়তা ; অপরদিকে ক্ষমাহীন, পুরুষানুক্রমিক প্রতিহিংসা ও নির্ব্বিচার আজ্ঞানুবর্ত্তিতা যুগ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল। সুতরাং যে কবিরা সমসাময়িক বাস্তবতা পরিহার করিতে সর্ব্বদাই ব্যগ্র ছিলেন, তাঁহারা মধ্যযুগের জীবনে যে তাঁহাদের আদর্শবাদপুষ্ট কল্পনার যোগ্য বিহারভূমির সন্ধান পাইতেন তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

আবার এই যুগের অতিপ্রাকৃতে সহজ-সংস্কারগত বিশ্বাস কোলরিজ ও কীট্‌স তাঁহাদের কাব্যে মনস্তত্ত্বাভিজ্ঞতার অভ্রান্ত নৈপুণ্যে, তীক্ষ্ণ, তীব্র

অনুভূতির সহিত, ভয়াবহ আভাস-ইঙ্গিতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কোলরিজের The Ancient Mariner, Christabel ও Kubla Khan অতিপ্রাকৃতবিষয়ক কবিতার শীর্ষস্থানীয়। কবি ভৌতিক অনুভূতি বর্ণনায় এক সম্পূর্ণ অভিনব প্রণালী প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞান অলৌকিক রহস্যে আস্থাস্থাপন করিতে পারে না, কারণ ইহার দাবী হইতেছে সর্ব্বজনগ্রাহ্য প্রমাণ। মধ্যযুগে এই বিশ্বাস এত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল যে, ইহা অসমর্থিত অভিজ্ঞতাকেই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিত; দ্বিধাহীন ও সর্ব্বব্যাপী বিশ্বাস অনিচ্ছাকৃত আত্মপ্রতারণার সাহায্যে ভৌতিক আবির্ভাবকে আবাহন করিয়া আনিত। কোলরিজ এই উভয়ের মাঝামাঝি এক পন্থা আবিষ্কার করিলেন। অপ্রাকৃতের সত্যতা নির্ভর করে ভুতগ্রস্ত ব্যক্তির অনুভূতির উপর, কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর নহে। সুতরাং এই অনুভূতি যদি তীব্র হয়, তাহার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে যদি অখণ্ড ঐক্য ও সামঞ্জস্য থাকে, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া তাহা যদি ত্রুটিহীন ও নিশ্ছিদ্র হয়, তবে তাহা পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারে। প্রেতলোকের উপস্থিতিতে—তাহা সত্যই হউক বা কাল্পনিকই হউক—যে অন্তর্বিপ্লব ঘটে, বক্ষোরক্তে যে তাণ্ডবনৃত্য আরম্ভ হয়, যে দৃষ্টিবিভ্রম কল্পনাতে সত্যরূপ আরোপ করে, পরিচিত দৃশ্যের উপর যে অস্থির মায়ালোক কাঁপিতে থাকে কবি তাহাই নিখুঁত ভাবে ফুটাইয়া তোলেন—অতিপ্রাকৃতের তুহিন-শীতল স্পর্শ অতি নিগূঢ় উপায়ে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করেন। এই যাদুমন্ত্রে পাঠকের মনের অবিশ্বাস ও সন্দেহ ক্ষণিকের জন্য ঘুমাইয়া পড়ে। সহানুভূতির তীব্রতা ঘটনার বস্তুগত অসম্ভাব্যতার কথা ভুলাইয়া দেয়। অতিপ্রাকৃতের অনুভূতি ক্ষণস্থায়ী দুঃস্বপ্নের মত সমস্ত চিত্তকে এমন সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে যে, সেই সময়ের জন্য ইহাই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে হয় ও স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারাইয়া ইহারই অধীনতা স্বীকার করে।

প্রতিবেশ-রচনায় অসামান্য নৈপুণ্য এই ভৌতিক বিশ্বাস উৎপাদনের একটা প্রধান উপায়। পটভূমিকা-নির্ব্বাচন প্রেত-আবাহনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। আকাশ-বাতাসটী এমন ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যাহাতে অশরীরীর

স্বল্প আভাস-ইঙ্গিত বায়ুস্তরের প্রত্যেক রন্ধ্রে ছড়াইয়া পড়ে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর মধ্যে সুদূর অপরিচয়ের রহস্য, আসন্ন আবির্ভাবের স্তব্ধ প্রতীক্ষা এমন ভাবে ফুটাইতে হইবে যাহাতে অতিপ্রাকৃত সেখানে নিজ আসনটি প্রস্তুত দেখিতে পায়। প্রকৃতির মুখে এমন একটা উত্তেজিত বিস্ময় আরোপ করিতে হইবে, তাহার বর্ণের লীলা ও প্রাণের বিকাশের মধ্যে এমন একটা উদ্দাম অজস্রতার হিল্লোল বহাইতে হইবে, যাহাতে মনে হইবে, সে তাহার স্বাভাবিক ঔদাসীন্য ও নিশ্চলতা ছাড়াইয়া অতিপ্রাকৃতের প্রতি ব্যগ্র আলিঙ্গনে নিজ হস্ত প্রসারিত করিয়াছে। কোলরিজের The Ancient Mariner ও Christabelএর দৃশ্য নির্ব্বাচনে এই নীতি অত্যন্ত দক্ষতার সহিত অনুসৃত হইয়াছে। প্রথম কবিতায় বৃদ্ধ নাবিকের তরণী সুদূর মেরুপ্রদেশে ও বায়ুলেশহীন গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সন্নিহিত মহাসমুদ্রে এক অপরূপ ভৌতিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হইয়াছে। সেই মনুষ্যের সংশ্রবশূন্য নির্জ্জন প্রদেশে প্রকৃতির রূপ আমাদের পরিচিত জগতের রূপ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিরাট তুষারস্তূপের ফাটলের মধ্যে যে শব্দ শুনা যায় তাহা যেন দৈত্যের ক্ষুব্ধ গর্জ্জন; সূর্য্যোদয় যেন স্বয়ং ভগবানের জ্যোতির্মণ্ডিত শিরোদেশ। ঝটিকা যেন হিংস্র পক্ষীর অশান্ত পক্ষবিক্ষেপ; আবার ঝড় জল ও বিদ্যুৎবিকাশের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্রপুঞ্জের মুহুর্মুহুঃ প্রকাশ-বিলয় যেন এক অদ্ভুত প্রেতনৃত্য; অন্ধকার রাত্রে সমুদ্রজলে নানাবর্ণের আলোকরশ্মির কম্পন যেন কোন পৈশাচিক কটাহের ফুটন্ত তৈল; সূর্য্যাস্তের পর প্রদোষান্ধকার ও তারকারাজির দ্রুতপদবিক্ষেপে আগমন—এই সমস্তই প্রকৃতির উত্তেজিত ও বেগবান প্রাণশক্তির পরিচয়। বাহিরের মত অন্তরেও সেই একই তীব্র ও বর্দ্ধিত গতিবেগের প্রবাহ। আশা-নৈরাশ্য, আনন্দ-বিষাদ, অনুশোচনা-আত্মপ্রসাদ, নরকভীতি ও ঐশী করুণার অনুভূতি—সমস্তই বক্ষপঞ্জরে প্রবল বেগে আন্দোলিত হইয়াছে। ভয় নাবিকের বক্ষোরক্ত যেন চুমুক দিয়া পান করিতেছে। অন্যান্য নাবিকদের মৃতদেহ যেন প্রস্তর-কঠিন দৃষ্টি দিয়া অপরাধী নাবিককে মৌন ভর্ৎসনা জানাইতেছে। নাবিকের পুনর্জ্জীবিত ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার সঙ্গে নীরবে একই রজ্জু আকর্ষণ করিয়াছে—তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর দুস্তর ব্যবধান কোন

ভাববিনিময়ের দ্বারা সেতুবদ্ধ হয় নাই। অনন্ত-প্রসারিত লবণসমুদ্রের দ্বারা অপ্রশমিত তৃষ্ণার যন্ত্রণা, নিদ্রার স্নিগ্ধ সান্ত্বনা, নিঃসঙ্গতা-ক্লিষ্ট মনের মধ্যে মানব ও জলজন্তুর সৌন্দর্য্যের অভিনব উপলব্ধি, প্রেতানুভূতির শিহরণ, মোহজাল ছিন্ন হইবার পর পরিচিত দৃশ্যের অপরূপ আকর্ষণ এই সমস্ত ভাবই অভূতপূর্ব্ব তীব্রতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই প্রাণশক্তিতে হিল্লোলিত আবেষ্টনে অতিপ্রাকৃত রহস্য উহার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া মানুষের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়াছে। এইখানেই ন্যায়-বিচার ও করুণার দেবদূতেরা মানুষের ভাগ্য লইয়া পরস্পরের সহিত বাক্-বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; এইখানেই মৃত্যু ও মৃত্যুগ্রস্ত জীবন (Death and Life-in-death) দ্যুতক্রীড়ায় মানুষের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট নির্ণয় করিয়াছে। এইখানেই প্রেত-লোকের সমস্ত অমীমাংসিত রহস্য, অদৃষ্টের সমস্ত ঝঞ্ঝাবাত, ইন্দ্রহস্তনিক্ষিপ্ত বজ্রের সমস্ত আঘাত-বেদনা মানুষের গভীরতম অনুভূতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অতি সহজ, সরল নীতি-বোধে অঙ্কুরিত হইয়াছে। নিয়তির বজ্রনির্ঘোষ মানবাত্মার অন্তঃদেশে দেবমন্দিরের শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনির, সুপরিচিত, অথচ নব-প্রেরণার ফলে নূতন ভাবে অনুভূত, ভক্তি-মাধুর্য্যের মধ্যে বিলীন হইয়াছে।

Christabelএ প্রতিবেশ-রচনা অনায়াসেই সম্ভব হইয়াছে। মধ্যযুগের দুর্গ, তাহার পার্শ্বে ঘন অরণ্য; সেই নির্জ্জন বনপ্রদেশে নিশীথ রাত্রে প্রবাস-গত প্রণয়ীর কল্যাণে প্রার্থনাপরায়ণা, ভক্তি-বিশ্বাসে উদ্বেলিতহৃদয়া এক তরুণীর চক্ষুর সম্মুখে অকস্মাৎ অলৌকিক জগতের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। দুর্গের আকাশ-বাতাসে মধ্যযুগসুলভ অপ্রাকৃত আবির্ভাবের ছায়া খুব সূক্ষ্মভাবে বিচরণ করিতেছে। তরুণী Christabelএর স্বর্গগতা জননীর অদৃশ্য আত্মা তাহাকে ঘিরিয়া আছে; সেই অশরীরী উপস্থিতি দুর্গের পশু-পাখী নিজ সহজাত সংস্কার বলে অনুভব করে। এই অতিপ্রাকৃতের অনুভূতি কবি আশ্চর্য্য সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায়, প্রায় অলক্ষিত আভাস-ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। মোরগের নিদ্রালস ডাকে, কুকুরের চাপা তর্জ্জনে, প্রকৃতি-বর্ণনায় রহস্যময় জিজ্ঞাসাভঙ্গীতে, মন্ত্রোচ্চারণের মত একপ্রকার গূঢ়ার্থ, তির্য্যক্ ভাষাপ্রয়োগে কবি বায়ুমণ্ডলকে প্রেতলোকের অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনিতে পূর্ণ করিয়াছেন, সন্ত্রস্ত পদক্ষেপের ক্ষীণ

প্রতিধ্বনিতে পাঠকের বক্ষোরক্তে এক অজ্ঞাত শঙ্কার শিহরণ জাগাইয়াছেন। এইরূপে পাঠকের মন প্রস্তুত হইলে কবি অসঙ্কোচে তাহার সম্মুখে এক সুন্দরী যুবতীর ছদ্মবেশে ডাকিনী Geraldineকে উপস্থিত করাইয়াছেন। তাহাকে লইয়া দুর্গপ্রত্যাবর্ত্তনের সময় ও তৎপরে চারিদিকে অজ্ঞাত বিপদের পূর্ব্বসূচনা ব্যঞ্জিত হইয়াছে। দুর্গপ্রবেশের পূর্ব্বে তাহার আকস্মিক মূর্চ্ছা ও ক্রিষ্টাবেলের সাহায্যে দুর্গদ্বার অতিক্রম; নির্ব্বাপিতপ্রায় অগ্নির হঠাৎ ঝলকে তাহার ক্রূর সর্পের ন্যায় কুটিল দৃষ্টির উপর আলোকপাত; অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত তাহার শক্তিপরীক্ষা; প্রার্থনায় যোগদানে অনিচ্ছা; তাহার উদ্‌ভ্রান্ত, রহস্যময় ব্যবহার; সর্ব্বোপরি ক্রিষ্টাবেলের সহিত এক শয্যায় শয়নকালে তাহার বক্ষোদেশে এক ভয়াবহ ক্ষতচিহ্নের ইঙ্গিত—নিপুণ হস্তে গ্রথিত এই সংশয়জাল অভ্যাগতার প্রকৃতি-রহস্যটী নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে। পরবর্ত্তী দ্বিতীয় খণ্ডে কবির এই অদ্ভুত কুহকশক্তি, প্রেতলোকের মায়াবিস্তারের নৈপুণ্য অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। দিবালোকে রাত্রির সূক্ষ্ম মায়া ক্ষীণ হইয়াছে। দুর্গের কোলাহলময় সাধারণ জীবন-যাত্রার মধ্যে ভৌতিক অনুভূতির তীক্ষ্ণতা মন্দীভূত হইয়া ইহা স্বপ্ন ও রূপকের মৃদুতর পর্য্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। অনেক সমালোচক ইহাকে কোলরিজের গুরুতর ত্রুটি মনে করিয়াছেন—কিন্তু এই পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। যেমন প্রবল শোক কালক্রমে অশ্রুরেখার সজল আভাসের মত মনের প্রান্তে লগ্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ নিশীথ রাত্রের তীক্ষ্ণ অপ্রাকৃত অনুভবও পরদিন প্রভাতে দুঃস্বপ্নের স্মৃতির মত অনেকটা সহনীয় হইয়া আসে। মানবজগতে যাহা ঘটে কবি তাঁহার বর্ণনা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন দ্বারা তাহাই সূচিত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই চমৎকার কবিতাটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে।

Kubla Khan কোলরিজের আর একটী অদ্ভুত সৃষ্টি। ইহা ঠিক অতি-প্রাকৃত বিষয়ের উপর রচিত নহে, যদিও ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে অতিপ্রাকৃতের ইঙ্গিত ও প্রতিধ্বনি মিলে। স্বপ্নলোকের মায়াময় ও নিগূঢ় সৌন্দর্য্য এই কবিতায় আশ্চর্য্য অভিব্যক্তিলাভ করিয়াছে। ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে কোন বুদ্ধির সক্রিয়তা বা চিন্তার ধারাবাহিকতার নিদর্শন নাই।

এই কবিতায় মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণ অবসর দিয়া কবি কেবল তাঁহার স্বপ্নলোক হইতে স্বতঃ-উদ্ভূত, কুণ্ডলীকৃত ধূম্ররাশির ন্যায় অবাধ সঞ্চরণশীল, অসংবদ্ধ চিত্রসৌন্দর্য্যসমষ্টিকে বাণীময় রূপ দিয়াছেন। বিভিন্ন দৃশ্য-সমূহের মধ্যে কোন চিন্তা-গত ঐক্য নাই ; তথাপি মনে হয় যে, ইহাদের অন্তর্নিহিত ধ্বনি-প্রবাহ এক গূঢ় ভাব-ঐক্যের হেতু হইয়াছে। কবি এই কবিতাটীর উৎপত্তি সম্বন্ধে পাঠককে জানাইয়াছেন যে, ইহার ভাব, ভাষা, ছন্দোরূপ ও দৃশ্যাবলীর পারম্পর্য্য সমস্তই স্বপ্নানুভূতির স্বচ্ছন্দ-বিকাশ ; নিদ্রাভঙ্গের পর এই অনবদ্য স্বপ্নসুষমাটী লিপিবদ্ধ করাই তাঁহার একমাত্র সক্রিয় দায়িত্ব। কবি আরও বলেন যে, এই স্বপ্ন-বিকশিত সৌন্দর্য্য-শতদলের সব কয়টী পাপড়িই তাঁহার জাগ্রত স্মৃতির সম্মুখে বিস্তৃত ছিল—কিন্তু লিখিবার সময় এক ব্যবসায়ীর তাগিদে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া এই রূপ-স্বপ্ন অকস্মাৎ মিলাইয়া গেল ; তার পর তিনি আর শত চেষ্টাতেও ইহার বিস্মৃত খণ্ডাংশগুলির পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না। কাজেই কবিতাটী অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। স্বপ্ন-সাগরের তল হইতে উত্থিত এই সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী কাব্যজগতে অর্দ্ধাভিব্যক্তি লাভ করিয়া স্বপ্ন ও জাগ্রত সত্যের অনিশ্চিত সীমারেখায় চিরন্তন প্রহেলিকার মতই দণ্ডায়মান।

কীট্‌সের অতিপ্রাকৃত কবিতার মধ্যে একটী ছাড়া আর কোথাও এই ভয়াবহ অনুভূতি নাই। সাধারণতঃ কীট্‌স যে সমস্ত পরী, যক্ষ প্রভৃতি অতিমানব জীব আঁকিয়াছেন, তাহারা মানবেরই প্রতিবেশী ও মানবিক গুণসম্পন্ন। Lamiaতে যে তরুণীর ছদ্মবেশধারিণী সর্পিণী বর্ণিত হইয়াছে, সে মানুষের মতই প্রেম যাচ্ঞা করে ; তাহার ইন্দ্রজালবিদ্যা কেবল তাহার তীব্র প্রেমাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন ভীতি-শিহরণ নাই। বরং যখন পরুষস্বভাব দার্শনিকের রূঢ় স্পর্শে তাহার মায়াজাল ছিন্ন হইয়াছে, তাহার ইন্দ্রজালরচিত সৌধ বায়ুস্তরে বিলীন হইয়াছে, মোহভঙ্গের নিদারুণ আঘাতে প্রেমিকযুগলের জীবনান্ত ঘটিয়াছে, তখন কবির সহানুভূতি এই অবাস্তব, ক্ষণস্থায়ী প্রেম-মাধুর্য্যের উপরই বর্ষিত হইয়াছে ; তিনি বিজ্ঞানের সৌন্দর্য্য-বিধ্বংসী প্রভাবের বিরুদ্ধে বেদনা-বিদ্ধ আক্ষেপ-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। Isabellaতে গোপন

ছুরিকাঘাতে নিহত লরেঞ্জোর প্রেতাত্মা তাহার প্রণয়িনীর নিকট স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হইয়া অতি করুণভাবে নিজ সঙ্গিহীন একাকিত্ব, প্রাণযাত্রা-প্রবাহের সহিত তাহার সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ও সহানুভূতির স্পর্শলাভের জন্য ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষার কাহিনী বিবৃত করিয়াছে। ইহাতে ভৌতিক ভয় নাই, আছে নির্ম্মল কারুণ্যরস, যাহাতে গলিত, দুর্গন্ধময় শবদেহের সমস্ত বীভৎসতা ও বিকৃতি ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে। কেবল La Belle Dame Sans Merci নামক গীতি-কবিতাতে কীট্‌স প্রেতলোকের শিহরণ, ইহার ভয়াবহ সাঙ্কেতিকতার সুরটী ফুটাইয়াছেন। মধ্যযুগের এক অশ্বারোহী সৈনিক শীতের রিক্ত, দীর্ণ বিজনতার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তভাবে বেড়াইতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে এক ছলনাময়ী পরী-সুন্দরীর সহিত তাহার সর্ব্বনাশা প্রেমের কাহিনী বিবৃত করিয়াছে। এই সুন্দরীর মোহিনী মায়া ও মদির চুম্বনের নিকট সে আত্মসমর্পণ করিয়া আবেগময় সুষুপ্তিতে ঢলিয়া পড়ে। নিদ্রার মধ্যে সুন্দরীর দ্বারা পূর্ব্ব-প্রতারিত প্রেমিক-সঙ্ঘ শুষ্ক, শীর্ণ ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া তাহাকে সাবধান করিতে চেষ্টা করে। নিদ্রাভঙ্গে সে দেখে সে এই বিজন পার্ব্বত্যপ্রদেশে পরিত্যক্ত হইয়াছে। বর্ণনার অত্যধিক সংযম; চাপা ফিস্‌ফিস শব্দের মত হ্রস্বায়তন ছন্দের গতিধ্বনি—যেন নামহীন ভয়ের তাড়নায় ভাবাভিব্যক্তির অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠরোধ সূচিত করিয়াছে। প্রেতলোকের গূঢ় ব্যঞ্জনা যেন ইহার মধ্যেই রূপ ধরিয়াছে।

(৭)

রোমান্টিক যুগের কবিতায় প্রকৃতিই মুখ্য; মনুষ্য গৌণ। সুতরাং ইহাতে মানুষের যে ছবি আঁকা হইয়াছে, তাহা যেন বহিঃপ্রকৃতিরই একটা মানব সংস্করণ। মানুষ প্রকৃতি রাজ্যেরই যেন একটা সীমান্ত প্রদেশ, প্রকৃতির প্রভাবে আচ্ছন্ন, প্রকৃতিরই গোপন আত্মার সচেতন বিকাশ। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে সমস্ত কৃষক ও মেষপালকের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রকৃতির অবিমিশ্র সরলতা, উদার অনাসক্তি ও সংযত গভীর ভাবাবেগ মূর্ত্ত হইয়াছে। তাঁহার "Michael" দারুণ আশাভঙ্গ ও পুত্রবিচ্ছেদের শোকে পর্ব্বতশৃঙ্গের মত অচল, অটল ও মৌন—পার্ব্বত্য প্রকৃতির রুক্ষ-কর্কশ, অথচ

অন্তঃপ্রবাহিত স্নেহ-নির্ঝরে কোমল আত্মা যেন তাহার মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। তাঁহার Two Brothers নামক কৃষক-জীবনের ছবিতে আমরা দেখি যে, পার্ব্বত্য প্রতিবেশের প্রভাবে পারিবারিক বন্ধন ও ভ্রাতৃস্নেহ কত গভীর ও দৃঢ়মূল হইয়াছে। তাঁহার ফেরিওয়ালা, ভ্রমণকারী, গ্রাম্য শিক্ষক প্রভৃতি অতি সাধারণ শ্রেণীর চরিত্রগুলিও প্রকৃতির প্রসাদে কবি ও দার্শনিক হইয়া উঠিয়াছে—প্রকৃতিই তাহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি, গভীর চিন্তাশীলতা ও পৃথিবীর দুঃখ-ক্লেশের প্রতি মহাপ্রাণ সমবেদনা সঞ্চারিত করিয়াছে। তাঁহার আদর্শ প্রেমিকা লুসিও প্রকৃতির স্তন্যপানে লালিতা ও ও বর্দ্ধিতা—তাহার দেহের প্রতি অঙ্গে, প্রত্যক মানসিক উৎকর্ষে প্রকৃতির লীলা-চঞ্চল সৌন্দর্য্যতরঙ্গ হিল্লোলিত হইয়াছে। লুসীর মানবী মূর্ত্তি এই প্রকৃতির স্নিগ্ধ-শ্যামল আচ্ছাদনে অন্তরায়িত হইয়াছে—বহিঃপ্রকৃতির অঙ্গ হইতে তিল তিল রূপ ও গুণ আহরণ করিয়া এই নব-তিলোত্তমা মানব জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের গ্রাম্য জীবনচিত্রে অনেক স্থলে অতি তুচ্ছ, সাধারণ ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, ও এই অকিঞ্চিৎকরতা কবি-কল্পনার দ্বারা অতিক্রান্ত ও সংশোধিত হয় নাই। কবির ধারণা ছিল যে, গ্রাম্যজীবন প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ধন্য; সুতরাং তাহার প্রত্যেকটী হৃৎস্পন্দন, মানস বৈশিষ্ট্য, এমন কি অতি আকস্মিক, উদ্দেশ্যহীন খেয়ালও গভীর, উপলব্ধির অতীত, মহিমার দ্যোতক। সাধারণ পাঠক এই মত সর্ব্বাংশে গ্রহণ করে নাই বলিয়া কবির সহিত তাহার সহানুভূতির ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে—কবিও কল্পনাশক্তির সার্থক প্রয়োগে এই ব্যবধান পুরাইবার কোন চেষ্টা করেন নাই। কাজেই কতকগুলি গ্রাম্য কবিতা অসার্থক তথ্যপুঞ্জে ভারাক্রান্ত হইয়াছে। কাষ্ঠসংগ্রহ হইয়াছে প্রচুর, কিন্তু উহাতে কল্পনার শিখা জ্বলিয়া উঠে নাই। এক নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ ও তাহার তিন বৎসরের শিশু পৌত্র গ্রামের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে ছোট-খাট চুরি করে—প্রতিবেশীরা জানিয়াও এই ছেলেমানুষী চৌর্য্যবৃত্তির প্রতি সস্নেহ উপেক্ষা প্রদর্শন করে। ইহাতে কবি মনস্তত্ত্বের একটা কৌতূহলোদ্দীপক উদাহরণ দেখিয়াছেন, কিন্তু পাঠক কবির কৌতূহলের অংশভাক্ হয় না। ছেলের ভালো লাগা না লাগা সম্পূর্ণ খেয়াল—তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই; সুতরাং বয়স্ক লোক যদি ছেলের

কাছে কারণ জানিতে চায়, তবে সে তাহাকে মিথ্যাভাষণে প্রণোদিত করে। ইহাতেও মনস্তত্ত্বের উপাদান আছে, কিন্তু কাব্যরস নাই। অর্দ্ধ-পাগল একটী বালকের অহেতুক উল্লাস, যাহা কবির মনে উচ্ছ্বসিত আনন্দের সঞ্চার করিয়াছে, পাঠকের মনে অনুরূপ কোন উত্তেজনার সৃষ্টি করে না। কেননা কবি এই ক্ষ্যাপার মনে, ভগবানের নিকট উপস্থিতি অনুভব করিয়া, যে মহিমার প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছেন, পাঠকের সে দিব্যদৃষ্টি খোলে নাই; কবি যেখানে সম্ভ্রমে নত, পাঠক সেখানে অবজ্ঞায় বিদ্রূপশীল। গাড়ীর চাকায় লাগিয়া এক দরিদ্র বালিকার গাত্রাবরণ ছিঁড়িয়া গিয়াছে; কবি তাহার ক্রন্দনে রাজার সিংহাসনচ্যুতি, বা মাতার সন্তানবিয়োগের মত, গভীর মর্ম্ম-বেদনার হাহাকার শুনিয়াছেন। পাঠক কিন্তু এই ক্ষতিকে সামান্য মনে করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত করুণরসের প্রতি উদাসীন থাকে। এই সমস্ত দৃষ্টান্তে কবি ও পাঠকের মন একস্তরে উঠিতে পারে না বলিয়া কবির উদ্দেশ্য মাত্র আংশিকভাবে সফল হইয়াছে।

কিন্তু মোটের উপর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পল্লীজীবনের চিত্রগুলি গভীর সহানুভূতি ও করুণার, ও অসামান্য গৌরবের আবিষ্কারে মহনীয় হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রব বাদ দিলেও, পল্লীবাসীদের চরিত্রে এমন একটা অসাধারণ চরিত্রবল, দৃঢ়সঙ্কল্প ও সাধুতার উচ্চ আদর্শ দেখা যায়, যাহাতে তাহারা আমাদের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। The Old Cumberland Beggar নামক কবিতায় এক অশীতিপর বৃদ্ধ ভিক্ষুক স্থবিরতায় প্রায় জড়পদার্থের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছে; কিন্তু মুক্ত, স্বাধীন জীবনযাপনের জন্য, প্রকৃতির সূর্য্যালোক ও বায়ুপ্রবাহে স্নাত হইয়া তাহার জরাজীর্ণ দেহে যেন একটা দিব্যদীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। তা'ছাড়া তাহার চরম অক্ষমতা তাহার প্রতিবেশীদের মনে দয়া ও সহানুভূতির অফুরন্ত নির্ঝর সৃষ্টি করিয়া তাহাদের নৈতিক উন্নতিবিধান করিতেছে। সুতরাং সে সকলের পরম উপকারী বন্ধু ও শিক্ষক। The Ruined Cottage কবিতায় এক গ্রাম্য রমণীর জীবনের করুণ কাহিনী আশ্চর্য্য সহানুভূতি ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বিবৃত হইয়াছে। জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য তাহার আপ্রাণ চেষ্টার ব্যর্থতা, তিলে তিলে তাহার দৃঢ়সঙ্কল্পের শিথিলতা, কর্ম্মোদ্যমের হ্রাস, ধীরে ধীরে অবসাদ ও নিশ্চেষ্টতার

নিকট আত্মসমর্পণ, স্বামি-পরিত্যক্তার নিদারুণ বেদনা—তাহার জীবনযাত্রার সমস্ত বিপর্য্যয়ের স্তরগুলি এমন চমৎকারভাবে দেখান হইয়াছে, এমন মর্ম্মস্পর্শী অথচ সংযত কারুণ্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে যে, আমরা পড়িতে পড়িতে অশ্রু সংবরণ করিতে পারি না। Michael ও The Ruined Cottage ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের গ্রাম্য জীবন বর্ণনায় চরম উৎকর্ষের উদাহরণ।

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ছাড়া অন্যান্য রোমাণ্টিক কবির কাব্যে মানব-চিত্র সেরূপ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে না। কোলরিজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা অতিপ্রাকৃত বিষয় বা আত্মানুশোচনা লইয়া রচিত। তাঁহার স্বপ্নাতুর দৃষ্টির সম্মুখে কোন ব্যক্তিবিশেষের জীবন স্পষ্ট রেখায় ফুটিয়া উঠে নাই। ফরাসী বিপ্লবের সহিত তাঁহার সহানুভূতি রাজনৈতিক ও দার্শনিক মতবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মত তাঁহার বিপ্লব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তাহার নায়কদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংস্রব ছিল না। কাজেই তিনি আন্দোলন সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা করিয়াছেন, কোন ব্যক্তি বা পরিবারের সুখ-দুঃখের কাহিনী গভীরভাবে অনুভব করেন নাই। শেলীর নায়ক-নায়িকারা হয় আদর্শলোকের অধিবাসী, না হয় তাঁহার নিজের অন্তর-বেদনার প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার Laon, Cythna, Prometheus, Asia—ইহারা সকলেই মানবের মুক্তিসংগ্রামের সেনানী, মানুষের মুক্তি-সাধনার ব্যাকুল আগ্রহ বা সিদ্ধিলাভের স্বর্গীয় আনন্দের প্রতীক, রক্তমাংসের জীব নহে। তাঁহার Prince Athanese, The Sensitive Plant, Alastor প্রভৃতি কবিতায় যে সমস্ত নরনারীর পরিচয় মিলে তাহারা শেলীর নিজের নিঃসঙ্গ, অতি-সূক্ষ্ম-অনুভূতিশীল আদর্শবাদের রূপক, কবির আত্ম-চিত্রণেরই বিভিন্ন রূপ। একমাত্র শেলির নাটক The Cenciতে কতকগুলি স্বতন্ত্র চরিত্র দৃঢ়রেখায় অঙ্কিত হইয়াছে, যাহারা কবির আত্মজীবনের প্রতিচ্ছায়া নহে। ইহার নায়িকা Beatrice শেলীর দার্শনিক মতবাদের প্রতিধ্বনি করিলেও, তাহার জীবন-সমস্যার মৌলিকতা ও সঙ্কল্পের অনমনীয় দৃঢ়তা তাহাকে বিশিষ্ট সত্তা দিয়াছে। কীট্‌সের কবিতায় মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা প্রায় সম্পূর্ণ প্রেম-বিষয়ক। তাঁহার নর-নারীরা প্রায় সকলেই প্রেমিক-প্রেমিকা। প্রেমের উচ্ছ্বসিত প্লাবনে তাহাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য ভাসিয়া

গিয়াছে। Isabellaতে বণিক্ ভ্রাতৃদ্বয়ের যে চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা বাস্তবানুগামী; কিন্তু তাহারা প্রেমের রাজকীয় মর্য্যাদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বলিয়া তীক্ষ্ণ, অথচ অনিপুণহস্তে নিক্ষিপ্ত বিদ্রূপ-বাণে বিদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের মনস্তত্ত্ব আলোচনার কোন চেষ্টা না করিয়া কবি তাহাদিগকে প্রেমের বিচারালয়ের সম্মুখে অপরাধীর মত দাঁড় করাইয়াছেন। কীট্‌সের পত্রাবলীতে তাঁহার মনুষ্য-জীবন সম্বন্ধে ক্রমবর্দ্ধমান পরিপক্ক অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশীল অন্তরের পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে স্কট তাঁহার কবিতায় মধ্যযুগের বীরত্বপূর্ণ জীবন-যাত্রার ছবি আঁকিয়াছেন; তাঁহার উপন্যাসে এই বীরোচিত আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মধ্যযুগের প্রাত্যহিক বাস্তব জীবনের উপভোগ্য বর্ণনা আছে। তাঁহার সমসাময়িক জীবন-সমস্যা সম্বন্ধে স্কটের কাব্য ও উপন্যাস উভয়েই নীরব। স্কটের নিজের ব্যক্তিগত জীবনে যথেষ্ট সামাজিক সহৃদয়তা, লোকের সহিত মিশিবার ক্ষমতা ছিল; কিন্তু তাঁহার জীবনাদর্শ মধ্যযুগের প্রভাব-নিয়ন্ত্রিত। তিনি সত্যই বিশ্বাস করিতেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মধ্যযুগের দুর্গাধিপতির জীবন-যাত্রা পুনরুদ্ধার করা যাইতে পারে—সামন্ত রাজের সহিত প্রজাবৃন্দের মধুর, অথচ কঠোর-নিয়ম-বদ্ধ সম্বন্ধটী অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। তাঁহার রাজভক্তিও মধ্যযুগের সারল্য ও আতিশয্য-মণ্ডিত ছিল। মধ্যযুগের এক অসম্ভব স্বপ্ন সফল করিতে তিনি এক বিরাট দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন—এই প্রাসাদ-প্রতিষ্ঠার ব্যয়বাহুল্যের রন্ধ্র দিয়াই আর্থিক সর্ব্বনাশ ও মৃত্যু তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল।

কিন্তু রোমান্টিক যুগের যে কবি সমসাময়িক মনুষ্য-জীবন সম্বন্ধে সর্ব্বাধিক কৌতূহলী ছিলেন তিনি বাইরণ। বহিঃ-প্রকৃতির অধ্যাত্ম-সম্পদ বিষয়ে তিনি ক্রমশঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলীর মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহার Childe Harold ও Manfredএ এই অধ্যাত্মগুণোপেত প্রকৃতির চমৎকার বর্ণনা আছে। কিন্তু এই প্রকৃতি-উপাসনার সুর বাইরণের কাব্যের গভীরতম সুর নহে। এই ধার-করা শিক্ষা তিনি সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রকৃতিতে এমন একটা অস্থির উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও লঘু-চপল মনোবৃত্তির আধিক্য ছিল যে উঁচু সুরে বাঁধা কাব্য

মনোভাব তাঁহার কাছে কখনই স্থায়ী হয় নাই। Childe Haroldএ এই প্রচেষ্টা কৃত্রিমতার হেতু হইয়াছে। এখানে কবি যেন একটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও বিষাদের ভান করিয়াছেন, মানুষ-সমাজের প্রতি অনুযোগের সুর খুব উঁচু পর্দ্দায় চড়াইয়াছেন। জীবনের সুখ, প্রতিষ্ঠা ও ভালবাসার প্রতি তিনি যে প্রবল ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন, তাহাতে আন্তরিকতা অপেক্ষা নাটকীয় ভঙ্গী ও উচ্ছ্বাসই বেশী ফুটিয়াছে। সুতরাং কাব্যের ভাষা ও ভাবে আলঙ্কারিক আতিশয্য ও অতিভাষণ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহার Don Juanএ কিন্তু তাঁহার আসল প্রকৃতিটী সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ ও লীলায়িত অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। Don Juan একটী ব্যঙ্গাত্মক মহাকাব্য বিশেষ—সমাজ-নীতির অন্তর্নিহিত ভণ্ডামি ও শূন্যগর্ভতার, আদর্শবাদের ছদ্মাবরণের অন্তরালে ইহার স্বার্থলোলুপতার এমন সরস ও সর্ব্বব্যাপী চিত্র ইংরেজী সাহিত্যে আর কোথাও নাই। কবি কোথাও নীতিবিদের ভর্ৎসনা, সংশোধকের উগ্র, ঝাঁঝালো বিচার-পদ্ধতি প্রয়োগ করেন নাই। তিনি লঘু-সরস ব্যঙ্গের সহিত, নিজেকে অপরাধীদের সহিত একাসনে বসাইয়া, সমাজের সমস্ত হাস্যকর অসঙ্গতি ও নৈতিক শিথিলতা, মানব-চরিত্রের অনিবার্য্য নিম্নগামিতা, প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে নূতন পাপের বীজ-বপন, আদর্শবাদ হইতে ক্ষুদ্র স্বার্থপরতায় অবতরণ প্রভৃতি বিষয়ের কৌতুকপূর্ণ চিত্র আঁকিয়াছেন। এই বিদ্রূপ-হাসির ফাঁকে ফাঁকে তিনি করুণ রসের, আদর্শ প্রেমের সৌন্দর্য্য ও হৃদয়াবেগের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত গভীর ভাবের বন্ধন তিনি দীর্ঘকালের জন্য স্বীকার করেন নাই। মুহূর্ত্ত মধ্যে, কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই, এমন কি পংক্তি শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি উন্নত গাম্ভীর্য্য হইতে চপল ব্যঙ্গ-কৌতুকের স্তরে নামিয়া আসিয়াছেন। এই অবিরত ভাব-পরিবর্ত্তন তাঁহার কাব্যে অফুরন্ত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছে ও পাঠকের মনকে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের সম্ভাবনায় উন্মুখ রাখিয়াছে। ইহার বুদ্ধির চমকপ্রদ তীক্ষ্ণতা, ব্যঙ্গের বিদ্যুৎশিখার যত তীব্র, অতর্কিত আঘাত হানিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, ফোয়ারার ন্যায় হাস্যরসের সহজ অজস্রতা, ভাষার ও ভাবের প্রচণ্ড গতিবেগ প্রভৃতি গুণ সমালোচনার মন্থর বিশ্লেষণে ধরা যায় না। ইউরোপীয় সমাজের চটুল সমালোচনা ও ইহার বাহিরের

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈচিত্র্যের নিখুঁত ছবি হিসাবে Don Juan এর স্থান ইংরেজী সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

আর একজন মধ্যম শ্রেণীর কবি, ক্র্যাব (Crabbe) পল্লীজীবনের বাস্তব ছবি আঁকিয়াছেন। ক্র্যাবের প্রণালী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মী। তিনি পল্লীবাসীদের দারিদ্র্যের নিদারুণ লাঞ্ছনা, আনন্দহীন সঙ্কীর্ণতা ও অবসন্নকারী শ্রমের কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, তাহাদের জীবনে কোন আদর্শবাদের মহিমা আরোপ করেন নাই। ক্র্যাব নির্ম্মম বাস্তবতাপন্থী কবি ; যে সমস্ত কবি সৌখীন ভাব-বিলাসের বশে পল্লীর সুখ-শান্তিপূর্ণ জীবন-যাত্রার কল্পনা করে, তিনি তাহাদিগকে তীব্র বিদ্রূপের কশাঘাত করিয়াছেন। পল্লীচিত্র আঁকিতে তিনি নিজ বাস্তব অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির উপর কোনরূপ কল্পনার মোহাঞ্জন মাখান নাই। কবিত্ব-পর্য্যায়ে তাঁহার স্থান উচ্চ নহে ; কিন্তু সত্য-ভাষণ, আন্তরিক অনুভূতি, শ্রমজীবি-শ্রেণীর সঙ্কীর্ণ জীবন-সমস্যার বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য তাঁহার কবিতাকে উপভোগ্য না করিলেও শ্রদ্ধেয় করিয়াছে। রোমান্টিক কবিতার ভোজে কল্পনা-মিষ্টান্নের অতিপ্রাচুর্য্যের মধ্যে ক্র্যাবের কবিতা যেন এক চামচ বিশুদ্ধ লবণের মতই স্বাদবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। যুগ-প্রভাব হইতে তাঁহার সম্পূর্ণ মুক্তিই তাঁহার কবিতাকে রুচিকর করিয়াছে।

(৬)

রোমান্টিক যুগে কবিতাই সাহিত্য-রচনার মুখ্যতম প্রচেষ্টা। গদ্য-রচনা তুলনায় গৌণ। এই যুগের সমালোচনা-সাহিত্য নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। ল্যাম্ব (Lamb), কোলরিজ (Coleridge) ও হাজলিট (Hazlitt) সাহিত্য-বিচারে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। সমালোচনা ভক্তিনম্রভাবে, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সহিত লেখকের মানস-বৈশিষ্ট্য ধরিতে চেষ্টা করিবে ; লেখকের উদ্দেশ্য বুঝিয়া সেই উদ্দেশ্য-সাধনের সাফল্যের মানদণ্ডে রচনার উৎকর্ষ নির্ণয় করিবে। কোন সনাতন, অপরিবর্ত্তনীয় নীতি প্রয়োগ না করিয়া, পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত আইনে বিচার না করিয়া, প্রত্যেক গ্রন্থের প্রকৃতি অনুযায়ী স্বতন্ত্র বিচারাদর্শ গঠন করিয়া লইবে। নিন্দা-প্রশংসা সমালোচনার প্রকৃত কাজ নহে ; ইহার

প্রধান কর্ত্তব্য কল্পনার বিচিত্র রূপায়ন হইতে ইহার মৌলিক প্রেরণাটীর আবিষ্কার ও পাঠকের নিকট ইহার পরিচয়-দান। পাঠক ও লেখকের মনের পরিচয়-সংঘটনে মধ্যস্থতা সমালোচকের প্রধান কাজ। পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দীতে ডাঃ জনসন মিলটন ও গ্রের প্রতি যে অবিচার করিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ যে তিনি পূর্ব্ব-প্রচলিত ক্লাসিকাল আদর্শে তাহাদের বিচার করিয়া তাহাদের মধ্যে সেই আদর্শ-অনুবর্ত্তন বিষয়ে অনেক ত্রুটি পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একবারও মনে করেন নাই যে মিলটন ও গ্রে এক নূতন রকমের রূপসৃষ্টিতে ব্রতী হইয়াছেন; এবং এই নূতন প্রচেষ্টা নিজ অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের আদর্শে অঙ্গ-বিন্যাস করিয়াছে কিনা ইহাই একমাত্র বিচার্য্য বিষয়। বর্ত্তমান যুগে এইরূপ ভ্রান্তির মূলোচ্ছেদ হইয়া গেল। ল্যাম্ব, কোলরিজ ও হ্যাজলিট শেক্সপিয়ার, এলিজাবেথীয় যুগের অন্যান্য নাট্যকার ও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থপ্রমুখ সমসাময়িক কবিদের রচনা আলোচনায় যে সূক্ষ্মদর্শিতা, সহানুভূতি ও রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভবিষ্যৎ সমালোচনার প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গীতে বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে।

রোমাণ্টিক যুগের রচনায় বিস্ময়কর প্রাচুর্য্য ও সরসতা দেখা যায়; কিন্তু তথাপি ইহা পরবর্ত্তী যুগের প্রতিকূল সমালোচনা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। ম্যাথিউ আর্নল্ড (Matthew Arnold) ইহার বিরুদ্ধে মননশক্তির অপ্রাচুর্য্যের অভিযোগ আনেন—ইহার জীবন-আলোচনার মধ্যে গভীর চিন্তাশীলতা নাই, আছে কল্পনাবিলাস। আধুনিক বাস্তব যুগে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরও প্রবল হইয়াছে—ইহার অবাস্তবতা, পলায়নী মনোবৃত্তি, সমস্যাবিমুখতা অভিযোগের বিষয় হইয়াছে। আসল কথা মানব-মন আদর্শবাদ ও বাস্তবপ্রিয়তা এই উভয় বিপরীতমুখী বিন্দুর মধ্যে আবর্ত্তিত হইয়াছে। আদর্শবাদ-প্রণোদিত কল্পনার পরিণতি যদি হয় শেলিতে, অবিমিশ্র বাস্তবতার পরিণতি ইলিয়টের (Eliot) 'The Waste Land'এ। এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বুদ্ধিদ্বারা সম্ভব; কিন্তু সাহিত্যের সৌন্দর্য্যরূপে ইহা এখনও অভিব্যক্ত হয় নাই। রোমাণ্টিক যুগের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করিয়াও ইহার মহনীয়তা ও রূপবৈচিত্র্যে নিঃসংশয় শ্লাঘা অনুভব করা যায়।

সপ্তম অধ্যায়

ভিক্টোরীয় যুগ

(১৮৩২—১৯০০)

(১)

এলিজাবেথীয় যুগের সহিত সপ্তদশ শতাব্দীর যেরূপ সম্বন্ধ, রোমান্টিক যুগের সহিত ভিক্টোরীয় যুগের সম্বন্ধ তাহারই অনুরূপ। উভয় ক্ষেত্রেই পূর্ব্বগামী যুগে যে অভূতপূর্ব্ব কল্পনার ঐশ্বর্য্য কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগে তাহাই নানা শাখা-উপশাখায় বিভক্ত হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ ও মন্দীভূত, ও নূতন উপকরণ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সংসর্গে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উভয়ত্রই অব্যবহিত অতীতের সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার করা হয় নাই—বরং উহারই সঞ্চিত মূলধন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া নানা নূতন বিষয়ের আলোচনায় ব্যবহৃত হইয়াছে। শেক্সপিয়ারের কল্পনাসম্পদের উত্তরাধিকার যেমন ডন ও দার্শনিক কবি-গোষ্ঠীর (metaphysical poets) মধ্যে খণ্ডিত ও কতকটা বিকৃতরূপে ক্রিয়াশীল, তেমনি রোমান্টিক যুগের মৌলিক প্রেরণা টেনিসন্ (Tennyson), ব্রাউনিং (Browning) ও ম্যাথু আর্নল্ডের মধ্যে ক্ষীণ ও বিচ্ছিন্ন ভাবে সংক্রামিত হইয়াছে। রোমান্টিক যুগের কল্পনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য, উহার পূর্ব্ব প্রভাব, কবি মনের উপর একাধিপত্য হারাইয়াছে; ইহার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি ও বর্ণনা-পদ্ধতি, আর কবির জীবন-দর্শনের সহিত সম্পর্কান্বিত বা তাহার অখণ্ড মানস প্রকৃতির অভিব্যক্তি নহে। পরবর্ত্তী কবিদের রচনায় ইহা বহিরঙ্গ-সৌষ্ঠব, শিল্প-প্রসাধনে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ম্যাথু আর্নল্ড মোটামুটি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের প্রকৃতি সম্বন্ধে দার্শনিক মতবাদ অনুসরণ করিয়াছেন—কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্থির, আত্মসমাহিত বিশ্বাস ম্যাথু আর্নল্ডের ক্ষেত্রে করুণ নৈরাশ্যবাদ ও সান্ত্বনাহীন, অবসাদ-ক্লিষ্ট চিত্তের ব্যথিত দীর্ঘনিঃশ্বাসে রূপান্তরিত হইয়াছে। টেনিসনের প্রকৃতি-বর্ণনায় সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও শিল্প-সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু ইহাতে জীবন্ত,

নিবিড় অনুভূতির উষ্ণ জীবনীশক্তি নাই। শেলির কল্পনার উর্দ্ধাভিযান ও কল্পলোক-বিহার ব্রাউনিংএর কাব্যে চিরাভ্যস্ত প্রবণতা হইতে সাময়িক উচ্ছ্বাসে পরিণত হইয়া নূতন লক্ষ্যাভিমুখী হইয়াছে। ব্রাউনিং শেলীর আদর্শ-লোক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বাস্তব জগতের নরনারীর অফুরন্ত বৈচিত্র্যের, প্রেমের ভাবোচ্ছ্বাসের পরিবর্ত্তে ইহার অদ্ভুত মানস প্রতিক্রিয়ার, প্রতি নিবদ্ধ করিয়াছেন। মনে হয় যেন শেলীর কল্পনা নূতন প্রতিবেশে, নূতন বাস্তববোধ ও কৌতূহলী মনোভাবের প্রেরণায়, নিজ গতি ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে—যে শক্তি আকাশ-বিহারের পক্ষবেগ যোগাইত, তাহাই যেন নিম্নাভিমুখী হইয়া মানবমনের অন্ধকারময় গুহায় রহস্যোদ্ভেদের আলোক জ্বালিয়াছে। কীট্‌সের সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত রূপমোহ ও চিত্র-সৌন্দর্য্য-কুশলতা Pre-Raphaelite কবি-গোষ্ঠীতে একটা বিশেষ-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, সচেতন ভাব-মণ্ডল-রচনা ও আঙ্গিক-সৃষ্টির প্রয়াসে পরিণত হইয়াছে। কীট্‌স কাব্যমন্দিরে যে সৌন্দর্য্য-প্রদীপ জ্বালিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তীরা তাহাকে এক গূঢ় উপাসনা-পদ্ধতির অঙ্গীভূত আরতি-বর্ত্তিকায় রূপান্তরিত করিয়াছেন ও মন্দিরের বায়ুমণ্ডলকে ধূপধূনার সুরভিত ধূমে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করিয়াছেন—এই বদ্ধ বায়ুতে আমরা যে সৌন্দর্য্য-মায়া অনুভব করি তাহা যেন জীবনের স্পন্দনরহিত, মৃত্যুর শীতল-স্পর্শজড়িত। সুইনবার্ণ (Swinburne) শেলীর গীতি-প্রতিভার অধিকারী ; কিন্তু শেলীর গীতি-কবিতায় যে গভীর হৃদয়াবেগ ও আন্তরিকতার স্পর্শ পাই, সুইনবার্ণে পাই তাহার পরিবর্ত্তে অপরিমিত, ও সময় সময় অর্থহীন উচ্ছ্বাস।

ভিক্টোরীয় যুগে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই সৌন্দর্য্যপ্রবণ মনোভাবের সঙ্গে কয়েকটী নূতন উপাদান ও একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী যুক্ত হইয়াছে। গণতন্ত্র ও বিজ্ঞান সাহিত্যের উপর নূতন প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে ও উদ্দেশ্যমূলক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমশঃ নিছক সৌন্দর্য্যদৃষ্টির প্রেরণাকে অভিভূত করিয়াছে। ১৮৩২ সালকে ভিক্টোরীয় যুগের আরম্ভকালরূপে নির্দ্দেশ করা হয়—এই সালে পার্লামেণ্ট-সংস্কারের আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গণতন্ত্রের প্রকৃত অভ্যুদয়ের সূচনা করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতেও রাজনৈতিক দলাদলির প্রভাব সাহিত্যে উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—

কিন্তু উহার মূল প্রেরণা ছিল দলগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্কীর্ণ স্বার্থ। ভিক্টোরীয় যুগে রাজনৈতিক চেতনা দলের পক্ষসমর্থনের স্তর অতিক্রম করিয়া উদার সাম্যবাদ ও নিষ্পেষিত দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতির রূপে সাহিত্যে আবির্ভূত হইয়াছে। সামাজিক বিবেক-বুদ্ধি ও ন্যায়নিষ্ঠতা জাগ্রত হইয়া সাহিত্যের মধ্য-বর্ত্তিতায় দরিদ্রের অধিকার-রক্ষার, তাহাদের জীবনের অসহনীয় গুরুভার কিছু লাঘব করার, প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। সাহিত্য, বিশেষতঃ উপন্যাস শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনের সমবেদনাপূর্ণ চিত্র আঁকিয়াছে—সামাজিক অবিচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া উদ্দেশ্য-ধর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছে। ডিকেন্সের (Dickens) উপন্যাসসমূহে নানাবিধ সামাজিক দুর্নীতি ও শাসন-ব্যবস্থার অপপ্রয়োগ একদিকে তীব্র শ্লেষ, অন্যদিকে ভাবার্দ্র করুণরস উদ্দীপন করিয়াছে। থ্যাকারে (Thackeray) অভিজাত-সম্প্রদায়ের ভণ্ডামি ও নৈতিক দুর্ব্বলতার প্রতি নির্ম্মমভাবে কশাঘাত করিয়া আভিজাত্য-মোহের মূলোচ্ছেদ করিয়াছেন ও পরোক্ষভাবে গণতান্ত্রিক সাম্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করিয়াছেন। জর্জ্জ ইলিয়ট (George Eliot) সাধারণ অবস্থার নর-নারীর জীবনে অসাধারণ ভাব-গভীরতা ও প্রবৃত্তি-সংঘর্ষ উদ্‌ঘাটিত করিয়া তাহাদের প্রতি সাহিত্যিক আভিজাত্য-মর্য্যাদা অর্পণ করিয়াছেন। রাস্কিন, মরিস (Ruskin, Morris) প্রভৃতির রচনায় সমাজতন্ত্রবাদের নূতন প্রেরণা সমাজ-ব্যবস্থায় নূতন সৌন্দর্য্য ও নীতিবোধ প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন করিয়াছে। এমন কি যে কার্লাইল (Carlyle) গণতন্ত্রের বহির্ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, ভোটের দ্বারা যোগ্যতা নির্ণয়ের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে যিনি বদ্ধমূল অবিশ্বাস পোষণ করিতেন, যিনি একমাত্র বিধিঃ নিয়োজিত, ঐশ্বরিকগুণসম্পন্ন বীরের প্রতি নির্ব্বিচার নেতৃত্ব অর্পণের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনিও তাঁহার সমর্থিত স্বেচ্ছাচারকে অমোঘ নীতি-নিষ্ঠা ও কারুণ্যস্নিগ্ধ সহানুভূতির সিংহাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিশিষ্ট গদ্য-লেখকদের মধ্যে ম্যাথু আর্নল্ড ও নিউম্যান (Matthew Arnold, Newman) এই দুইজনের রচনায় গণতন্ত্রের প্রভাব সেরূপ লক্ষণীয় নহে। আর্নল্ড সংস্কৃতি ও শিষ্টাচারের উপর অতিরিক্ত জোর দিয়া জীবন হইতে সমস্ত অশোভন উগ্রতা, সাফল্যের জন্য উৎকট আগ্রহ ও গণতন্ত্রের ইতর রুচিবিকার ও সুষমাবোধের

অভাবকে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিয়াছেন। নিউম্যান ধর্ম্মযাজক ও শিক্ষাব্রতীর শান্ত, নিস্তরঙ্গ বেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া, গণতন্ত্রের মূলসূত্র যে স্বাধীন চিন্তার অধিকার তাহা পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছেন, ও সমস্ত ভুলভ্রান্তির অতীত নির্ব্বিচার গুরুবাদের নিরাপদ দুর্গে শেষ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মধ্যযুগ-সুলভ মনোবৃত্তিকে এই আধুনিক যুগে আবাহন করিয়াছেন।

গণতন্ত্রের পর বিজ্ঞানের প্রভাব ভিক্টোরীয় সাহিত্যের আর একটী উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। সপ্তদশ শতাব্দীতে Royal Societyর স্থাপন ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুক্তিবাদ-মূলক মনোভাবের প্রতিষ্ঠা এই বৈজ্ঞানিক প্রভাবের ক্রমপ্রসারের নিদর্শন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের একটী যুগান্তরকারী আবিষ্কার—ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ—সমস্ত সাহিত্যিক চিন্তা-ধারার প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে কবিতা বিজ্ঞানের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয় নাই; কাব্যের মধ্যে শুষ্ক যুক্তিবাদের প্রাদুর্ভাব অভাবাত্মক (negative) লক্ষণ, স্বভাবাত্মক (positive) নহে। গভীর ভাবাবেগের অভাবই এই যুগের কাব্য-রচনাকে আলোচনা-ধর্ম্মী করিয়াছে, বৈজ্ঞানিক চিন্তাপদ্ধতির প্রত্যক্ষ প্রভাব নহে। কিন্তু উনবিংশ শতকে বিজ্ঞানের প্রভাব কাব্যের ও কবিমনোভাবের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে—বিশ্বজগৎ ও নৈতিক জীবনের ভিত্তিভূমি সম্বন্ধে কবির ধারণাকে সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবাহিত করিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ভিক্টোরীয় যুগের প্রধান কবিসমূহ—টেনিসন, ব্রাউনিং ও ম্যাথিউ আরনল্ডের—মধ্যে বিভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। টেনিসন তাঁহার In Memoriam কাব্যে বিশ্ববিধানের নীতি ও জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন তাহা বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সংশয়জড়িত। ভগবানের আশ্বাস-বাণী ও বিজ্ঞানের পরীক্ষিত সত্য উভয়ে মিলিয়া তাঁহার মনে যে আশাবাদের সৃষ্টি করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও আত্মপ্রতিষ্ঠ নহে। এই অনিশ্চয়াত্মক মানস পরিস্থিতি তাঁহার গীতি-কবিতার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল প্রতিবেশ রচনা করে নাই—পরিপূর্ণ নির্ভর ও একনিষ্ঠ আদর্শের অভাবে তাঁহার গীতধারা প্রায়ই ক্ষুণ্ণ ও প্রতিহত হইয়াছে। সেইজন্য এই কাব্যের দার্শনিক মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না; ইহা আধুনিক মনের সন্দেহনিরসন ও পথ-

নির্দ্দেশের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ব্রাউনিংএর উল্লসিত, সংশয়লেশহীন আশাবাদ, জীবনের অবিচ্ছিন্ন প্রগতিতে তাঁহার অবিচল আস্থাও ঠিক ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ব্রাউনিংএর মননশীলতার আতিশয্য— যুক্তিতর্কের উপর অসাধারণ অধিকার ও বিশ্লেষণ-নৈপুণ্য—নিঃসংশয় ভক্তিবাদের সহিত খাপ খায় না। মনে হয় যে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ, জীবনের মধ্যে আনন্দ ও অগ্রগতির সম্ভাবনা আবিষ্কার করিবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, যুগের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত হইতে নূতন প্রেরণা ও গতিবেগ আহরণ করিয়াছে। 'ভগবান্ স্বর্গ হইতে পৃথিবীকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতেছেন' এই উৎসাহ-দীপ্ত আশার বাণীর মূলে কোন গভীর অধ্যাত্ম অনুভূতি নাই, আছে বিজ্ঞান-পুষ্ট, সতেজ, আনন্দময় মনোভাব।

যে বিজ্ঞান টেনিসন ও ব্রাউনিংএর কাব্যাভিব্যক্তিকে যথাক্রমে দ্বিধা-কুণ্ঠিত ও প্রাণশক্তি-সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহা ম্যাথিউ আর্নল্ডের ক্ষেত্রে গভীর অবসাদ ও নৈরাশ্যবাদের ছায়া-বিস্তারের হেতু হইয়াছে। তিনি বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাসের সহিত বিজ্ঞান-প্রভাবের ভাটার টানে মানবজীবনের কূল হইতে আস্তিক্যবাদ-সমুদ্রের দূরাপসরণ লক্ষ্য করিয়াছেন। বিশ্বাসের স্রোতোবেগ সরিয়া যাওয়াতে জীবনের উপকূলে খানিকটা কর্দ্দমাক্ত, উপলবিকীর্ণ বালুকাবিস্তার উদ্ঘাটিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য-সুষমার হানি করিয়াছে। তাই তিনি জীবনে আঁকড়াইয়া ধরিবার কোন নিশ্চিন্ত আশ্রয় পান না—তাঁহার জীবনে উদ্দেশ্য ও আদর্শবাদের মূল শিথিল হইয়াছে। অতীতের আদর্শ নষ্ট হইয়াছে, বর্ত্তমান এখনও সূতিকাগারের ভ্রূণাবস্থা হইতে পরিণতি লাভ করে নাই; এই অরাজকতার যুগে তাঁহার মন উদ্‌ভ্রান্ত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছে। তাই তিনি অতীতের দিকে তাকাইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন; বর্ত্তমানের বিশৃঙ্খল ও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল কর্ম্মপ্রচেষ্টার মধ্যে তিনি কোন স্বস্তি পান না। আধুনিক মনের এই মূঢ় বিক্ষেপ, এই উদ্‌ভ্রান্ত লক্ষ্যহীন গতি, গভীর আবেগ ও বৈজ্ঞানিক সত্যনিষ্ঠার সহিত অভিব্যক্ত হইয়া, ম্যাথিউ আর্নল্ডের কবিতায় কাব্যলোকের অমরতা লাভ করিয়াছে।

ইহা ছাড়া এই যুগে বিজ্ঞান আরও নিগূঢ় ও ব্যাপক ভাবে সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কবির উপমা-নির্ব্বাচন ও প্রকৃতি-বর্ণনা

বিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। কাব্যের ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেও অধিকতর বস্তুনিষ্ঠা লক্ষিত হয়। ব্রাউনিং আদিম সভ্যতা, মধ্যযুগ ও রেনেসাঁশ যুগের মনোভাবের বৈশিষ্ট্য নিখুঁতভাবে, বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস-আলোচনার সাহায্যে, তাঁহার কবিতায় প্রতিফলিত করিয়াছেন। নৃতত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে অর্দ্ধবর্ব্বর মানুষের মনে অতিপ্রাকৃত শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রথম সচেতনতা, ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রথম বিকৃত ধারণার স্ফুরণ তিনি অতি সুন্দর ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। ঔপন্যাসিকদের মানব-চরিত্র-বিশ্লেষণ, ঐতিহাসিক ও সমাজ-তাত্ত্বিকের তথ্যালোচনা সমস্তই এই সর্ব্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সাক্ষ্য দেয়। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ আশা করিয়াছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের ভাবোত্তেজিত মুখশ্রী (the impassioned expression which is in the countenance of all science) কবিতার কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিবে। এ আশা এখনও সফল হয় নাই; কিন্তু উহার বিপরীত সম্ভাবনা—কাব্যের মুখশ্রী ও অন্তঃপ্রেরণার উপর বিজ্ঞানের সন্ধানী আলোর নিক্ষেপ—ভিক্টোরীয় যুগে বহুলাংশে সার্থকতা লাভ করিয়াছে ইহা বলা যাইতে পারে।

ভিক্টোরীয় যুগে ইংরেজের সাম্রাজ্য-বিস্তার ও শিল্প-বাণিজ্য-প্রসার চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইহারই ফলে ইংরেজের মনে সাম্রাজ্যবাদের গর্ব্ব ও সাফল্যের আত্মপ্রসাদ অনুচিত পরিমাণে পুষ্ট হইয়াছে ও সাহিত্যে এই মনোভাবের ছাপ পড়িয়াছে। রেনেসাঁসের যুগে যে উচ্চাভিলাষ কল্পনার লঘুপক্ষে ভর করিয়া সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখার ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, ও তরুণ মনের স্বপ্নলীলামণ্ডিত হইয়া সাহিত্যে অপরূপ সুষমার সৃষ্টি করিয়াছে; রোমাণ্টিক যুগে যাহা আদর্শবাদের সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত ও সীমাহীন অগ্রগতির আশায় উৎফুল্ল হইয়া অপার্থিব-জ্যোতিঃমণ্ডল-বেষ্টিত হইয়াছে, ভিক্টোরীয় যুগে সেই একই প্রবৃত্তি বাস্তব সার্থকতার সঙ্কীর্ণ কারাগারে বন্দী হইয়া, রাজ্যবিস্তার ও ধনার্জ্জনের সুলভ আত্মতৃপ্তিতে সঙ্কুচিত হইয়া, নিজ উদার সম্ভাবনা ও অসীমের প্রতি আকুতি হারাইয়াছে। ইহারই অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কাব্যবীণার ঝঙ্কারে একটা স্থুল বস্তুতন্ত্রতার সুর লাগিয়াছে; ভাষা ও ভাবের স্বচ্ছতা, ইহাদের অধ্যাত্ম সাঙ্কেতিকতা ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য যেন একটা ঘন বাষ্পস্তরের আবরণে মলিন হইয়াছে। কাব্যের দিগন্তরেখা

ধূম্রবিহ্বল হইয়া দৃষ্টির বাধাহীন প্রসারকে অবরুদ্ধ করিয়াছে ; সঙ্গীতের সূক্ষ্মতম অনুরণনগুলি জীবনযুদ্ধে বিজয়-ঘোষণার রূঢ় আত্মপ্রত্যয়ে বিলীন হইয়াছে। কিপলিংএর (Kipling) সাম্রাজ্যবাদের দম্ভস্ফীত কবিতা এই মনোভাবের চরম অভিব্যক্তি ; কিন্তু টেনিসন, ব্রাউনিং, ম্যাথিউ আর্নল্ডের কবিতাতেও ইহারই তীক্ষ্ণ উত্তর বায়ু তাহাদের কাব্য-শতদলকে অনেকটা শীর্ণ ও রক্তিমাহীন করিয়াছে। এমন কি যে Pre-Raphaelite কবিগোষ্ঠী এই সমসাময়িক রূঢ়তার হাত এড়াইবার জন্য বর্ত্তমানকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া অতীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পলায়নী মনোবৃত্তির আতিশয্য, সৌন্দর্য্যের বিস্মৃতিময় যাদুমন্ত্রে আত্মসমর্পণের অতিব্যগ্রতা পরোক্ষভাবে যুগপ্রভাবেরই সাক্ষ্য দেয়। সুইনবার্ণ (Suinburne) ইতালীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের যে প্রশস্তি রচনা করিয়াছেন তাহাতে সংগ্রামের তীক্ষ্ণতা একেবারেই নাই ; তাঁহার প্রেম-কবিতার সৌন্দর্য্যমত্ততা ও শিথিল, এলায়িত বিলাস-বিভ্রম রাজনৈতিক কবিতাতেও বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। ইয়াট্‌সের (Yeats) গোধূলিম্লান কেল্‌টিক সৌন্দর্য্যলোকে আশ্রয়গ্রহণও যুগপ্রভাবের প্রতিক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভিক্টোরীয় যুগের স্থূল কর্ম্মসাফল্যের মধ্যে এমন একটা প্রতিকূল প্রভাব ছিল যাহাতে কোন কোন কবির চোখের স্বপ্ন টুটিয়াছে এবং কাহারও কাহারও অবাস্তবতার নেশা আরও ঘনীভূত ও বাস্তববিমুখ হইয়াছে।

(২)

কাব্য

টেনিসনকে (১৮০৯—১৮৯২) ভিক্টোরীয় যুগের প্রতিনিধি কবি বলা হয় —কেননা ভিক্টোরীয় মনোবৃত্তির নূতন প্রবণতা,—ইহার গণতন্ত্র ও বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ ও সঙ্কীর্ণ আত্মপ্রসাদ, ইহার আদর্শবাদহীন সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা— তাঁহার কবিতায় প্রতিফলিত হইয়াছে। টেনিসন খণ্ড গীতি-কবিতার কবি ; বড় কাব্য রচনায় তাঁহার কল্পনা নির্ভরযোগ্য দৃঢ়তা দেখাইতে পারে নাই। তাঁহার প্রথম বয়সের রচনার মধ্যে তাঁহার সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির নবীনতা অক্ষুণ্ণ আছে। "The Princess" কবিতায় তিনি নারীজাতির অধিকার সম্বন্ধে

লিখিতে গিয়া কল্পনার মাত্রা ও মনোভাবের ঐক্য ঠিক রাখিতে পারেন নাই —মধ্যযুগ ও আধুনিক কাল, কৌতুক ও গাম্ভীর্য্যের মধ্যে অস্থিরভাবে দোলায়িত হইয়াছেন। "In Memoriam"এ তাঁহার দার্শনিক বিচার-পদ্ধতির অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "Idylls of the King"এ তিনি মধ্যযুগের আদর্শ রাজা আর্থারের বিষয়ে মহাকাব্যের মত একটা দ্বাদশ খণ্ডে সম্পূর্ণ বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থেই তাঁহার কবিত্বশক্তির দৈন্য ও বৃহৎ পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার অক্ষমতা শোচনীয়-ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ রাজা আর্থার মধ্যযুগের আদর্শচ্যুত হইয়া ভিক্টোরীয় যুগের সঙ্কীর্ণ নৈতিক আদর্শের অঙ্গীভূত হইয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ তাঁহাকে দৃঢ়ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রক্তমাংসের মানুষ অপেক্ষা কতকগুলি অস্পষ্ট, অশরীরি ভাবসমষ্টির আধার বলিয়া মনে হয়। তৃতীয়তঃ কাব্যটির মধ্যে একটা অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন রূপক-ব্যঞ্জনা ইহার মানবিকতার হানি করিয়াছে—ইহার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আদর্শ-সংঘাতের বাস্তব তীব্রতা ছায়ালোকে বিলীন হইয়াছে। মহাকাব্যের অখণ্ড ঐক্য ও ঋজু মেরুদণ্ড ইহার মধ্যে একেবারেই নাই—বিভিন্ন খণ্ডাংশগুলির আপন আপন স্বতন্ত্র সত্তা ও রস-আবেদন কোন বৃহত্তর সংহতির মধ্যে পরিণতি লাভ করে নাই। টেনিসনের অনেকগুলি গীতি-কবিতা অনবদ্য শিল্পসৌন্দর্য্যে চমৎকার পালিশ-করা রত্নের ন্যায় ভাস্বর; অনেকগুলিতে মানব-চিত্তের কোন বিশেষ ভাবরূপ (mood)—উৎসাহ, অবসাদ, স্বপ্নময় আবেশ, অতীত পর্য্যালোচনার সুখদুঃখ-সমাকুল, মিশ্র মনোভাব, ধর্ম্মবিশ্বাস-দীপ্ত মৃত্যু-বরণ—নিখুঁত অভিব্যক্তি লাভ করিয়া পাঠকের মনে স্মরণীয়ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। ছন্দ ও ধ্বনি-প্রবাহের উপর অসাধারণ অধিকার তিনি যে কত বড় কাব্যশিল্পী ছিলেন তাহার নিদর্শন —ইহাদের সহিত ভাবগভীরতা ও কল্পনার ঐশ্বর্যের সমন্বয় হইলে তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন।

যুগধর্ম্মে এক হইলেও রচনা-রীতি ও শিল্পকৌশলে ব্রাউনিং (১৮১২-১৮৮৯) টেনিসন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। টেনিসনের মসৃণ ধ্বনিমাধুর্য্য ও প্রথাবদ্ধ আলঙ্কারিকতা ব্রাউনিংএ একেবারেই নাই। ব্রাউনিং কবির বহিঃসুষমা ও গীতিঝঙ্কার বিষয়ে একেবারেই নিস্পৃহ ও উদাসীন—কথ্য রীতির কর্কশতা,

আকস্মিকতা ও প্রকাশ-ভঙ্গীর দুর্ব্বোধ্য সংক্ষিপ্ততা তাঁহার কবিতার ভাষার লক্ষণ। তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক পাঠকের সৌন্দর্য্যরুচিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া কবিতার বাহিরের সৌষ্ঠবের অভাব অর্থগভীরতার দ্বারা পূরণ করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার প্রেম-কবিতাতে তিনি প্রেমের চিরন্তন ভাবালুতা ও সৌন্দর্য্যাসক্তির আলোচনা করেন নাই—প্রেমের তীব্র অভিজ্ঞতা যে মানস বিপর্য্যয় ঘটায়, যে চিত্তবিকারের সৃষ্টি করে তাহারই কৌতূহলোদ্দীপক মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ তাঁহার আলোচ্য বিষয়। এক এক কবিতায় মনঃসমীক্ষণের এক এক নূতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। কোথাও বা প্রেমের ব্যর্থতার মধ্যে এক নূতন জীবন-দর্শনের উপলব্ধি প্রেম-কবিতায় দার্শনিকতার গৌরব আরোপ করিয়াছে। এক বিকৃত-মস্তিষ্ক প্রেমিক তাহার চলচ্চিত্ত প্রেমিকার শ্বাসরোধে মৃত্যু ঘটাইয়া তাহাদের প্রেমকে চিরন্তন করিয়াছে; তাহার মন এক অদ্ভুত আত্মপ্রবঞ্চনা-মিশ্র আত্মপ্রসাদে পূর্ণ। আর এক প্রত্যাখ্যাতা প্রণয়িনী তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে বিষপ্রয়োগে হত্যার জন্য এক রাসায়নিক পরীক্ষাগারে উপনীত হইয়াছে—বিষ প্রস্তুত হইবার অবসরে তাহার কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া তীব্র ঈর্ষ্যার যে বিষাক্ত ঝলক উদ্গীরিত হইয়াছে আমরা যেন তাহার ঝাঁজ নিজ নাসারন্ধ্রে অনুভব করি। বিলুপ্ত সভ্যতার প্রতীক এক ধ্বংস-বিলীন মহানগরীর পটভূমিতে দুই প্রকারের প্রেমলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। একটীতে নিশ্চিহ্ন বিলুপ্তির ধূসর বিস্মৃতির মধ্যে নবীন প্রেমের তীব্র আগ্রহ দীপ্ত শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে; ধ্বংসের মধ্যে নূতন সৃষ্টির বীজ বপন হইয়াছে। দ্বিতীয়টীতে পরিত্যক্ত বিশাল প্রান্তরের মধ্যে উদ্ভিদ্-জীবনের অপরিমিত বিস্তার প্রেমের বন্য, দুর্ব্বার শক্তির উদ্বোধন করিয়াছে; কিন্তু জীবনীশক্তির এই উদ্দাম প্রাচুর্য্যের মধ্যে অপ্রতিবিধেয় ব্যর্থতার করুণ সুর গুঞ্জরিত হইয়াছে। মানবের ক্ষুদ্র হৃদয় ও প্রেমের অসীম বিস্তার—এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের অসম্ভাব্যতা চিত্তকে পীড়িত করিয়াছে। আর একটী কবিতায় হতাশ প্রেমিক তাহার প্রণয়িনীর সঙ্গে শেষবার ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার নৈরাশ্যবোধকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া এক নূতন আশাবাদে উদ্দীপ্ত হইয়াছে—পরলোকের অসীম সম্ভাবনার মধ্যে জীবনের সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষতি-ক্ষোভ নূতন অর্থগৌরবে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই কয়েকটী

দৃষ্টান্ত হইতে ব্রাউনিংএর প্রেম-কবিতার বৈচিত্র্য ও বহুমুখীনতার কিছু ধারণা জন্মিবে।

ইহা ছাড়া, ব্রাউনিং এক অভিনব art-form, Dramatic Monologue-এর (আত্মবিশ্লেষণমূলক নাটকীয় স্বগতোক্তি) উদ্ভাবন করিয়াছেন। এগুলি ঠিক নাটক নয়, কেননা ইহাদের মধ্যে ঘটনার কোন ঘাত-প্রতিঘাত নাই; যা কিছু আলোড়ন তাহা সমস্ত চিন্তারাজ্যের। দ্বিতীয়তঃ, এগুলিতে কোন কথোপকথন নাই; ইহারা একজন বক্তারই উক্তি, যদিও দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি, তাহার আপত্তি ও মানস প্রতিক্রিয়ার অদৃশ্য প্রভাবে এই আত্ম-পরিচয়ের প্রত্যেকটী স্তর নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। তথাপি এইজাতীয় কবিতা-গুলি মনের গহন স্তরে পরস্পর-বিরোধী ভাবের সমাবেশ, নানা জটিল প্রবৃত্তি-সূত্রের সমন্বয়ের চিত্র হিসাবে, লেখকের নাটকীয় শক্তি ও অসাধারণ মনস্তত্ত্ব-কুশলতার পরিচয় দেয়। অনেকগুলি কবিতায় ইটালীতে মধ্যযুগ ও রেনে-সাঁসের প্রথম যুগের মানুষের মানস পরিস্থিতির চমৎকার ছবি ফুটিয়াছে। এই সমস্ত যুগের সংস্কৃতির মধ্যে সৌন্দর্য্যোপাসনা ও শিক্ষানুরাগের সঙ্গে হিংস্র, বর্ব্বর মনোবৃত্তি ও নৈতিক শিথিলতার কি অদ্ভুতপ্রকারের সংমিশ্রণ ছিল তাহা অনেকগুলি কবিতায় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। একটী কবিতাতে (My Last Duchess) এক সামন্ততান্ত্রিক (feudal) ভূস্বামী ভিন্নদেশীয় দূতের সঙ্গে বিবাহের কথাবার্ত্তা চালাইতে চালাইতে নিজ সৌন্দর্য্যরুচির আত্মশ্লাঘাপূর্ণ পরিচয়দানের মধ্যে, সামান্য একটু হাসিখুশি ও মেলামেশার আতিশয্যের জন্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রণয়িনী কেমন করিয়া নিঃশব্দে জীবন-যবনিকার অন্তরালে সরিয়া গিয়াছে, তাহার ক্রূর, ভয়াবহ ইঙ্গিত বিকীর্ণ করিয়াছে। এক মৃত্যু-শয্যাশায়ী ধর্ম্মযাজক তাঁহার অবৈধ-প্রণয়োদ্ভূত পুত্রদের নিকট আপনার অন্তিম ইচ্ছা ব্যক্ত করার প্রসঙ্গে এক অদ্ভুতরকমের মিশ্র মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে। তাহার মৃতদেহ মন্দির-প্রাঙ্গণের কোন্ ছায়াস্নিগ্ধ, শান্ত কোণে সমাহিত হইবে, তাহার উপর কেমন রত্নখচিত স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, স্তম্ভের উপর কিরূপ খাঁটি লাটিনে লেখা স্মারকলিপি উৎকীর্ণ হইবে, এবং এই সমস্ত ব্যবস্থাই যেন তাহার এক মৃত প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত তুলনায় উন্নততর রুচির পরিচয় দেয়—ইত্যাদি বিষয়ে এই মরণপথের যাত্রীটি ছেলেদের প্রতি অতি

ব্যাকুল অস্বস্তির সহিত খুব খুঁটিনাটি নির্দ্দেশ দিয়াছে। এই সমস্ত নির্দ্দেশ ও অভিলাষ-প্রকাশের মধ্য দিয়া মধ্যযুগসুলভ ধর্ম্মজীবনের এক কৌতুকাবহ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে—মর্ত্ত্যের প্রতিযোগিতা স্বর্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। যীশু খৃষ্টের পুনর্জ্জীবনলাভের অলৌকিক কাহিনী বৈজ্ঞানিক-মনোভাব-সম্পন্ন এক আরব চিকিৎসকের মনে কি প্রবল বিচার-বিমূঢ়তার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আর একটী কবিতার আলোচ্য বিষয়। সে বিজ্ঞান-সম্মত মানদণ্ডে ইহার বিচার করিতে চেষ্টা করিয়া ঠিক সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে নাই। শেষ পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত অবিশ্বাস ও বৈজ্ঞানিক সন্দেহের আবরণ ভেদ করিয়া ভক্তিবাদ ও ঐশী মহিমার রোমাঞ্চিত উপলব্ধি স্ফুরিত হইয়াছে। আধুনিক যুগের সন্দেহবাদী ধর্ম্মযাজক কেমন করিয়া সন্দেহের সহিত নির্ব্বিচার ধর্ম্মবিশ্বাসের সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে তাহা অতি কূট যুক্তিতর্কের সাহায্যে আর একটি কবিতায় আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে কেহই পূর্ণ বিশ্বাসী বা পূর্ণ অবিশ্বাসী হইতে পারে না—সকলেরই মনে আস্থা-অনাস্থা-জড়িত এক মিশ্র পরিস্থিতি, সাদা-কালোর চিত্র-বিচিত্র সতরঞ্চ-ছক। তাহাই যদি অপরিহার্য্য হয়, তবে নাস্তিকতা ঘোষণা করিয়া জীবনের সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা নিঃসংশয় বিশ্বাসের দাবী করিয়া লৌকিক প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন বুদ্ধিমানের কাজ। এই সমস্ত যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়া বক্তার মানস-সংস্থানের জটিলতা, তাহার পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারা, তাহার আত্মপরিচয়ের বিদ্যুৎ-ঝলক-উদ্ভাসিত ইঙ্গিতগুলি চমৎকার ফুটিয়াছে। ব্রাউনিং কবিতার মধ্যে গদ্যরীতি-ছন্দ, কথোপকথনের লঘু সরসতা ও অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত প্রকাশভঙ্গীর প্রবর্ত্তনে ও ইহাকে চরিত্র-সৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ মননশক্তির বাহন করিয়া কাব্যের পরিধি বাড়াইয়াছেন। অতি আধুনিক যুগের কোন কোন কবি ব্রাউনিংকে অনুসরণ করিয়া কাব্যকে প্রথাবদ্ধ আলঙ্কারিকতার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়াছেন। যদিও আধুনিক সমালোচকদের মধ্যে কেহ কেহ ব্রাউনিংএর মননশীলতার প্রতি সন্দিহান হইয়াছেন, ও তাঁহাকে কবি ও দার্শনিক উভয়বিধ গৌরব হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিয়াছেন, তথাপি অধিকাংশের মত তাঁহার অনুকূলে।

ম্যাথিউ আর্নল্ড (১৮২২-১৮৮৮) সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে,

তদতিরিক্ত বেশী কিছু যোগ করিবার নাই। তাঁহার Thyrsis, Scholar-gipsy নামক দুইটী শোক-কবিতাতে (elegy) তাঁহার মানস বৈশিষ্ট্য, ধূসর দুঃখবাদ-প্রবণতা সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার কবিতার শান্ত, গোধূলিচ্ছায়ামণ্ডিত প্রতিবেশে মাঝে মধ্যে মৃদু আবেগকম্পন অনুভূত হয়—প্রকৃতিবর্ণনায়ও তাঁহার সূক্ষ্ম-সংবেদনশীল মনের ছাপ পড়িয়াছে। তথাপি সর্ব্বশুদ্ধ তাঁহার কবিতা-সমষ্টিতে বৈচিত্র্য ও জীবনীশক্তির আপেক্ষিক ক্ষীণতা অস্বীকার করা যায় না।

Pre-Raphaelite কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন রসেটি (১৮২৮-১৮৮২), মরিস (১৮৩৪-১৮৯৬), সুইনবার্ণ (১৮৩৭-১৯০৯) ও রসেটির ভগ্নী কুমারী রসেটি (১৮৩০-১৮৯৩)। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই একাধারে কবি ও চিত্রকর ছিলেন। ইঁহাদের বর্ণনাভঙ্গী ও শিল্পরীতির একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে ইঁহারা কবিতার মধ্যে চিত্রকরসুলভ বর্ণৌজ্জ্বল্য ও ছবির ন্যায় সুস্পষ্ট রেখা-বেষ্টনী (outline) আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহাদের লেখনী যেন বর্ণ-তুলিকার কাজ করিত; ইঁহারা যেন কবি ও চিত্রকরের শিল্প-প্রণালীর পার্থক্য দুর করিয়া উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইঁহাদের এক একটী বর্ণনা যেন রঙ্গে ঝলমল, দৃঢ়রেখাবন্ধনীতে সুস্পষ্ট, সাঙ্কেতিকতায় রহস্যময় ছবির মত আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অবশ্য এই চিত্র-সৌন্দর্য্যের প্রতি অত্যধিক প্রবণতার জন্য কবিতার অন্যান্য গুণ—ইহার ভাব-গভীরতা, গতিবেগ, প্রকাশাতীত আভাস-ব্যঞ্জনা, ধ্বনিমাধুর্য্য প্রভৃতি কতকটা চাপা পড়িয়াছে। চিত্রসৌন্দর্য্যের আদর্শ এই গোষ্ঠীভুক্ত সমস্ত কবি সমান নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করেন নাই—তাঁহাদের আদর্শসাম্য অল্পদিনের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের টানে খণ্ডিত হওয়ায় প্রত্যেকে আপন আপন স্বতন্ত্র পথের পথিক হইয়াছেন। মরিস একদিকে প্রাচীন যুগের মহাকাব্যধর্ম্মী আখ্যায়িকাগুলিকে নিজ কবিতার বিষয় করিয়াছেন—ইহাদের সরল মনোভাব ও প্রচণ্ড গতিবেগের মধ্যে চিত্রসৌন্দর্য্য-সৃষ্টির মন্থর আবেশ, বর্ণবিন্যাসের খুঁটিনাটি শিল্পরীতি স্রোতের টানে ভাসিয়া গিয়াছে। আর এক দিকে তিনি সমাজতন্ত্রবাদের প্রভাবে কাব্য-চর্চ্চা ছাড়িয়া গৃহসজ্জার সংস্কার-কার্য্যে, আমাদের সাধারণ গৃহস্থালীর ব্যবস্থার অবিকৃত

সৌন্দর্য্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়, ব্রতী হইয়াছেন। সুইনবার্ণের কবিতায় প্রেমবর্ণনার অপরিমিত উচ্ছ্বাসের মধ্যে চিত্রসৌন্দর্য্যের আদর্শ অনেকটা গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। রসেটি ও মিস রসেটি—এই দুই ভ্রাতা ভগ্নী—শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাদের গোষ্ঠীর আদর্শে স্থির ছিলেন। ভ্রাতার কবিতায় বর্ণপ্লাবন ও ভগ্নীর কবিতায় গোধূলির বর্ণরিক্ততা—উভয়ের মধ্যেই চিত্রকরের তুলির টান, অঙ্কন-প্রতিভার স্পর্শ তুল্যভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। রসেটির 'The Blessed Damozel' তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা ও তাঁহার বৈশিষ্ট্যের চমৎকার নিদর্শন। মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উন্নীত প্রণয়িনী অধীর আগ্রহের সহিত তাহার অধোলোকস্থিত প্রেমাস্পদের সহিত মিলনের প্রতীক্ষা করিতেছে—স্বর্গের সমস্ত অপার্থিব সৌন্দর্য্য তাহার চক্ষু হইতে পৃথিবীর প্রণয়ের মোহাবেশ মুছিয়া লইতে পারে নাই। তাহার কল্পনা এই মিলনের স্বপ্নে বিভোর—ত্রিদিবসৌন্দর্য্যের প্রথম বিস্মিত উপলব্ধির মুহূর্ত্তে সেই তাহার প্রেমিকের পথ-প্রদর্শিকা হইবে এই সুখচিন্তায় তাহার বক্ষ গৌরব-স্ফীত। অবশেষে যখন তাহার দীর্ঘ প্রতীক্ষা নিষ্ফল হইয়াছে তখন সে আর অশ্রুজল রোধ করিতে পারে নাই—স্বর্গের পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে তাহার অন্তরের শূন্যতা আশা-ভঙ্গের রন্ধ্রপথে অশ্রুপ্রবাহে বিগলিত হইয়াছে। স্বর্গ, ও স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী মহাশূন্যের বর্ণনায় আমরা কবির ছবি আঁকিবার, অরূপ অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে চিত্রের সুস্পষ্টরূপ দিবার, অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাই।

এই যুগে মিস্ রসেটি ছাড়া আর দুইজন মহিলা কবির নাম উল্লেখযোগ্য—শ্রীমতী ব্রাউনিং (Mrs. Browning) (১৮০৬-১৮৬১) ও এমিলি ব্রণ্ট (Emile Bronte)। ব্রাউনিং-জায়ার কবিতা তাঁহার স্বামীর সম্পূর্ণ বিপরীত—ব্রাউনিংএর তীক্ষ্ণ কৌতূহল ও অশ্রান্ত অনুসন্ধিৎসার পরিবর্ত্তে তাঁহার স্ত্রীর কবিতায় রমণীসুলভ আত্মনিবেদন, প্রেমের মধুর আত্মবিলোপ ও ঐকান্তিক আরাধনার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। মনে হয় যেন মধ্যযুগের সাধ্বী পত্নীর একনিষ্ঠতার আদর্শ, বৈজ্ঞানিক যুগের সংশয়, গণতন্ত্রবাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও অধিকারসাম্যের দাবী বর্জ্জন করিয়া, শ্রীমতী ব্রাউনিংএর কবিতায় অপরিবর্ত্তনীয়রূপে স্থির হইয়া আছে। ব্রাউনিং-দম্পতির পূর্ব্বরাগ ও প্রেম-কাহিনী রোমান্সের আদর্শ সুষমার সুরে বাঁধা; এবং যেমন তাহাদের জীবনে,

তেমনি তাহাদের কাব্যেও, এই প্রেম মোহভঙ্গের তিক্ততার দ্বারা অভিভূত না হইয়া তাহার নবীন মাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। এমিলি ব্রণ্ট জীবনযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয় লইয়া তাঁহার কবিতায় কখনও বা নির্ভীক বিদ্রোহ-ঘোষণা করিয়াছেন, কখনও বা আত্মবিস্মৃত কল্পনার আবেশে ক্ষণিক শান্তি আস্বাদন করিয়াছেন।

(৩)

উপন্যাস

বর্ত্তমান যুগে উপন্যাসেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসার হইয়াছে। মনে হয় যেন সাহিত্যিক মুখ্য প্রচেষ্টা নাটক ও কাব্য হইতে অপসারিত হইয়া উপন্যাসের খাতেই প্রবাহিত হইয়াছে। সাহিত্যে ও মনোভাবে বস্তুতন্ত্রতার প্রাধান্য খুব স্বাভাবিক কারণে কাব্য ও তথ্যানুবর্ত্তনে গঠিতদেহ এই মিশ্র ঔপন্যাসিক রূপের দিকেই ঝুঁকিয়াছে। ডিকেন্স, থ্যাকারে, জর্জ্জ এলিয়ট, চার্লট ব্রণ্ট (Charlotte Bronte), মেরিডিথ (Meredith), হার্ডি (Hardy) প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকেরা এই যুগের সমাজ-বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞান-প্রবণতার মধ্যে অনুকূল প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। উপন্যাস যে আধুনিক মনের বহু-বিস্তৃত, বিশৃঙ্খল চিন্তা-পরিধির সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা ইঁহাদেরই প্রবর্ত্তিত ধারার অনুসরণে। ইহাদের মধ্যে ডিকেন্সেরই (১৮১২-১৮৭০) সৃষ্টি-প্রাচুর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। স্নিগ্ধ পরিহাস-রসিকতা (humour), কোমল ভাব-প্রবণতা (Sentimentalism), মাত্রাতিরিক্ত সমবেদনা, উদ্ভট-কল্পনা, খেয়াল-প্রবণ, উৎকেন্দ্রিক চরিত্রদৃষ্টিতে অদ্ভুত নৈপুণ্য ও তীক্ষ্ণ সমাজ-সংস্কার প্রবৃত্তি—এই সমস্ত বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন উপাদান তাঁহার উপন্যাসে চমৎকার সমন্বয়ে মিলিত হইয়াছে। Pickwick Papersএ তাঁহার রচনারীতির বৈশিষ্ট্য প্রথম উদাহৃত হয়। পিকৃউইক একজন সরল, উদার, আত্মভোলা, জীবনের অভিজ্ঞতাহীন, সদানন্দ বৃদ্ধ। তাঁহার ভুল করার ও প্রতারিত হওয়ার

প্রবণতা অসাধারণ ; সেইজন্য তিনি পাঠকের উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। কিন্তু এই উপহাস্যতার সহিত চরিত্রের মাধুর্য্য ও গৌরব মিলিত হইয়া তাঁহাকে ঔপন্যাসিক চরিত্রাবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। অনেকে বলেন যে পিকউইক বাস্তব জগতের মানুষই নহেন ; তিনি লোক-হিতব্রত দেবদূতের মানবিক সংস্করণ ; এবং তাঁহার এই অপার্থিব দিক্‌টা চাপা দিবার জন্যই তাঁহার মধ্যে উপহাস্যতার সংযোজনা করা হইয়াছে। ডিকেন্সের অসাধারণ পরিহাস-রসিকতা পিক্‌উইকের ভৃত্য Sam Weller ও তাহার পিতা, Weller Senior-এর কৌতুকপ্রদ, সরস উক্তিসমূহের মধ্যে অফুরন্ত প্রাচুর্য্যের সহিত বিকীর্ণ হইয়াছে। অনেক খেয়ালী ব্যক্তির প্রবর্ত্তনে ও নানা হাস্যকর অবস্থার অবতারণায় উপন্যাসটী একটী হাস্যরসের সদাপ্রবাহিত নির্ঝরে পরিণত হইয়াছে। ইহাতে ইংলণ্ডের সামাজিক অবস্থার যে বিবরণ আছে, তাহা মোটের উপর তথ্যানুবর্ত্তী হইলেও উদ্ভট কল্পনার আতিশয্যের জন্য কতকটা অপরিচিত পরীরাজ্যের কাহিনীর মত শোনায়।

David Copperfield ডিকেন্সের আর একটী উচ্চাঙ্গের উপন্যাস —ইহা অনেকটা আত্মজীবন-কাহিনীর পর্য্যায়ভুক্ত। ইহাতে ডিকেন্স অতি সূক্ষ্ম একটী অন্তরালের আশ্রয়ে নিজ বাল্য ও কৈশোর জীবনের দুঃখক্লেশপূর্ণ, কঠোর পরীক্ষার কাহিনী মর্ম্মস্পর্শী করুণ রসে অভিষিক্ত করিয়া পাঠককে শুনাইয়াছেন। বয়স্ক লোকের দয়ামায়াহীন পীড়ন বালকের কল্পনার ভিতর দিয়া কিরূপ অতিরঞ্জিত আকার গ্রহণ করে, অত্যাচারী নিঃস্নেহ অভিভাবক কিরূপে এই অতিরঞ্জিত অনুভূতির বলে প্রায় রূপকথার রাক্ষসের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া দাঁড়ায় উপন্যাসটীতে ত্রুটিহীন মাত্রাজ্ঞানের সহিত তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সমস্ত উপন্যাসটী বালসুলভ কল্পনার অতিরঞ্জন-প্রবণতা, ইহার স্বপ্নে বাস্তবে মেশানো, স্থানে স্থানে প্রখরভাবে উজ্জ্বল, স্থানে স্থানে অপরিচয়ের ছায়াপাতে অস্পষ্ট, খণ্ডিত তথ্যানুভূতি, ইহার অস্বাভাবিক-রূপে তীব্র আনন্দ ও বেদনা বোধ, কৈশোর প্রেমের উদ্‌ভ্রান্ত, মদির আবেশ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ মানস অবস্থার জীবন্ত ছবির সংগ্রহ। এখানে যদিও খেয়ালী ব্যক্তির চিত্রের (Micawber, Betsey Trotwood) অভাব নাই,

তথাপি মোটের উপর ইহা লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী বলিয়া ভাব-গভীরতা ও বাস্তবগুণ, উভয় দিক দিয়াই সমৃদ্ধ।

ডিকেন্সের জীবনচিত্রণের সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে অনেক সমালোচক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পরিহাস-রসিকতা ও করুণ রসেও বিশুদ্ধির অভাব আছে। তাঁহার রসিকতা জীবনের সত্যরূপ নহে, ইহার বিকৃতি ও অতিরঞ্জনের উৎস হইতে উদ্ভূত। রসপ্রধান চরিত্রগুলি প্রায়ই একই রকমের অঙ্গভঙ্গী, আচরণ ও সঙ্কীর্ণ মানসপ্রতিক্রিয়ার জীবন-ব্যাপী বিস্তার—জীবনের বিচিত্র পরিবর্ত্তনশীলতা তাহাদের নাই। তাঁহার করুণরস সুলভ অশ্রুপ্রবণতার আতিশয্যে আর্দ্র—সংযম-ও-পরিমিতিহীন। অতিনাটকীয় অতিরঞ্জন-প্রবণতা তাঁহার গভীর রচনার আর্টকে অনেক সময় ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাসগুলিতে তাঁহার আক্রমণের অন্ধ তীব্রতা ও অসংযম তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অন্তরায় হইয়াছে ও তাঁহার নিরপেক্ষ মনোভাবের অভাব সূচিত করিয়াছে। তথাপি এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি বিস্ময়াবহ সৃষ্টি-প্রতিভার অধিকারী—তাঁহার সৃষ্ট অসংখ্য নরনারী, তুলির দুই একটী অযত্নবিন্যস্ত আঁচড়ে, দুই এক ফোঁটা রংএর যদৃচ্ছ প্রক্ষেপে, পাঠকের মনে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে ও গুণবাচক নূতন সংজ্ঞা-প্রবর্ত্তনের হেতু হইয়াছে। অগভীর বিশ্লেষণ ও চিন্তাশক্তির অপ্রাচুর্য্য সত্ত্বেও তিনি জীবনস্পন্দনের নিগূঢ় রহস্য, প্রকৃতির মূলমন্ত্র, কোন অজ্ঞাত উপায়ে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। লণ্ডনের রাজপথ, অলি-গলি, দরিদ্র-অধ্যুষিত পল্লীসমূহ, মুটে-মজুর-ভবঘুরে জাতীয় চরিত্র প্রভৃতি নিম্নস্তরের ব্যক্তি ও প্রতিবেশ তাঁহার উপন্যাসে জীবনের বৈদ্যুতী-স্পর্শে প্রাণবান্। এই অনায়াসলব্ধ সৃষ্টিশক্তি-প্রাচুর্য্যে তিনি শেক্স-পীয়ারের সমকক্ষ না হইলেও সমগোত্রীয়।

অনেক বিষয়ে থ্যাকারে (১৮১১-১৮৬৩) ডিকেন্সের বিপরীত-ধর্ম্মী। থ্যাকারে প্রধানতঃ অভিজাত ও ধনী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জীবনসমস্যা আলোচনা করিয়াছেন—দরিদ্র ও নিম্নশ্রেণীর লোক সম্বন্ধে তিনি আগ্রহশীল নহেন। ডিকেন্সের হাস্য ও করুণরসের স্থূলতা ও আতিশয্যের পরিবর্ত্তে তিনি মার্জ্জিত শ্লেষ ও সংযত, পরিমিত ভাবাবেগের অধিকারী। সৃষ্টিশক্তির প্রাচুর্য্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তিতেই তাঁহার প্রাধান্য।

ডিকেন্স অপেক্ষা তাঁহার জনপ্রিয়তা যেরূপ কম, শিল্পসচেতনতা সেইরূপ বেশী। তাঁহার একটি দোষ এই যে তিনি তাঁহার আখ্যায়িকাকে মন্তব্যবাহুল্য ও সুদীর্ঘ নীতিপ্রচারের দ্বারা ভারাক্রান্ত করেন—পাঠকের ধারণাকে নিরপেক্ষ স্বাধীনতার সহিত স্ফূর্ত্ত হইতে দেন না। লেখকের এইরূপ বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ, এইরূপ প্রচার-প্রবণতা ঔপন্যাসিক রসস্ফূর্ত্তিকে অনেক সময় ব্যাহত করিয়াছে। অবশ্য ঔপন্যাসিক নাট্যকারের মত সম্পূর্ণ আত্মসংহরণ করিতে বাধ্য নহেন, তথাপি তাঁহার নিজস্ব উপস্থিতি যেন অশোভনরূপে উগ্র না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

থ্যাকারেকে সাধারণতঃ cynic বা মানবচরিত্রের মহত্ত্বে অনাস্থাশীল আখ্যায় অভিহিত করা হয়। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'Vanity Fair'এ তিনি যেরূপ চরিত্র আঁকিয়াছেন তাহাতে এইরূপ প্রতীতি জন্মানই স্বাভাবিক। ইহাতে তিনি অভিজাত ও আভিজাত্য-মোহগ্রস্ত সমাজের অতি তীক্ষ্ণ-শ্লেষপূর্ণ ছবি দিয়াছেন—তাহার ভণ্ডামি, অন্তঃসারশূন্যতা, কৃত্রিম শিষ্টাচারের ছদ্মবেশে ইতর রুচি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতি স্থূল লোলুপতা প্রভৃতি দোষ নির্ম্মম-ভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। ইহার একটি চরিত্রও আমাদের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি অর্জ্জন করিতে পারে না। তীক্ষ্ণবুদ্ধির সহিত চরিত্রহীনতা ও সচ্চরিত্রের সহিত বুদ্ধির জড়তার সংমিশ্রণ হইয়াছে। আধুনিক সমাজ বীর-প্রসবিনী নয়, ভালমন্দে মেশানো সাধারণ নর-নারীর সমষ্টি মাত্র—তাঁহার জীবন-চিত্রণের বৈশিষ্ট্য হইতে মোটামুটি এই ধারণাই জন্মায়। কিন্তু তাঁহার সমগ্র রচনা মনোযোগ দিয়া পড়িলে এই ধারণার পরিবর্ত্তন হয়। থ্যাকারের হৃদয়ে দয়া, সমবেদনা প্রভৃতি কোমল বৃত্তিসমূহের অভাব ছিল না। তিনি ডিকেন্সের মত কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিতেন না সত্য, কিন্তু জীবনমধ্যে প্রবাহিত স্নিগ্ধ অশ্রুনির্ঝর সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন ছিলেন তাহা তাঁহার Colonel Newcomeএর মৃত্যু-বর্ণনার দৃশ্যে প্রমাণিত হইয়াছে। বয়সবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সহিত থ্যাকারে জীবনের উপরিভাগের ঈষৎ কষায় স্বাদের স্তর অতিক্রম করিয়া ইহার গভীর তলদেশের বিশুদ্ধ মাধুর্য্যময় স্তরের সহিত পরিচিত হইয়াছেন; এবং তাঁহার ব্যঙ্গপ্রধান মনোবৃত্তি শ্রদ্ধাপূর্ণ বিস্ময়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাঁহার Esmond উপন্যাসে নায়কের উদার,

ক্ষমাস্নিগ্ধ চরিত্র কোন সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি, সন্দিগ্ধচেতা, মানব-মহিমায় অবিশ্বাসী লেখকের সৃষ্টি হইতে পারে না। Esmond উপন্যাসটী ঐতিহাসিক কল্পনার সার্থক প্রয়োগের চমৎকার উদাহরণ। ইহাতে অষ্টাদশ শতকের রীতি-নীতি, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাবের বৈশিষ্ট্য, এমন কি সেই শতাব্দীর আকাশ-বাতাস ও প্রচলিত সাহিত্যিক ভাষা পর্য্যন্ত নিখুঁতভাবে অনুসৃত হইয়াছে।

জর্জ্জ এলিয়ট (১৮১৯—১৮৮০) স্ত্রী ঔপন্যাসিক মেরি অ্যান ইভানসের ছদ্ম নাম। জেন অষ্টেনের পরে তিনি প্রধান মহিলা ঔপন্যাসিক। তাঁহার প্রগাঢ় মনস্তত্ত্বজ্ঞান, দার্শনিক পাণ্ডিত্য ও তীক্ষ্ণ নীতিবোধ ছিল। তিনি মধ্য শ্রেণীর অতি সাধারণ নরনারীর জীবনে তীব্র ভাবাবেগ ও মানস সংঘর্ষ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। শিশু-চিত্র-অঙ্কনে তাঁহার স্নেহবিগলিত, কোমল হৃদয়ের ছাপ পড়িয়াছে—স্ত্রী-চরিত্র-অঙ্কনেও তিনি পুরুষের অনধিগম্য সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসে এইরূপ রমণীসুলভ, কোমল স্পর্শ কোন কোন সূক্ষ্ম অনুভূতিপূর্ণ পাঠককে তাঁহার সত্য পরিচয়ের সূত্র ধরাইয়া দিয়াছিল। তাঁহার গ্রাম-সমাজ ও কৃষক পরিবারের ছবিগুলি অকৃত্রিম সহানুভূতি, স্নিগ্ধ রসিকতা, ও গ্রাম্য লোকের মূঢ় ও সঙ্কীর্ণ গেঁয়োমির সরস উপলব্ধির সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। যতদিন তাঁহার উপন্যাসের বিষয় তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, ততদিন তাঁহার রচনার সরলতা ও প্রসাদ-গুণ অক্ষুণ্ণ ছিল। যখন তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন তখন তাঁহার উপন্যাসগুলি রীতিমত সমস্যা-বিড়ম্বিত ও পাণ্ডিত্য-কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সুতরাং তাঁহার শেষের দিকের উপন্যাসগুলির মধ্যে জনপ্রিয়তা ও জীবনীশক্তি উভয়েরই অভাব অনুভূত হয়।

জর্জ্জ এলিয়টের মধ্যে নীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাঁহার উপন্যাসে নীতিবিধানের এরূপ অমোঘ কার্য্যকারিতা যে অপরাধ করিয়া কাহারও নিস্তার নাই। সামান্যমাত্র দুর্ব্বলতা, বিন্দুমাত্র কর্ত্তব্যচ্যুতি ধীরে ধীরে বিষের মত সমস্ত চরিত্রে পরিব্যাপ্ত হইয়া ইহাকে পঙ্গু ও বিকৃত করিয়া ফেলে। চরিত্রের এই ক্রমিক অবনতি ও প্রলোভনের সম্মুখে অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটাইয়া তুলিতে জর্জ্জ এলিয়ট বিশেষভাবে সিদ্ধহস্ত। Adam Bedeএ

আর্থার হেটির মত চপলমতি বালিকাকে প্রলোভনে ফেলিয়া তাহাকে রসাতলে ঠেলিয়া দিয়াছে। Silas Marnerএ গড্‌ফ্রে তাহার গোপন বিবাহ অস্বীকার করিয়া নিঃসন্তান, নিরানন্দ জীবন যাপনে বাধ্য হইয়াছে—তাহার পরিত্যক্তা স্ত্রীর সন্তান Eppie তাহার পিতৃত্ব অস্বীকার করিয়া তাহার প্রথম যৌবনের কাপুরুষতার প্রায়শ্চিত্তের হেতু হইয়াছে। সাইলাসের জীবনে প্রচণ্ড আঘাতের ফলে তাহার সমস্ত সুস্থ মানবিকতার নিষ্পেষণ ও নিরোধ, ও শিশুকে ভালবাসিয়া ইহার পুনরুদ্ধারের চিত্র, গভীর মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দেয়। Romolaতে Tito কর্ত্তব্যচ্যুতির পিচ্ছিল পথে ক্রমাবরোহণের ফলে অবনতির নিম্নতম বিন্দু স্পর্শ করিয়াছে। এইরূপে মানবজীবনের নৈতিক দায়িত্বের গুরুত্ব জর্জ্জ এলিয়ট অতি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন।

তাঁহার সমসাময়িকেরা জর্জ্জ এলিয়টের পাণ্ডিত্যে ও বিশ্লেষণ-গভীরতায় অভিভূত হইয়া তাঁহাকে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিল। এখন তাঁহার সে প্রতিষ্ঠা আর নাই। অনেকে মনে করেন যে জীবনকে বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তিনি ইহার হৃৎ-স্পন্দনের রহস্যটি হারাইয়া ফেলিয়াছেন—তিনি জীবনের পরিবর্ত্তে ইহার একটা অতি সুনিয়ন্ত্রিত, সঙ্কীর্ণ নিয়মের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ, কৃত্রিম পরিকল্পনা দাখিল করিয়াছেন। পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণের আতিশয্য সব সময় যে সৃষ্টি-প্রতিভার অনুকূল নহে, জর্জ্জ এলিয়টের উপন্যাসাবলী তাহার উদাহরণ।

ব্রন্ট-ভগিনীদের (The Bronte Sisters) উপন্যাসে বিক্ষুব্ধ, নিপীড়িত আত্মার বিদ্রোহ ঘোষণা, স্ত্রীজাতির পূর্ণতর জীবনের অধিকার অসঙ্কোচ তীব্রতার সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিন ভগিনী, Emile, Charlotte, ও Anne তাহাদের সারাজীবন এক নিরানন্দ, দারিদ্র্যের অশ্রান্ত সংগ্রাম ও পুঞ্জীভূত গ্লানিতে বিকৃত, প্রতিবেশের মধ্যে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রেমের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সমাজের বিরুদ্ধে বদ্ধমূল ক্ষোভ ও অভিমান জীবনে নিরুদ্ধ ছিল; কিন্তু উপন্যাসে ইহা আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবের ন্যায় জ্বালাময়ী ভাষায় ফাটিয়া পড়িয়াছে। Charlotteর (১৮১৬—১৮৫৫) উপন্যাসাবলীর নায়িকারা দরিদ্র, রূপহীনা শিক্ষয়িত্রী শ্রেণীর নারী; জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, অবদমিত ইচ্ছার উত্তাপে তাহাদের অন্তরের

মাধুর্য্য ঝলসাইয়া গিয়াছে। তাহাদের জীবনে যখন প্রেম আসে, তখন ইহা সর্ব্বনাশী, দুর্ব্বার বন্যাস্রোতের মত তাহাদের সমস্ত সংযম ও শিষ্টাচারের বন্ধন ভাসাইয়া লইয়া যায়। প্রেম বিষয়ে স্ত্রীজাতির নিষ্ক্রিয়ত্বের, আত্মনিরোধের যে সনাতন আদর্শ সমাজ-প্রচলিত, ব্রণ্ট ভগিনীরা স্পর্দ্ধাভরে তাহাকে অস্বীকার করিয়াছেন। জর্জ্জ এলিয়টের উপন্যাসে নারীত্বের যে স্পর্শ বাৎসল্যরসের বিগলিত স্নেহ ও সাংসারিক জীবনের সূক্ষ্ম, সহানুভূতিপূর্ণ চিত্রণে পরোক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ব্রণ্ট ভগিনীদের উপন্যাসে তাহা অবরুদ্ধ কামনার অনবগুণ্ঠিত প্রকাশে, অধিকার-সাম্যের দৃপ্ত সমর্থনে ও সমাজ-বৈষম্যের প্রতি অভিমান-ক্ষুব্ধ অনুযোগে আপনাকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইঁহাদের অবরুদ্ধ বাষ্পনিষ্কাশনের ফলে স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের আবহাওয়া পরিষ্কার ও ভাবাবেশবর্জ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর বিশেষভাবে নারী-জাতির পক্ষাবলম্বন করিয়া, তাহার দৃষ্টিকোণ হইতে উপন্যাস লেখার প্রয়োজন হয় না। পাশ্চাত্য নারীর আজ আর বিশেষ সমস্যা নাই; সে আজ পুরুষের সমগোত্রীয় ও সম্পূর্ণ মানব সমাজেরই একটা অবিভক্ত অংশ।

মেরিডিথ (১৮২৮-১৯০৯) ও হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮), ভিক্টোরীয় যুগ অতিক্রম করিয়া আধুনিক যুগে পদক্ষেপ করিয়াছেন, তথাপি মোটামুটি তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানস বৈশিষ্ট্য পূর্ব্বতন যুগের। মেরিডেথের বিশ্লেষণ অতি-পল্লবিত ও ভাষা অতি-সংক্ষেপের জন্য দুর্ব্বোধ্য। তাঁহার মন্তব্য ঘটনাকে ছাড়াইয়া যায় ও সময় সময় উহাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে। তাঁহার মননশক্তির তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ-ছটায় চোখ ধাঁধিয়া যায় ও ঘটনার পারম্পর্য্যবোধ অচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তথাপি তাঁহার তিনখানি উপন্যাসে 'The Ordeal of Richard Faverel,' 'Diana of the Cross-ways' ও 'The Egoist'এ যথার্থ ঔপন্যাসিক প্রতিভার নিদর্শন মিলে। প্রথম উপন্যাসে ভাগ্য-বিড়ম্বিত কৈশোর প্রেম, দ্বিতীয়ে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রজালের কুটিল প্রভাবে প্রেমের আদর্শচ্যুতি ও তৃতীয়টীতে প্রতি মানুষের মনে সূক্ষ্ম, অনতিক্রমণীয় আত্মাভিমানবোধ গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টিপূর্ণ আলোচনার সাহায্যে বর্ণিত ও বিশদীকৃত হইয়াছে।

সমগ্র ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠীর মধ্যে হার্ডির ন্যায় আর কেহ অবিমিশ্র কাব্য-মনোভাব লইয়া উপন্যাস-রচনায় ব্রতী হন নাই। তিনি জীবনকে ক্রূর দৈবের অসহায় ক্রীড়নকরূপে, গভীর দুঃখবাদের ভিত্তিভূমিরূপে দেখিয়াছেন। অদৃষ্ট মানুষের ক্ষুদ্রতম ভুলভ্রান্তির সহিত চরম শাস্তির সংযোগ ঘটাইয়া তাহার জীবনকে এক দুর্ভেদ্য রহস্যজালে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে, গ্রীক ট্রাজেডির ন্যায়, নিয়তির এই দুর্জ্ঞেয় বিধান, মানবজীবনের এই অপ্রতিবিধেয়, বিষাদময় পরিণতি অনবদ্য সৌন্দর্য্য ও তীব্রশ্লেষাত্মক বেদনাবোধের সহিত অভিব্যক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতির সহিত মানব-মনের নিগূঢ় ভাব-বিনিময়ের যে কবিত্বময়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সর্ব্বপ্রথম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই হার্ডির উপন্যাসে ব্যাপক ঘটনার বৃহত্তর পরিধির মধ্যে, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি উদাহরণের সাহায্যে, নূতন প্রসার ও অর্থগৌরব লাভ করিয়াছে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায় যাহা মুহূর্ত্তের উপলব্ধি, হার্ডির উপন্যাসে তাহা জীবনব্যাপী প্রভাবরূপে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রাবলীর গতি ও প্রকৃতি নির্দ্ধারিত করিয়াছে। হার্ডির উপন্যাস, যন্ত্রসভ্যতার বাহন, শিল্প-বাণিজ্য-প্রধান উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে সুদূর অতীতের যে সমস্ত লুপ্তাবশেষ চিহ্ন এখনও টিঁকিয়া আছে তাহাদিগকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া আমাদের মনে এক নূতন বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। আদিম কাল হইতে অপরিবর্ত্তিত, প্রাগৈতিহাসিক বর্ব্বরতার প্রতীক ও সমসাময়িক Egdon Heathএর বিশাল, অকর্ষিত প্রান্তর মানবমনের অন্ধসংস্কার, দুর্ব্বার প্রবৃত্তি ও উচ্ছেদাতীত রহস্যানুভূতির শেষ আশ্রয়-ভূমি-রূপে হার্ডির উপন্যাসাবলীর কেন্দ্রস্থল অধিকার করিয়া আছে। এই অব্যক্ত, ভয়াবহ রহস্যের আধার, মৌন জড়প্রকৃতির অন্তরা হইতে ইহার সন্নিহিত মানব জীবনের উপর এক দুরতিক্রম্য কুটিল, অশুভ প্রভাব বিচ্ছুরিত হইয়াছে। হার্ডির পরিকল্পনা ও আলোচনার প্রণালী কাব্য-ধর্ম্মী; তাঁহার এক একটী উপন্যাস যেন মহাকাব্যের সুদূর-প্রসারী পটভূমিকার উপর গীতি-কবিতার ঘন-নিবদ্ধ অর্থব্যঞ্জনার সার্থক প্রয়োগ।

(৪)

গদ্য সাহিত্য

উনবিংশ শতকে গদ্য, বাক্যচন্দে সংক্ষিপ্ত ও সরস হইয়া, পদ্যের ধ্বনিপ্রবাহ, ব্যঞ্জনাশক্তি ও ভাবোচ্ছ্বাস ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আত্মসাৎ করিয়াছে। অষ্টাদশ শতকে গদ্য, পদ্যের বহিরবয়বের অতিবিস্তার বর্জ্জন করিয়া, দৃঢ়বদ্ধ সংহতি অর্জ্জন করিয়াছিল; কিন্তু বার্ক প্রভৃতি দুই একটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, কোন গদ্যলেখকই বিষয়ে ও ভাবাবেগে, পদ্যের সমকক্ষতাস্পর্দ্ধী হন নাই। ভিক্টোরীয় যুগের সমস্ত কাব্য-প্রবণতা ছন্দোবদ্ধ কবিতার মধ্যে নিঃশেষিত হয় নাই; কবিতার কড়া আইন-কানুনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট রূপ, ও নিয়ত উর্দ্ধলোক-বিহারী ভাবগ্রামের মধ্যে এই প্রয়োজন-ধর্ম্মী যুগ নিজ সার্থক ও অপরিহার্য্য প্রকাশরীতির সন্ধান পায় নাই। কাজেই ইহার বাড়তি ভাবাবেগের সঞ্চয় কবিতার গণ্ডী ছাপাইয়া গদ্যের অপেক্ষাকৃত অগভীর প্রণালী দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই যুগের প্রধান গদ্যলেখক—কার্লাইল ও রাস্কিন—কাব্যধর্ম্মী, ভাবগভীরতার প্রেরণায় চঞ্চল ও প্রকাশাতীতের ব্যঞ্জনায় রহস্যময় গদ্য ভাষায় রচনা করিয়াছেন। কার্লাইলের (১৭৯৫—১৮৮১) ভাষা প্রচলিত গদ্য-রীতির সমস্ত শৃঙ্খলাকে অস্বীকার ও বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। তাঁহার হৃদয়াবেগ উষ্ণ গৈরিকস্রাবের ন্যায়, প্রচণ্ড ঘূর্ণীবায়ুর ন্যায়, ভাষাকে নিজ নিগূঢ় গতিবেগের ছন্দে, অন্বয়ের সমস্ত পারম্পর্য্য বিধ্বস্ত করিয়া, নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। এই ভাষাতে অভিব্যক্ত ক্রোধ বিদ্যুৎছটার ন্যায় স্পর্শমাত্র দগ্ধ করে; ইহার করুণা হৃদয়কে বিগলিত করে; ইহার বিষাদ মেঘভারাবনত আকাশের ন্যায় মনকে আচ্ছন্ন করে; ইহার বিশ্ববিধান-রহস্যের উদ্‌ঘাটন মন্ত্রবাণীর ন্যায় অমোঘ শক্তিতে হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতির সমর্থন লাভ করে। তাঁহার "ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস" তথ্যবিবৃতি বা কারণ-বিশ্লেষণ নহে; ইহা যেন সুসজ্জিত চিত্রশালায় রক্ষিত বর্ণোজ্জ্বল, সাঙ্কেতিকতার প্রতিভাসে গূঢ়ার্থ চিত্রসমষ্টি। এক একটি ঘটনা যেন মানুষের অগ্নিপরীক্ষার জন্য ভগবানের স্বহস্ত-প্রজ্বলিত চিতানলের এক

একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। 'ইতিহাসের প্রত্যেকটি সংঘটন, ভাবের উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া, কল্পনার ইন্দ্রধনুবর্ণে রঞ্জিত হইয়া, তাহার স্থূল বস্তুতন্ত্রতা হারাইয়াছে; তাহাদের অর্দ্ধস্বচ্ছ আবরণের ভিতর দিয়া দিব্যদৃষ্টির রঞ্জন-রশ্মিপ্রয়োগে, বিশ্ববিধানের মর্ম্মরহস্য' উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। গণতন্ত্র, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ও বাণিজ্যবিস্তার—এই ত্রিবিধমোহগ্রস্ত ভিক্টোরীয় যুগকে কার্লাইল যে ন্যায়নীতি ও আত্মবোধের বাণী শুনাইয়াছিলেন তাহা আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হইয়াছে মনে হয়। কিন্তু এই শাশ্বত নীতি উপেক্ষা করার যে কি সাংঘাতিক পরিণাম তাহা অতি স্বল্প ব্যবধানে দুই বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের পুনরাবৃত্তিতে প্রমাণিত হইতেছে।

রাস্কিন (১৮১৯-১৯০০) চিত্রকলার সমালোচকরূপে প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্য যুগে যুগে চিত্রশিল্পীর সৃষ্টিতে কি বিভিন্ন রীতিতে অঙ্কিত হয়, রাস্কিন সুললিত, ধ্বনিমাধুর্য্যপূর্ণ গদ্যে সেই রহস্যের অনুপম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সমস্ত শিল্পসৃষ্টির পিছনে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন দায়িত্বহীন সৌন্দর্য্যবিলাস নহে, এক প্রচ্ছন্ন-গভীর নীতিবোধ ও জীবনদর্শনের প্রতিচ্ছায়া। যুগে যুগে চিত্র, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য প্রভৃতি চারুশিল্পের রীতিবৈচিত্র্য স্বচ্ছ মুকুরের ন্যায় জাতির নৈতিক জীবনের উন্নতি-অবনতির ভিন্ন ভিন্ন স্তর প্রতিবিম্বিত করে। জাতির যদি বহির্ঘটনামূলক ইতিহাস নাও থাকিত, তথাপি ইহার চারুশিল্প হইতে ইহার অন্তর্জীবনের কাহিনী, ইহার আদর্শবাদের বৈশিষ্ট্যটী পুনরুদ্ধার করা যাইত। আর্টের সঙ্গে নীতিবোধের এই অচ্ছেদ্য নিবিড় সম্বন্ধ—ইহাই রাস্কিনের খুব মূল্যবান্ আবিষ্কার। মধ্যযুগের মন্দিরের আকাশচুম্বী চূড়া ইহার আধ্যাত্মিক অভীপ্সার দ্যোতক; রেনাসাঁস বা নবজাগরণের যুগের স্থাপত্যশিল্পের প্রসাধন-বাহুল্য ইহার জড়বাদ-প্রধান ভোগলিপ্সার পরিচয়। এইরূপে ছবিতে ও মন্দিরে, প্রস্তরমূর্ত্তি ও গৃহনির্ম্মাণ-রীতিতে প্রত্যেক যুগ ইহার মানস প্রবণতার অবিনশ্বর সত্যস্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়াছে।

খুব স্বাভাবিক বিবর্ত্তন-ধারার অনুসরণ করিয়াই রাস্কিন শিল্পবিচার হইতে আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনায় আসিয়া পড়িয়াছেন। আধুনিক শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রীতে সৌন্দর্য্যের অভাব, প্রয়োজনের খাতিরে সুষমাকে

বলি দিবার প্রবণতা, জাতীয় চরিত্রে সুকুমার সৌন্দর্য্যবোধের বিলোপের বহিঃপ্রকাশ। কলকারখানার যান্ত্রিক উৎপাদনে না আছে শিল্পজ্ঞান, না আছে শিল্পীর আত্মমর্য্যাদাবোধ ও আনন্দ—আছে কেবল প্রয়োজনের তাগিদ ও সস্তার সুবিধাবাদের নিকট শিল্পসৃষ্টির সম্পূর্ণ অধীনতা স্বীকার। সুতরাং যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই প্রয়োজনের নিকট বশ্যতা সম্ভবপর হইয়াছে, যাহাতে মুনাফার প্রতি অতিরিক্ত লোভ নীতি ও সৌন্দর্য্যবোধের প্রতি নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিয়াছে, তাহাই লেখকের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে সৌন্দর্য্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রধান অন্তরায় এই ধনতন্ত্রমূলক সমাজ-ব্যবস্থা। সুতরাং রাস্কিন এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নীতিবিদ্ ও সৌন্দর্য্য-পিয়াসীর যুগ্ম প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়াছেন—কঠোর ন্যায়নিষ্ঠা ও গভীর ভাবাবেগের সহিত এই মরণধর্ম্মী শোষণক্রিয়ার মূলোচ্ছেদ করিতে চাহিয়াছেন। অবাধ প্রতিযোগিতার বাহ্যতঃ উদার ও ন্যায়নিষ্ঠ নীতির পিছনে যে বর্ব্বর পশুবল, অসহায়ের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে, রাস্কিন তাহার ছদ্ম আবরণ ভেদ করিয়া তাহার নগ্ন বীভৎসতা উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। ভাবের দিক্ দিয়া রাস্কিন্ আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের একজন অগ্রদূত। তাঁহার গদ্য-রচনা আবেগপ্রধান মনোভাবের জন্য কাব্য-ধর্ম্মী—যাঁহারা কবিত্বগুণপ্রধান গদ্য (poetic prose) ব্যবহার করিয়াছেন তিনি তাহাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। কার্লাইলের ভাষার মত তাঁহার ভাষার দাহকারী শক্তি, মর্ম্মভেদী তীব্রতা বা অন্বয়-বিধ্বংসী প্রচণ্ড গতিবেগ নাই ; তাঁহার অক্ষুণ্ণ শিল্প-সৌন্দর্য্যবোধ গভীর ভাবাবেগের উত্তেজনা সত্ত্বেও রচনারীতির মসৃণ সুষমার ছন্দ হইতে বিচলিত হয় নাই। এই গদ্য একাধারে তাঁহার শক্তিমত্তা ও দুর্ব্বলতার নিদর্শন। ভাষার সৌন্দর্য্য অনেক সময় তাঁহার ভাবের তীব্রতাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে—তাঁহার রোষবহ্নি মসৃণ আধারে সুরক্ষিত হওয়ার জন্য কার্লাইলের মত আকাশস্পর্শী শিখায় জ্বলিয়া উঠে নাই। কার্লাইলের মত ভবিষ্যদ্-দ্রষ্টার অসন্দিগ্ধ আত্মপ্রত্যয়, অনাগত-প্রত্যক্ষকারী দিব্যদৃষ্টির অকম্পিত স্থিরতা তাঁহার ছিল না—তথাপি তাঁহার রচনায় prophet-এর সহিত কবি ও কলাবিদের সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে।

ম্যাথিউ আর্নল্ড কবি ও গদ্যলেখক এই উভয় প্রকারেরই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন—উভয়বিধ রচনাতেই তাঁহার তুল্যরূপ সিদ্ধহস্ততা। সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে তিনি অনেক স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্যিকের উপর নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই আলোচনায় মাঝে মাঝে গভীর অন্তর্দ্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম রসবোধ ও শোভন, পরিমিত প্রকাশ-ভঙ্গীর নিদর্শন পাওয়া যায়। "কবিতা জীবন-সমালোচনা" (Poetry is the criticism of life)—তাঁহার এই স্মরণীয় উক্তি প্রবাদ-বাক্যে দাঁড়াইয়াছে ; যাঁহারা কাব্যে জীবনের সহিত নিঃসম্পর্ক সৌন্দর্য্যলীলার পক্ষপাতী, ইহা তাঁহাদের বিরুদ্ধ মতবাদের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। কীট্‌স ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার তুলনামূলক সমালোচনা উপলক্ষে তিনি 'প্রকৃতির ইন্দ্রজাল' (nature-magic) ও 'নৈতিক আবেদনের গভীরতা (moral profundity)—বিভিন্ন প্রকৃতির কাব্যের এই দুইটি মূলসূত্রের চমৎকার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তথাপি মনে হয় যে তাঁহার সমালোচনা কাব্যরহস্যের গভীরতম উৎস পর্য্যন্ত পৌঁছায় না ; তিনি মূল কাব্য অপেক্ষা ইহার প্রতিবেশের উপরই বেশী জোর দেন। সময় সময়—যেমন শেলীর কাব্যবিচারে—তাঁহার ব্যক্তিগত রুচি ও মতবাদের আদর্শে কবিকে বিচার করিয়া তিনি সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কীট্‌সের উপর লিখিত প্রবন্ধে কবিতার রসবিচার অপেক্ষা কবির জীবন-সমস্যা অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। ক্লাসিকাল যুগের মানস আদর্শের প্রতি অতি-পক্ষপাত বশতঃ তিনি রোমান্টিক কাব্যের প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই।

তাঁহার সমাজ-সমালোচনার নিবন্ধসমূহের মধ্যে "Culture an Anarchy" সুপরিচিত। এই গ্রন্থে তিনি ইংরেজ সমাজের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভ ব্যবহারিক সাফল্যের একনিষ্ঠ অনুসরণ, ইহার উদার চিন্তা ও সংস্কৃতির অভাব, সৌন্দর্য্যবোধ ও সুরুচির ন্যূনতার প্রতি মার্জ্জিত শ্লেষ প্রয়োগ করিয়াছেন। তিনি কর্ম্মোদ্যম ও সঙ্কীর্ণ নীতিবাদ অপেক্ষা উদার, নিরাসক্ত জ্ঞান, মানবিক বিকাশের সর্ব্বাঙ্গীণতাকে কাম্যতর আদর্শ বলিয়া মনে করেন। তথাপি এই গ্রন্থেও তাঁহার মানস প্রসারের অভাব ধরা পড়িয়াছে—একই রকম যুক্তি ও শ্লেষভঙ্গীর পৌনঃপুনিক প্রয়োগ ভাবের অপ্রাচুর্য্য, বৈচিত্র্য ও

উদ্ভাবনী শক্তির রিক্ততা সূচিত করে। তিনি সমাজের মধ্যে মাধুর্য্য ও আলোক-বিকীরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বারবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার নিজের রচনায় উক্ত দুইটী গুণের যে বিশেষ প্রাচুর্য্য আছে বলিয়া মনে হয় না। সেখানে আমরা পাই মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে ঈষৎ অম্লরসাত্মক ব্যঙ্গ ও আত্মপ্রসাদপূর্ণ বিচারক-মনোভাব, আর আলোক যেটুকু পাই তাহা একদেশদর্শিতার ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথ হইতে বিচ্ছুরিত। মনে হয় যে ম্যাথিউ আর্নল্ড গদ্যলেখক অপেক্ষা কবি হিসাবেই ভবিষ্যৎযুগের নিকট পরিচিত হইবেন।

অন্যান্য গদ্য-লেখকদের মধ্যে মেকলে (Macaulay) (১৮০০—১৮৫৯), নিউম্যান, (১৮০১—১৮৯০), মিল (Mill) (১৮০৬—১৮৭৩) ও বৈজ্ঞানিক হাক্সলি (Huxley) (১৮২৫-১৮৯৫) উল্লেখযোগ্য। মেকলের রচনা ভিক্টোরীয়যুগের আত্মপ্রসাদের মূর্ত্ত বিকাশ, ইহার ক্রমবর্দ্ধমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও শিল্প-বাণিজ্যপ্রসূত ঐশ্বর্য্যের জয়গানে মুখর। এই সাড়ম্বর পরিতৃপ্তিবোধের মধ্যে সংশয়ের ক্ষীণতম সুরও শোনা যায় না। তাঁহার আত্মপ্রত্যয়বোধে দৃপ্ত, ধাতব ঝঙ্কারে প্রতিধ্বনিত, মসৃণোজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ বাক্যপরম্পরা যেন ভিক্টোরীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিজয়-অভিযানের রথচক্রনির্ঘোষ। ইহাদের মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক আত্মজিজ্ঞাসা, কোন দুরধিগম্য ভাবের জোয়ার-ভাটা, বা সূক্ষ্মতর সঙ্গীতধ্বনিপ্রবাহ অনুভূত হয় না। মেকলের গদ্য আগাগোড়া বক্তৃতার সুরে বাঁধা। নিউম্যানের (Newman) গদ্য সূক্ষ্মভাবের অনুরণনে ও অধ্যাত্ম অনুভূতিতে মেকলের গদ্যের বিপরীতধর্ম্মী। তাঁহার 'Apologia'তে বা নিজ ধর্ম্মমত-পরিবর্ত্তনের বিবরণমূলক আত্মকাহিনীতে ও "Ideal of a University" নিবন্ধে তাঁহার প্রসাদগুণ, যুক্তিবাদ-শৃঙ্খলা, অধ্যাত্ম চিন্তাধারার যথাযথ অভিব্যক্তি ও সূক্ষ্ম ভারসাম্যবোধের (balance) প্রচুর নিদর্শন মিলে। কিন্তু তথাপি তাঁহার রচনা সমগ্রভাবে পাঠ করিলে একটা অতৃপ্তি রহিয়া যায়। তাঁহার ভাবাবেগ কোথাও ইহার ধীরগতি ও মন্দপ্রবাহের যতিভঙ্গ করিয়া প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই—তাঁহার অধ্যাত্ম অনুভূতি যুক্তিতর্কের' সচেতনতা ছাড়াইয়া ধ্যান-তন্ময় আবেশে পৌঁছায় নাই। মনে হয় যেন তাঁহার জীবনীশক্তির অপ্রাচুর্য্যই এই আবেগ-বিমুখতার কারণ।

মিল ও হাক্সলি রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনায় সাহিত্যিক গুণের প্রাচুর্য্য দেখাইয়াছেন। মিলের "Liberty of Thought and Discussion" ও "Subjection of Women" গ্রন্থদ্বয়ে নিছক যুক্তিবাদ যে সাহিত্যিক পদবীতে আরূঢ় হইতে পারে, চিন্তার জড়িমাহীন সুস্পষ্টতা যে ভাষার স্বচ্ছতা ও প্রসাদ-গুণে মণ্ডিত হইয়া উঠে তাহা প্রমাণ হইয়াছে। হাক্সলিও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনায় অনুরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বও তাঁহার ভাষার কল্যাণে সহজবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ভিক্টোরীয় যুগের গদ্য-লেখকেরা গদ্যের বৈচিত্র্য, প্রসার, নানাভাব-প্রকাশ ও নানা বিষয়-আলোচনার পক্ষে ইহার উপযোগিতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যেমন এই যুগে উপন্যাস কাব্যের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, ঠিক সেইরূপে গদ্য কবিতা অপেক্ষা অধিকতর প্রভাবশালী হইয়া উঠিয়াছে। এই যুগে এবং ইহার পরবর্ত্তী যুগে কবিতা নিজ কল্পনাপ্রধানতা ও ভাবাবেগসমৃদ্ধি হারাইয়া ক্রমশঃ গদ্যের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে—কাব্য গদ্যধর্ম্মী হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্য

(১)

রাণী ভিক্টোরিয়ার দেহাবসানের সঙ্গে সঙ্গে শতাব্দীর ও একটী সাহিত্যিক যুগেরও অবসান হইল (১৯০১)। ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যে যে আত্মপ্রসাদ ও আদর্শের দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত ঐক্য বিরাজ করিতেছিল, নূতন শতাব্দীতে তাহা ধীরে ধীরে শিথিল ও লুপ্ত হইয়া আসিল। রাজ্যবিস্তার, বাণিজ্যসমৃদ্ধি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা যে সর্ব্বসুখের আকর নহে, তাহাদের মধ্যেও যে নূতন নূতন জটিল সমস্যা উদ্ভূত হয়, এই সত্য ধীরে ধীরে জাতির চেতনায় প্রতি-ফলিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বের স্থির, নিঃসংশয় আত্মপ্রত্যয়ের স্থলে আবার

সন্দেহবাদ ও জিজ্ঞাসামূলক মনোবৃত্তির প্রাধান্য স্থাপিত হইল। ধনিকের সহিত শ্রমিকের স্বার্থসংঘাত, ধনবণ্টনের বৈষম্য, বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রতিযোগিতার তীব্রতা, জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিমূঢ়তা, অন্তরে বাহিরে শান্তি ও সন্তোষের অভাব—এই সমস্তই সমাজ-সংস্থিতির ভারসাম্যকে বিচলিত করিয়া এক আমূল বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা উদ্‌ঘাটিত করিল। সাহিত্যিকের মন প্রশ্নসঙ্কুলতায় আচ্ছন্ন হইয়া তাহার সহজ, সরল দৃষ্টিভঙ্গী হারাইল। পূর্ব্বতন যুগের অবিসংবাদিত, স্বতঃস্বীকৃত সত্যসমূহও সংশয়াকুলতার বাষ্পে আবৃত হইয়া অস্বচ্ছ ও অনিশ্চিত হইয়া উঠিল। সুনির্দ্দিষ্ট, অন্তর-সমর্থিত বিশ্বাসের যে প্রণালী বাহিয়া কাব্য প্রচুর ধারায় প্রবাহিত হয় তাহা অবরুদ্ধ হইয়া গেল। সন্দেহবাদ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে একজন সমালোচক '১৯০০-১৯২০' এই কালবিভাগকে জিজ্ঞাসাচিহ্নের যুগ (Age of Interrogation) আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এই অনিশ্চয়াত্মক অবস্থার মধ্যে মহাযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) বজ্রপাতের মত আসিয়া সমাজ ও সাহিত্যের নৈতিক ও সৌন্দর্য্যবোধমূলক ভিত্তিভূমিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিল।

যুদ্ধপূর্ব্ব কবিতায় টেনিসন-ব্রাউনিংএর প্রভাবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সহিত পুরাতন ধারার সঙ্কুচিত, দ্বিধাগ্রস্ত অনুবর্ত্তনের সমন্বয় লক্ষিত হয়। টেনিসনের শিল্পভারমন্থর, আবেগশীর্ণ কবিতা ও ব্রাউনিংএর সুলভ আশাবাদ ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধহীন শক্তির আস্ফালন—উভয় রীতিই পরবর্তী যুগে জনপ্রিয়তা হারাইয়াছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের কবিতা পূর্ব্বদৃষ্টান্তের অবলম্বন ও বৃহত্তর ভাবাবেগ ও জীবন-দর্শনের প্রেরণা হারাইয়া অনেকটা শীর্ণ ধারায়, আত্মকেন্দ্রিকতার আবেশে আচ্ছন্ন হইয়া, অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতে উপজীব্য বিষয়-প্রবল হৃদয়াবেগের পরিবর্ত্তে মৃদু, শান্ত ভাবোচ্ছ্বাস —emotion এর পরিবর্ত্তে sentiment. Bridges (১৮৪৪—১৯১০) ও Yeats (১৮৬৫—১৯৩৯) এই দুইজন কবি এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম —ইঁহাদের কবিতার কাব্যের সনাতন আদর্শ ও মহিমা অনেকাংশে রক্ষিত হইয়াছে। অবশ্য ইঁহারা প্রথম মহাযুদ্ধের কালসীমা অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উপকণ্ঠে পৌঁছিয়াছিলেন ও প্রথম যুদ্ধের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে না হউক পরোক্ষভাবেও তাঁহাদের কাব্যে সংক্রামিত হইয়াছিল।

Bridgesএর কবিতায় সর্ব্বপ্রকার রোমাণ্টিক ভাবাতিশয্য ও কল্পনা-বিলাস বর্জ্জিত হইয়াছে—ক্লাসিকাল রীতির অনুমোদিত প্রশান্তি ও বিশুদ্ধি, সহজ, আড়ম্বরহীন বাক্যে উচ্ছ্বাসহীন, পরিমিত আবেগের সৌন্দর্য্যপূর্ণ অভিব্যক্তি তাঁহার কাব্যের বিশেষত্ব। তাঁহার কল্পনা পূর্ব্ববর্ত্তী মহাকবিদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে মার্জ্জিত ও সংস্কৃত হইয়াছে—অনুশীলনের দ্বারা পরিশোধিত মনের সূক্ষ্ম সৌকুমার্য্য-বোধ ও মৃদু ভাবব্যঞ্জনা তাঁহার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার প্রেম-কবিতায় উন্মাদনা নাই—আছে স্নিগ্ধ আবেশ, সুরার পরিবর্ত্তে স্বচ্ছ, শীতল ভাব-ধারার নির্ঝর-প্রবাহ। Yeatsএর কবিতায় অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও স্বপ্নাবিষ্টতার সর্ব্বব্যাপী প্রসার বাস্তববোধকে সম্পূর্ণভাবে অভিভূত করিয়াছে। তিনি বাস্তব জগৎকে উপেক্ষা করিয়া এক রহস্যময় পরিমণ্ডলে বাস করিতেন—স্বপ্নের আভাস-ইঙ্গিত, রূপক-ব্যঞ্জনা, সুদুর অতীতের নানা অপ্রাকৃত বিশ্বাস প্রভৃতি অলৌকিক চিন্তা-কল্পনায় বেষ্টিত হইয়া যুক্তিতর্কের অতীত, ইন্দ্রিয়ানুভূতির অনধিগম্য আধ্যাত্মিক সত্যের স্পর্শ অনুভব করিতেন। Blake ও Shelleyর সহিত তুলনায় Yeatsএর অতীন্দ্রিয় রহস্য-বোধ সেরূপ নিবিড় ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে; ইহার মধ্যে যেন সহজ সংস্কারলব্ধ ঐকান্তিকতার কিছু অভাব আছে। মনে হয় যেন Yeats অনেকটা সচেষ্টভাবে নিজের চারিদিকে কল্পলোকের উপাদান সমাবেশ করিয়া, তাঁহার আবেষ্টনের বস্তুপুঞ্জ ও অন্তরের অনুভূতিসমূহের মধ্যে সাঙ্কেতিক অর্থগূঢ়তার আরোপ করিয়া, অপ্রাকৃত সংস্কার ও কল্পনার অবিরত রোমন্থনের সাহায্যে এক প্রকারের অর্দ্ধ-স্বচ্ছ দিব্যদৃষ্টি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি আয়র্ল্যাণ্ডের সুপ্রাচীন যুগের গাথা-কাহিনী ও শৈশব-কল্পনার সৃষ্টিসমূহ লইয়া এক মায়াঘন, গোধূলিছায়াচ্ছন্ন প্রতিবেশ (Celtic twilight) রচনা করিয়াছেন—ইহার মধ্যে আধুনিক যুগের সমস্যাজালের কোন স্থান নাই। তাঁহার শেষ বয়সের কবিতায় আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-অর্জ্জনের প্রয়াস তাঁহার চিত্তকে স্পর্শ করিয়া তাঁহার স্বপ্নাবেশের নিবিড়তাকে কতকাংশে টুটাইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর কাব্যের দিক দিয়া এই পরিবর্ত্তন খুব সার্থক ও সন্তোষজনক হয় নাই—যেমন কল্পলোকের রং ফিকে হইয়াছে, তেমনি কুহেলিকার অর্দ্ধ-ভাস্বর আবরণের মধ্যে আধুনিক যুগের কণ্টকাকীর্ণ সমস্যার তীক্ষ্ণাগ্রও কুণ্ঠিত হইয়াছে।

স্বপ্নজগৎ ও বাস্তব জীবন—উভয়ের মধ্যে সমন্বয়মূলক যোগসূত্র-রচনার শক্তি ইয়েট্‌সের ছিল না।

আর তিন জন প্রাচীনপন্থী কবির বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। হপকিন্স (G. M. Hopkins) (১৮৪৪-১৮৮৯) প্রকৃতপক্ষে ভিক্টোরীয় যুগের কবি। সন্দেহবাদ ও অবিশ্বাসের যুগে তাঁহার ভগবদ্‌ভক্তির নিবিড় একাগ্রতা এক আশ্চর্য্য ব্যতিক্রম। হপকিন্সের এই সংশয়লেশহীন ভক্তিবাদ তাঁহাকে সপ্তদশ শতকের ভক্ত কবিদের সমগোত্রীয় করিয়াছে। তাঁহার আধুনিকতার প্রকৃত দাবী তাঁহার ভাষার মৌলিকতা ও ছন্দোবিন্যাসের অভিনবত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বহু-আলোচিত নিসর্গ-সৌন্দর্য্যকে এক নূতন চোখে দেখিয়াছেন—তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য পূর্ব্ব কবিদের প্রভাবের নিকট সম্পূর্ণ অঋণী এবং ইহাই এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের প্রকৃতি-বর্ণনায় প্রতিফলিত হইয়াছে। তাঁহার ছন্দের নূতনত্বও বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ডেভিস (Davies) (১৮৭০-১৯৪০) ও ডি লা মেয়ার (De la Mare) (১৮৭২—) সহজ সৌন্দর্য্য ও স্বপ্নজগতের কবি। ডেভিস নিতান্ত ক্ষুদ্র, অতি-পরিচিত দৃশ্য-শব্দাবলীর মধ্যে আদিম বিস্ময়বোধের শিহরণ অনুভব করেন। রামধনু-আঁকা আকাশের নীচে কোকিলের গান তাঁহার চোখে যেন অপার্থিব সৌন্দর্য্যের সমাবেশ, যেন অলৌকিক মায়ার তোরণ-উদ্‌ঘাটন। ডি লা মেয়ার শিশু-মনের রহস্য, স্বপ্নের তন্দ্রা-জড়িত ইঙ্গিত, বস্তুর মধ্য দিয়া অবাস্তবতার আভাস অনুভব করিতে আশ্চর্য্যরূপ প্রবণতা দেখাইয়াছেন। দুই একটী কথার ব্যঞ্জনায়, ছন্দের মন্থর ধ্বনিপ্রবাহের দ্বারা তিনি একটী অদ্ভুত কুহকের সৃষ্টি করিয়া পাঠকের মনে তাহা সঞ্চারিত করেন। ডেভিস ও ডি লা মেয়ারের কাব্যপরিধি অতি সঙ্কীর্ণ; তাঁহাদের বীণায় সুর-বৈচিত্র্য নাই; কিন্তু এই অল্প পরিসরে, একই প্রকারের সুরের মূর্চ্ছনায় ইঁহাদের কবিতা আমাদিগকে সমসাময়িক কবিতার উদ্‌ভ্রান্তি ও ভাববিকার হইতে বহুদূরে, আদিমযুগের বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্যানুভূতি ও স্বপ্নসুষমার রাজ্যে লইয়া যায়।

ইহার পরেই মহাযুদ্ধের প্রলয়-বিপর্য্যয় কাব্য-রাজ্যে এক আমূল বিপ্লবের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। যখন যুদ্ধের ভেরী বাজিয়াছে, তখন প্রথম প্রথম কবিরা দেশপ্রেমের সনাতন ভাবোচ্ছ্বাসের সহিতই তাহার প্রত্যুদ্‌গমন করিয়াছেন।

হার্ডি, কিপলিং প্রভৃতি পুরাতন যুগের কবিরা আত্মোৎসর্গের আবেগে মাতোয়ারা হইয়া দেশরক্ষার পবিত্র কর্ত্তব্য-পালনে, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য তরুণ সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়াছেন। নবীন কবিদের মধ্যে রুপার্ট ব্রুক (Rupert Brooke) (১৮৮৭-১৯১৫) যুদ্ধে যোগ দিবার অব্যবহিত পরে যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে দেশপ্রীতির উদাত্ত সুর ধ্বনিত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রথম দিকেই তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া তিনি পরবর্ত্তী স্তরের মোহভঙ্গ ও নিদারুণ প্রতিক্রিয়া অনুভব করার সময় পান নাই। কিন্তু যে সমস্ত সৈনিক-কবি যুদ্ধের শেষ পর্য্যায় পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, গ্লানিকর ও বীভৎস অভিজ্ঞতার চাপে তাঁহাদের সমস্ত আদর্শবাদ ও ভাবোচ্ছ্বাস কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে। স্যাসুন (Sassoon) (১৮৮৬—), ওয়েন (Owen) (১৮৯৩-১৯১৮) প্রভৃতি কবিরা পরিখার কর্দ্দমসিক্ত ভূমিতে সরীসৃপের ন্যায় আত্মগোপন করিয়া, বীভৎস, বিকলাঙ্গ মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়া, মূঢ় যান্ত্রিকতার অনুশাসনে সমস্ত স্বাধীন ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়া, নির্ম্মম প্রয়োজনের নিকট সমস্ত শালীনতা ও শিষ্টাচারকে বলি দিতে বাধ্য হইয়া, মনের মধ্যে এমন একটা হুঙ্কারজনক জুগুপ্সা, এমন একটা মর্ম্মদাহী ঘৃণা ও আত্মধিক্কার অনুভব করিয়াছেন যে, তাঁহাদের কবিতায় এই তিক্ত অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি না দিয়া পারেন নাই। এই ক্লেদপঙ্কিল যুদ্ধের মধ্যে তাঁহারা গৌরবময় উন্মাদনার পরিবর্ত্তে মানবাত্মার চরম অবমাননা, চূড়ান্ত অমর্য্যাদা উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহার উপর যখন যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও পরিণতির বিষয় তাঁহাদের মনে উদয় হইয়াছে, তখন এই বিরাগ শতগুণ বৰ্দ্ধিত হইয়া সমগ্র মানবজীবনের উপর একটা বিষদিগ্ধ অনাস্থায় পরিণত হইয়াছে। কুটিল, স্বার্থপর রাজনীতিবিদেরা তাঁহাদের সম্মুখে এক মিথ্যা আদর্শের উজ্জ্বল ছবি ধরিয়া, তাঁহাদের উদার আত্মবিসর্জ্জন-প্রবৃত্তির অপব্যবহার করিয়া তাঁহাদিগকে এই বৃথা রক্তপাতে প্রণোদিত করিয়াছে। এই যুদ্ধের পরিণামে জগতের কোন মঙ্গল হইবে না, কোন উন্নততর আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইবে না, পৃথিবীব্যাপী যে শোষণ-ক্রিয়া চলিতেছে তাহার অবসান হইবে না। কাজেই এই সমস্ত কবিতার ভিতর দিয়া তিক্ত মোহভঙ্গের সহিত প্রতারিত সরল-বিশ্বাসীর গাত্রজ্বালা যুক্ত হইয়া শ্লেষাত্মক অট্টহাস্যে উদ্গীরিত হইয়াছে। ব্যঙ্গ ও শ্লেষ, হতাশপূর্ণ ক্ষোভ, মনুষ্যত্বের গ্লানিকর অপমান-বোধ,

বীভৎস বিকৃতির ক্লেদাক্ত, অশুচিস্পর্শ, তরুণ মনের আদর্শস্বপ্নের একদিকে শোচনীয়, অপরদিকে প্রহসনাত্মিক পরিণতি এবং এই সমস্ত জটিল, বহুমুখী ভাবপুঞ্জের ভিতর দিয়া করুণা ও সমবেদনার অনিবার্য্য স্ফুরণ—সৈনিক কবিদের কবিতাগুলির উপর এক অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য ও মর্য্যাদা আনিয়া দিয়াছে।

যুদ্ধোত্তর যুগের দারুণ অবসাদ, সমস্ত আদর্শবাদমূলক আশা-ভরসার মূলোচ্ছেদ T. S. Eliotএর (১৮৮৮—) খণ্ড-কবিতায় ও "The Waste Land" নামক কাব্যে চরম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। এই কাব্যের প্রকাশ-ভঙ্গী, গঠন ও বক্তব্যবিষয় কবিতার চিরাচরিত রীতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহার ছন্দের স্খলিত শিথিলতা, ধ্বনিপ্রবাহের অতি ক্ষীণ গতি ও মুহুর্মুহুঃ বিরতি, যুগের গুরুভার শ্রান্তি, ইহার যান্ত্রিক, প্রাণহীন পদক্ষেপ ও অতলস্পর্শ শূন্যতার গহ্বরমুখে পৌঁছিয়া অকস্মাৎ গতিরোধ সূচিত করে। ইহার বর্ণনায় ধারাবাহিকতার অভাব, অস্পষ্ট, ছায়াময় সাঙ্কেতিকতার ভিতর দিয়া অর্থের অর্দ্ধস্ফুট ইঙ্গিত, ইহার ভাষাতে অধীত সাহিত্যের দূরাগত, ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ও আধুনিকতম জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব—এই সমস্তের মধ্যে যুদ্ধোত্তর যুগের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা, পথ-সন্ধানে বিভ্রান্তি, অতীত সংস্কৃতির পাষাণ ভারে কল্পনার মৌলিক স্ফুরণের ব্যাঘাত সার্থক ব্যঞ্জনায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। এই সর্ব্বব্যাপী নৈরাশ্যবাদের মধ্যে কাব্যের শেষে আশার ইঙ্গিত খুঁজিয়া পাওয়া যায়—ভাঙ্গিয়া-পড়া পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির ধূলিজালে আচ্ছন্ন বাতাস নূতন সৃষ্টির বীজ বহন করে। উপনিষদের মন্ত্রে এই মৃতদেহে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইবে, উদ্‌ভ্রান্ত ও কেন্দ্রিকতা-ভ্রষ্ট পাশ্চাত্য জগৎ শান্তিবারি প্রক্ষেপে শীতল হইয়া জ্বরবিকার হইতে আরোগ্যলাভ করিবে এই আশ্বাস-বাণীর মধ্যে কাব্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। আধুনিকতম ইংরেজী কাব্য এলিয়টের দ্বারা নিবিড়ভাবে প্রভাবিত—তরুণ কবিরা, এলিয়টের মতবাদ স্বীকার না করিলেও, তাঁহার রচনাভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা এখনও পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে ও ইহার চরম পরিণতি ও প্রতিক্রিয়া কি রূপ ও গতি অবলম্বন করিবে তাহা এখন কৌতূহলপূর্ণ প্রতীক্ষার বিষয়।

(২)

বিংশ শতাব্দীর গদ্য ও উপন্যাস-সাহিত্যে কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর লেখকের নাম উল্লেখ করা যায়। ঔপন্যাসিকদের মধ্যে গলস্‌ওয়ার্দ্দি (Galsworthy), ওয়েল্‌স (H. G. Wells), কনরাড (Conrad), ভার্জ্জিনিয়া উল্‌ফ (Virjinia Woolf), জেমস্ জয়েস্ (James Joyce) ও হাক্সলি (Aldous Huxley) উপন্যাসের অগ্রগতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। নাট্যসাহিত্যে গলসওয়ার্দ্দি, বার্ণাড শ (Bernard Shaw) ও সিঞ্জ (J. M. Synge) নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন। এই সমস্ত লেখকের উপরই যুগের প্রভাব মুদ্রিত হইয়াছে। গলস্‌ওয়ার্দ্দির The Forsyte Saga মধ্যশ্রেণীর ধনিসম্প্রদায়ের মনোবৃত্তি ও জীবনদর্শনের মহাকাব্য। ইহারা পৃথিবীর ধন-সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া সমস্ত জীবনকেই নিজ উপভোগ্য দ্রব্যরূপে দেখিতে অভ্যস্ত, সংসারের সমস্ত বিভাগেই স্বত্বাধিকারমূলক দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। Soames এই শ্রেণীর প্রতিনিধি—সে তাহার দাম্পত্য জীবনেও অধিকারবাদের নীতি প্রয়োগ করিতে উৎসুক। তাহার স্ত্রী Ireneকে সে নিজ সম্পত্তির অংশরূপে ভোগদখলের পাত্রী বলিয়া মনে করে—তাহার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবোধ ও সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রায় অতৃপ্তি আমলের মধ্যেই আনে না। শেষ পর্য্যন্ত Ireneএর অন্যাসক্তি ও গৃহত্যাগ তাহার বস্তুসঞ্চয়ের দ্বারা গাঁথা নিরেট জীবনাদর্শকে যেন ভূমিকম্পের প্রচণ্ড আঘাতে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। দাম্পত্যজীবনের এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের ফলে Soames জীবনকে নূতন ভাবে দেখিতে, নূতন সমবেদনা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সহিত অপরকে বিচার করিতে, শিখিয়াছে। তাহার একমাত্র কন্যা Fleurএর উদ্‌ভ্রান্ত অস্থিরমতিত্ব, নীতির অভাব ও ক্ষণিকবাদকে সে পিতৃসুলভ স্নেহ ও ক্ষমার চক্ষে দেখিয়াছে। Soames সম্বন্ধে লেখকের মনোভাব অবজ্ঞা হইতে সহানুভূতির পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। এই উপন্যাসে চরিত্র সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে—Forsyte গোষ্ঠীর ভ্রাতৃবৃন্দের চরিত্রে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও গোষ্ঠীগত ঐক্যের সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থটীর সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ইহার প্রতিবেশের চিত্রাঙ্কনে—একদিকে ভিক্টোরীয় যুগের আত্মতৃপ্ত, সংসারযুদ্ধে বিজয়ীর উৎফুল্ল, আত্মপ্রত্যয়শীল

মনোভাব, অধিকারের গর্ব্বে জীবনের দুরধিগম্য রহস্য ও অপ্রত্যাশিত বিকাশের প্রতি অন্ধতা, অপরদিকে যুদ্ধোত্তর জগতে সমস্ত নৈতিক আদর্শের উন্মূলনে জীবনে চরম উদ্দেশ্যহীনতা ও বিশৃঙ্খলার সংক্রামণ, ইহার সনাতন কেন্দ্রবিন্দুর অপসারণ—এই বিপরীত অবস্থার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ আশ্চর্য্য তথ্য-সমৃদ্ধি ও কলাগত সুসঙ্গতির সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

ওয়েল্‌সের (১৮৬৮—) গতি বাস্তবচিত্র হইতে কাল্পনিক সম্ভাবনার দিকে। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানবের সম্মুখে যে অনন্ত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে, তাহাই ওয়েল্‌সের কল্পনাকে অধিকার করিয়াছে। বিজ্ঞানের প্রত্যাশিত উন্নতির ফলে ভবিষ্যৎযুগের মানবের জীবনযাত্রায় যে বিপ্লবকর পরিবর্ত্তনের সূচনা হইবে তাহাই তাঁহার উপন্যাসাবলীর বর্ণিত বিষয়। মানুষকে নানাবিধ অনভ্যস্ত, বিস্ময়কর অবস্থার মধ্যে ফেলিলে তাহার কিরূপ মানস প্রতিক্রিয়া হয় তাহা তিনি কৌতূহলের সহিত অনুসরণ ও সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত বিবৃত করিয়াছেন। আজ যদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপ কমিয়া যায়, সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যে গমনাগমনের পথ উন্মুক্ত হয়, জরামৃত্যুর অভিভব প্রতিরুদ্ধ হয়—অথবা মানবের প্রতিবেশের ও অভ্যস্ত জীবনযাত্রার একটা আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তবে তাহার জীবনধারা নিশ্চয়ই নূতন প্রণালীতে প্রবাহিত ও উহার গতিচ্ছন্দ নূতন তালে নিয়মিত হইবে। ওয়েল্‌স্ এই প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ পরিণতিকে কল্পনার সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে ও নানা ঘটনা-সমাবেশের দ্বারা ইহার একটা পূর্ণাঙ্গ, তথ্যবহুল চিত্র আঁকিতে, চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রচনায় কবিকল্পনা ও বিজ্ঞানসমর্থিত বাস্তবতার মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সমন্বয় হইয়াছে। এই-জাতীয় রচনার উৎকর্ষ নির্ভর করে বিশ্বাসযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত অনুমান, ও অনাগত জীবন-ব্যবস্থার ছবির মধ্যে নিখুঁত সামঞ্জস্যজ্ঞান ও নিশ্ছিদ্র তথ্য-বিন্যাসের উপর। এই উভয় দিক দিয়াই ওয়েল্‌সের উপন্যাসসমূহ সফলতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রাথমিক অনুমানটী মানিয়া লইলে, ইহার সার্থক রূপায়ন আমাদের বিচার-বুদ্ধিকে তৃপ্তি দেয় ও বিশ্বাস উৎপাদনে সমর্থ হয়। লেখকের কল্পনা যে অনেক স্থলে সত্যের পূর্ব্বাভাস তাহা তাঁহার কোন কোন উপন্যাসে প্রমাণিত হইয়াছে—আধুনিক বিমান-যুদ্ধের ভয়াবহ ব্যাপ্তি ও

ধ্বংসলীলা তাঁহার একখানি উপন্যাসে বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্দৃষ্টির সহিত সূচিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ইহা বলা যাইতে পারে যে ওয়েলসের উপন্যাস চিরাচরিত ধারার ব্যতিক্রম। ইহা বাস্তব জীবনের বিশ্লেষণমূলক প্রতিচ্ছবি নহে, ইহা, যে বাস্তব এখনও অপরিণত সম্ভাবনার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে, যাহার বীজ উপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অঙ্কুর এখনও ভূগর্ভস্থ অন্ধকার হইতে উদ্ভিন্ন হয় নাই, তাহাকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট রূপ দিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। এই উদ্দেশ্য অনেকটা উপন্যাসের সীমা-বহির্ভূত—যে শক্তি প্রত্যক্ষের মর্ম্মোদ্ঘাটনে নিয়োজিত হইতে পারিত, তাহা অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টায় অনেকাংশে অপব্যয়িত হইয়াছে। তথাপি ওয়েল্‌সের উপন্যাস এইজাতীয় রচনার আঙ্গিকের শিথিলতা ও বিষয়ের পরিধি-বিস্তারের চমৎকার নিদর্শন।

কনরাড্ (Conrad)—একমাত্র বিদেশী লেখক, যিনি ইংরেজী সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। তিনি জাতিতে পোল (Pole), আঠার বৎসর বয়সে ইংলণ্ডে আসিয়া ইংরেজী ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন। তাঁহার ভাষা, সূক্ষ্ম ভাবপ্রকাশনৈপুণ্যে, ছন্দসুষমায় ও কল্পনা-সমৃদ্ধিতে, অতুলনীয়; খাঁটি ইংরেজ লেখকের রচনার সঙ্গে তুলনায় এই সমস্ত গুণে তাঁহার উৎকর্ষই লক্ষিত হয়। অবশ্য বিদেশীয়ের হস্তস্পর্শের নিদর্শন যে তাঁহার রচনায় নাই তাহা নয়—একটু অতিভাষণ-প্রবণতা, কল্পনার আধিক্য, আলো-ছায়া বিন্যাসের নিবিড়তা, অনুভূতির সূক্ষ্মতম অনুরণন পর্য্যন্ত প্রকাশ করিবার অত্যধিক প্রয়াস—এই সমস্ত লক্ষণ মিলিয়া একটা কৃত্রিম সচেষ্টতার ধারণা উৎপাদন করে। তথাপি কনরাডের গদ্য-রচনার কাব্যোৎকর্ষ ও মৌলিকতা অস্বীকার করা যায় না। তাঁহার উপন্যাসসমূহে নাবিক-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অসাধারণ অনুভূতি চমৎকার অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। প্রশান্ত দ্বীপপুঞ্জের জীবনযাত্রা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের, পাশ্চাত্য জাতির চোখে প্রাচ্য মহাদেশের অন্তর ও বাহিরের রূপের যে একটা মোহময় আকর্ষণ আছে, তাহার যে উজ্জ্বল চিত্র আমরা তাঁহার উপন্যাসে পাই, তাহা ইংরেজী সাহিত্যের অফুরন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও বিরল। তাঁহার "Typhoon" উপন্যাসে সমুদ্রে ঘূর্ণীবায়ুর প্রলয় তাণ্ডবের বর্ণনা ও এই অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে জাহাজের কর্ম্মচারিবৃন্দের বিভিন্ন চরিত্রের উদ্‌ঘাটন তাঁহার বর্ণনাশক্তি ও মনস্তত্ত্ব

বিশ্লেষণ উভয়েরই চমৎকার পরিচয়। অসীম, রহস্যঘেরা মহাসমুদ্রের নির্জ্জন প্রদেশের প্রগাঢ় শান্তি, স্বপ্নময় অবাস্তবতা ও অতলস্পর্শ রহস্যবোধের ইন্দ্রজাল তিনি নিজে গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন ও ভাষার অপরূপ কুহকে পাঠককেও অনুভব করাইয়াছেন। সুদীর্ঘকালব্যাপী নির্জ্জন বাস ও প্রকৃতির অপরিমেয় রহস্যের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় মানুষের চরিত্রকে কিরূপ গভীরভাবে প্রভাবিত করে, তাহার মনে দার্শনিকোচিত নিস্পৃহতা ও উদারতার উন্মেষ করে, তাহাও তিনি বিবৃত করিয়াছেন; তাঁহার কোন কোন নৌ-কর্ম্মচারী যেন Hamlet-এর সামুদ্রিক সংস্করণ। মোট কথা, কনরাড উপন্যাসে একরূপ অভিনব অনুভূতি, জীবনের এক নূতন, অপরিচিত রূপের সহিত আমাদের পরিচয় স্থাপন করিয়াছেন। খাঁটি ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিলে প্রাচ্যমহাদেশের এই আবেদন-সৌন্দর্য্য তাঁহার মনকে স্পর্শ করিত না।

ভার্জ্জিনিয়া উল্‌ফ ও জেমস্‌ জয়েস উপন্যাসের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর মধ্যে অভিনবত্ব প্রবর্ত্তনের যে পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। ইঁহারা মানবমনের জটিলতা প্রতিপাদনের জন্য তাহার সচেতন চিন্তা ও কর্ম্মের সহিত অবচেতন মনের অস্ফুট, অবয়বহীন আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-কল্পনা, অতীত স্মৃতির খণ্ডাংশ, আকস্মিক, অনিয়ন্ত্রিত ভাবাসঙ্গ (association of ideas) প্রভৃতি মিশাইয়া মানব-প্রকৃতির একটা সম্পূর্ণ সত্য পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণতঃ উপন্যাসে মানবমনের যে ছবি প্রতিফলিত হয়, তাহা তাহার একটি বিশেষ মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার জন্য তাহার জটিল, বিশৃঙ্খল, পরস্পরের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ভাবসমূহের মধ্যে এক অংশের পৃথকীকরণ ও স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন। কিন্তু ইহাতে যাঁহারা অবিমিশ্র সত্যানুসন্ধানে ব্রতী তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। ইহা আর্টের সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলার খাতিরে সত্যের অঙ্গচ্ছেদ ও মননক্রিয়ার অপরিমেয় জটিলতা ও সীমা-সংখ্যাহীন, অনির্দ্দেশ্য অজস্রতাকে অস্বীকার। সৃষ্টি-পূর্ব্ব জগতের আদিম রহস্যমণ্ডিত, অণু-পরমাণুর যদৃচ্ছ সংঘর্ষে তরঙ্গায়িত, রূপ ও আকারের শাসনে অসংযত এক খণ্ডাংশ মানবের অন্তরলোকে বাসা বাঁধিয়াছে। ঔপন্যাসিক এখন মানবমনের অবচেতন স্তরে বন্দী এই দুরধিগম্য সত্তাকে রূপ দিবার ভার

গ্রহণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, যে অন্ধকারময় সুরঙ্গ পথে অবতরণ করিয়া লেখক এই সত্যকে বোধগম্যতার সূর্য্যালোকে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা তাঁহার প্রকাশভঙ্গীকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিয়াছে। সুস্পষ্ট অভিব্যক্তির আলোকে লালিত ও বর্দ্ধিত ভাষা আঁধার গুহার মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিতেছে। গভীরতা-পরিমাপক যন্ত্র (plumb-line) সমুদ্রের তলদেশে নিক্ষিপ্ত হইয়া যাহা আহরণ করিয়া আনিতেছে, তাহা ভাস্বর রত্ন নহে, কর্দ্দমাক্ত শৈবালগুচ্ছ ও জলমগ্ন প্রাণীর অস্থি-কঙ্কাল মাত্র। আর্টের সূর্য্যালোকোদ্ভাসিত সৌন্দর্য্য-নিকেতনে আমরা এই সমস্ত অদ্ভুত আবিষ্কারকে স্থান দিতে পারিতেছি না। জয়েসের "Ulysses" নামক উপন্যাসে এই প্রচেষ্টার অসমসাহসিক মৌলিকতা ও ইহার নৈরাশ্যপূর্ণ ফল—উভয়েই উদাহৃত হইয়াছে।

ভার্জ্জিনিয়া উল্‌ফের অবলম্বিত প্রণালী অধিকতর সন্তোষজনক ও আমাদের অস্থিমজ্জাগত সৌন্দর্য্যবোধের সহিত ইহার কোন অসামঞ্জস্য নাই। তাঁহার উপন্যাসে—যথা "Mrs. Dalloway", এবং "To the Light-house"এ —তিনি একদিনের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে সমস্ত পূর্ব্ব-জীবনের স্মৃতি, ইহার সার্থক উজ্জ্বল মুহূর্ত্তগুলি ও প্রগাঢ় অনুভূতিসমূহকে বৃত্তাকারে বিন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, একদিনের অভিজ্ঞতার মধ্যেই সমস্ত জীবনের ইতিহাসকে অন্তর্ভুক্ত করা যায়—স্মৃতি-রোমন্থনের প্রণালী বাহিয়া সমস্ত পূর্ব্বানুভূতি বর্ত্তমানের একটী ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তকে অর্থগৌরবে ও প্রতিনিধিত্বের মহিমায় মণ্ডিত করে। জীবনের সমস্তটাই পরস্পরের সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে, তাহার কোথায়ও পূর্ণচ্ছেদ টানা যায় না। প্রতিমুহূর্ত্তের চিন্তা ও কর্ম্মোদ্যমের পিছনে সমস্ত জীবনের যে সঞ্চিত মনন-শক্তি অলক্ষ্যভাবে ক্রিয়াশীল, লেখিকা তাহাকে সচেতন ভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই স্মৃতিগুলি প্রত্যেক পাত্র-পাত্রীর মানস নেত্রের সম্মুখে উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হইয়া বর্ত্তমানের চারিদিকে একটা সাঙ্কেতিকতার রশ্মিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে। সৌন্দর্য্য ও সুষমার দিক দিয়া এই কালের সীমা অতিক্রম করিয়া জীবনের ঐক্য-উপলব্ধি সার্থক হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে যে, অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে সংযোগসূত্রটীর নির্ব্বাচন মনস্তত্ত্বের

বিচারে ঠিক উপযোগী হইয়াছে কি না। বর্ত্তমানের যে ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া অতীতের যে স্মৃতি-কল্পনাগুলি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি কেবল আকস্মিক না তাহারা কোনও গূঢ়তর যোগসূত্রে সম্বদ্ধ—এই প্রশ্ন মনকে আন্দোলিত করিতে থাকে। অতীতের উদ্বোধন প্রত্যেক ক্ষেত্রে কি সহজ ও অনিবার্য্য, অথবা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সচেষ্টভাবে সংঘটিত—আমাদের বিচারবুদ্ধি এইরূপ সন্দেহ হইতেও সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে না।

জীবিত লেখকদের মধ্যে অ্যালডাউস হাক্সলি একটা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসসমূহে যুদ্ধোত্তর যুগের মানস বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক বিপর্য্যয়ের চমৎকার চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই যুগের সমাজে কোন স্থির, সর্ব্বস্বীকৃত নৈতিক আদর্শের অভাবে, নানারূপ উদ্ভট মতবাদ, অস্থির, মুহুর্মুহুঃ পরিবর্ত্তনশীল কর্ম্মপদ্ধতি, প্রগতিশীলতার সঙ্গে অন্ধসংস্কারের অদ্ভুত সংমিশ্রণ, উন্নত অধ্যাত্মবাদ ও বীভৎস ভোগবাদের, জনহিতৈষণা ও উৎকট স্বার্থপরতার যুগপৎ প্রাদুর্ভাব নীতিজগতে এক বিভ্রান্তকারী অরাজকতা, কেন্দ্রিকতাভ্রষ্ট অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। এলিয়টের মত হাক্সলিও ভারতীয় অধ্যাত্ম আদর্শের গ্রহণে, ত্যাগের দ্বারা ভোগলিপ্সার বিশুদ্ধীকরণে, ইউরোপের অর্জ্জনশীল ঐহিক-সুখসর্ব্বস্ব মনোবৃত্তির সম্পূর্ণ বিলোপেই এই সঙ্কটময় অবস্থা হইতে উদ্ধারলাভের একমাত্র পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইংরেজী সাহিত্যের অতি-আধুনিক উপন্যাস এক বিপ্লবকারী পরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

(৩)

বিংশ শতাব্দীতে, দীর্ঘকাল পরে, নাটক-রচনার একটা প্রবল প্রেরণা আসিয়াছে। অবশ্য এই নাটক এলিজাবেথীয় যুগের গৌরবময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী নহে। ইহা কবি-কল্পনার উত্তুঙ্গ স্তর হইতে অবতরণ করিয়া প্রাত্যহিকতার সাধারণ স্তরে ভ্রমণশীল; ইহাতে মানব-হৃদয়ের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা ও বিস্ময়কর স্ফুরণের পরিবর্ত্তে মৃদু আবেগ ও উত্তেজনার প্রভাবই সক্রিয়। এই অতি-আধুনিক নাটক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমস্যামূলক—সামাজিক বৈষম্য ও দুর্নীতির প্রভাবে, অর্থনৈতিক অব্যবস্থার ফলে, জীবনে যান্ত্রিকতার ক্রমপ্রসার-

শীল প্রাদুর্ভাবে মানুষের যে দুঃখকষ্টের উদ্ভব হইতেছে, যে শ্রেণী-সংঘর্ষ উৎকট হইয়া উঠিতেছে, তাহারই চিত্র ইহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এই হৃদয়াবেগ ও সংঘর্ষের সঙ্কীর্ণতর পরিধির সহিত সমতা রাখিয়া নাটকের আকারও ক্ষুদ্রতর হইয়াছে—পঞ্চাঙ্ক নাটকের বিস্তারের পরিবর্ত্তে আমরা এখন তিন অঙ্ক ও একাঙ্ক নাটকেরই প্রচলন দেখিতেছি। যুগের মানসপ্রবণতার অনুবর্ত্তনে নাট্য-সাহিত্যের সহিত কাব্যের প্রায় চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। এই যুগের কোন কোন নাট্যকার কবিতায় নাটক রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু এক সিঙ্গ ছাড়া আর কাহারও সাহিত্যিক মূল্য খুব বেশী নহে। এমন কি নাটকের মধ্যে কাব্যোৎকর্ষ সঞ্চার করার চেষ্টাও খুব শিথিল হইয়া আসিয়াছে। সাধারণ কথোপকথনের ভাষায়, সরল গদ্যরীতিতে মনের শান্ত, মৃদু আবেগও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশই এখন নাটকের উপজীব্য হইয়াছে।

গলস্ওয়ার্দ্দি এই নূতন নাট্যরীতির একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। তাঁহার নাটকাবলীতে তিনি বিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক আবেষ্টনে উদ্ভূত সমস্যা-সমূহ কিরূপে মানবের জীবনকে আলোড়িত করিতেছে তাহারই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কোথাও ("Justice"), তিনি দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত আনুষঙ্গিক ঘটনা ও অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া নির্ব্বিচারে দণ্ডনীতির প্রয়োগের ফলে প্রচলিত বিচার-পদ্ধতি কিরূপে আদর্শভ্রষ্ট হইয়া অপরাধীর জীবনে করুণ, মর্ম্মান্তিক পরিণতির সৃষ্টি করিতেছে। কোথাও বা ("Strife"), ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে স্বার্থসংঘাত উভয়পক্ষের অযৌক্তিক মনোভাবে, চরম উপায় অবলম্বনের মূঢ়তায়, নিছক জেদ ও একগুঁয়েমির ফলে শ্রেণী-সংঘর্ষের তিক্ততা ও ব্যক্তিগত জীবনের ক্লেশ-যন্ত্রণা বাড়াইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত যখন আপোষ-মীমাংসা হইতেছে তখন দেখা যাইতেছে যে, উভয়পক্ষের আপেক্ষিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সুতরাং ধর্ম্মঘটের দীর্ঘদিনব্যাপী দুঃখবরণ, দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি ফলের দিক দিয়া সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই সমস্ত নাটকে গলস্ওয়ার্দ্দি একদিকে দুর্ব্বলের প্রতি সহানুভূতি, অন্যদিকে মতভেদের বিতর্ক-পরিচালনায় ন্যায়বিচারের অপক্ষপাত মনোভাব দেখাইয়াছেন। তাঁহার নাটক পড়িলে মনে হয় যেন বিচারক জুরীদিগকে অভিযোগের সপক্ষে ও বিপক্ষে যাহা বলা

যাইতে পারে তাহা সমস্তই নিরপেক্ষভাবে বুঝাইয়া বলিতেছেন। লেখকের এই মনোভাব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু নাটকে আমরা ঠিক বিচারালয়ের অনুসৃত পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি দেখিতে চাহি না।

কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ নাটকের মধ্যে আইরিস কবি ও নাট্যকার সিঞ্জের (১৮৭১-১৯০৯) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার স্বল্পকালব্যাপী জীবনের মধ্যে তিনি যে দুই তিন খানি নাটক লিখিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বহুদিন-বিস্মৃত কবি-কল্পনার সুর, উঁচু সুরে বাঁধা হৃদয়াবেগের মূর্চ্ছনা শোনা যায়। তিনি কবি ইয়েটসের সহকর্ম্মী, একই ব্রতে ব্রতী ছিলেন, উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল আয়র্লণ্ডের ঐতিহ্য-সম্পদের পুনরুদ্ধার ও তাহার সার্থক সাহিত্যিক প্রয়োগ। ইয়েটস্ কবিতায় ও সিঞ্জ নাটকে এই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন —উভয়েই আইরিস সরস্বতীর বীণায় যে নূতন সুর-ঝঙ্কার তুলিয়াছেন, ইউরোপের ঐকতান সঙ্গীতে তাহার বিশিষ্টতা আমরা অনুভব করি। ইয়েটস্ও কতকগুলি নাটক লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নাটকীয় প্রতিভা ছিল না বলিয়া সেগুলি নাটকীয় গুণে সমৃদ্ধ হয় নাই—উহারা যেন কাব্যেরই প্রকার-ভেদ মাত্র।

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, বার্ণার্ড শ (Bernard Shaw) (১৮৫৬—) আয়র্লণ্ডের একজন অধিবাসী। তিনি নাটকের চিরাচরিত রীতিগুলি প্রকাশ্যভাবে উপেক্ষা করিয়া ইহাকে এক অভিনব পথে চালাইয়াছেন। তিনি আধুনিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শেকস্পিয়ারের নাটকাবলীর ক্রটি উদ্ঘাটন করিয়া তাঁহার নিজ রচনায় সেই ক্রটি সংশোধনের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। নাটকের একটা সর্ব্বস্বীকৃত, স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম এই যে, ইহা নাট্যকারের বিশেষ মতবাদপ্রচারের বাহন হইবে না—তিনি কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার চরিত্রদের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করিবেন না। সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর নাটকেই নাট্যকারের এই আত্মাবলুপ্তির নীতি অনুসৃত হইয়াছে। শেকস্পিয়ারের কোন নাটক হইতে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে বিশেষ ধারণা সঙ্কলন করা যায় না। কিন্তু বার্ণার্ড শ এই পূর্ব্ব স্বীকৃতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহার নাটকাবলীর প্রধান উদ্দেশ্য সমাজ-সমালোচনা ও সংস্কার—তাঁহার প্রতিটী দৃশ্যে এই উদ্দেশ্য তীক্ষ্ণভাবে প্রকট হইয়াছে;

তাঁহার প্রতি চরিত্রের কার্য্য ও কথোপকথন এই লক্ষ্যেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছে। বার্ণার্ড শ সমাজতন্ত্রবাদের একজন উৎসাহী সমর্থক; বর্ত্তমান সমাজসংস্থিতির প্রত্যেকটী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁহার আপোষহীন সংগ্রাম, কেননা ইহারা সমস্তই ধনতান্ত্রিক আদর্শের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ফল। সেইজন্য তিনি তাঁহার নাটকের মধ্য দিয়া এই বৈষম্য ও অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের সপক্ষে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছেন। বিবাহ-প্রথা, অনর্জ্জিত বা অসদুপায়ে অর্জ্জিত ধন উপভোগের নৈতিকতা, চিকিৎসা-ব্যবসায়, গণিকাবৃত্তি, যুদ্ধের গৌরব-ঘোষণার মধ্যে প্রকাণ্ড ফাঁকি ইত্যাদির আলোচনায় তিনি সমাজপ্রচলিত ধারণা ও সংস্কারগুলির অন্তঃসারশূন্যতা তীক্ষ্ণ যুক্তিতর্ক ও মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গের সাহায্যে প্রমাণিত করিয়াছেন। তাঁহার মতবাদ যেরূপ চমকপ্রদ, তাঁহার যুক্তিতর্কের ও শ্লেষের উপর অসাধারণ অধিকারও সেইরূপ বিস্ময়কর। তাঁহার চরিত্রদের কথোপকথন, উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দীপ্তি খেলিয়া গিয়াছে তাহাতে আমাদের চোখ ও বিচারবুদ্ধি ঝলসিয়া যায়। তাঁহার রসিকতাপূর্ণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্য যে কোন অযৌক্তিক, অসম্ভব সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের বিমুখতা ও বিরোধকে যেন কুহকবলে জয় করিয়া লয়—আমাদের মনন-ক্রিয়ার মন্থরতা তাঁহার বুদ্ধির ক্ষিপ্রগতির সহিত তাল রাখিতে না পারিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়ে। বাক্য-বিনিময়ের তীক্ষ্ণ গতিবেগ ও মুহুর্মুহুঃ মত ও খেয়াল পরিবর্ত্তনের অতর্কিত দ্রুততায় চরিত্রের সঙ্গতি ও কার্য্যকারণশৃঙ্খলার গ্রন্থন ঘূর্ণিচক্রমধ্যস্থ খড়-কুটার ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে। সুদীর্ঘ-স্বগতোক্তি ও মন্থর ঘটনা-বিন্যাস সাধারণ নাটকে চরিত্রদের আত্মবিশ্লেষণ ও নাট্যকারের উদ্দেশ্য-উপলব্ধির যে অবসর সৃষ্টি করে, বার্ণার্ড শ সেই চিরপ্রথাগত উপায়-সমূহের সহায়তা একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন। এই সমস্ত কারণে তাঁহার নাটকাবলী সম্বন্ধে পাঠকের রসাস্বাদন-শক্তি পদে পদে বাধা-বিঘ্নের দ্বারা প্রতিহত হয়। তথাপি এইরূপ উদ্ভট অস্বাভাবিকতা ও শ্লেষ-মনোভাবের তির্য্যক্ দৃষ্টির প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও বার্ণার্ড শর প্রকৃত নাটকীয় প্রতিভার অভাব নাই; যখনই তাঁহার কল্পনায় বিশিষ্ট মতবাদের সদাজাগ্রত উপস্থিতি একটু শিথিল বা অন্যমনস্ক হইয়া পড়ে, যখনই তিনি নিছক খেয়ালের ঊর্দ্ধে উঠিয়া

কোন গভীর ভাবের আকর্ষণ অনুভব করেন, তখনই তাঁহার সহজ নাট্য-প্রতিভা, মেঘমুক্ত সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর হইয়া উঠে। বার্ণাড শ, সুখের বিষয়, এখনও জীবিত—অনেকদিন হইল তিনি আর নূতন নাটক রচনা করেন নাই; তথাপি তাঁহার সৃষ্টিশক্তি আবার যে, কোন অভিনব, বিস্ময়কর বিকাশের মধ্যে রূপায়িত হইবে এই প্রত্যাশা আমাদিগকে সর্ব্বদা উন্মুখ করিয়া রাখে। ইংলণ্ডের মহিমান্বিত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস বার্ণাড শর রচনায় ইহার ঐতিহ্য-গৌরবের উপযুক্ত পরিসমাপ্তিলাভ করিয়াছে।

সমাপ্ত